ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

উৎসর্গ

ভানুসিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি, আজ তুমি আর দেখিতে পাইলে না।

সূচনা

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের কাজে যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন, আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প। সময়-নির্ণয় সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা তখনো ছিল, এখনো আছে। সেই কারণে চিঠিতে আমার তারিখকে যাঁরা ঐতিহাসিক বলে ধরে নেন তাঁরা প্রায়ই ঠকেন। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের কাল অনুমান করা অনেকটা সহজ। বোম্বাইয়ে মেজদাদার কাছে যখন গিয়েছিলুম তখন আমার বয়স ষোলোর কাছাকাছি, বিলাতে যখন গিয়েছি তখন আমার বয়স সতেরো। নূতন-প্রকাশিত পদাবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করছি সে আরো কিছুকাল পূর্বের কথা। ধরে নেওয়া যাক, তখন আমি চোদ্দোয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করবার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। অথচ আমাদের বাড়িতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম। দাদাদের ডেস্ক্ থেকে যখন সেগুলি অন্তর্ধান করত তখন তাঁরা তা লক্ষ্য করতেন না।

পদাবলীর যে ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হোত আমার কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিই নি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরি করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারি নি। যদি ফিরে পেতুম তা হলে দেখাতে পারতুম কোথাও কোথাও যেখানে তিনি নিজের ইচ্ছামত মানে করেছেন ভুল করেছেন। এটা আমার নিজের মত।

তার পরের সোপানে ওঠা গেল পদাবলীর জালিয়াতিতে। অক্ষয়-বাবুর কাছে শুনেছিলুম বালক কবি চ্যাটার্টনের গল্প। তাঁকে নকল

করবার লোভ হয়েছিল। এ কথা মনেই ছিল না যে ঠিকমত নকল করতে হলেও, শুধু ভাষায় নয়, ভাবে খাঁটি হওয়া চাই। নইলে কথার গাঁথুনিটা ঠিক হলেও সুরে তার ফাঁকি ধরা পড়ে। পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সেই সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। এইজন্যে ভানুসিংহের পদাবলী বহুকাল সংকোচের সঙ্গে বহন করে এসেছি। একে সাহিত্যে একটা অনধিকার প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলেই গণ্য করি।

প্রথম গানটি লিখেছিলুম একটা স্লেটের উপরে, অন্তঃপুরের কোণের ঘরে।—

গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে।

মনে বিশ্বাস হল চ্যাটার্টনের চেয়ে পিছিয়ে থাকব না।

এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ সমান দরের নয়।

জোড়াসাঁকো
৩০ বৈশাখ ১৮৯০

শ্রাবণ ১৮৮৭

রবীন্দ্রনাথ

জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ সহ

ভানুসিংহ ঠাকুরের
পদাবলী

১

বসন্ত আওল রে !
মধুকর গুন গুন, অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে ।
শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুখ জ্বালা সব
দূর দূর চলি গেল ।
মরমে বহই বসন্তসমীরণ,
মরমে ফুটই ফুল,
মরমকুঞ্জ'পর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিলকুল ।
সখি রে উছসত প্রেমভরে অব
ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ,
নিখিল জগত জনু হরখ-ভোর ভই
গায় রভসরসগান ।
বসন্তভূষণভূষিত ত্রিভুবন
কহিছে দুখিনী রাধা,
কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,
হৃদিবসন্ত সো মাধা ?
ভানু কহত অতি গহন রয়ন অব,
বসন্তসমীর শ্বাসে
মোদিত বিহ্বল চিত্তকুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা-বাসে ।

২

শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুমমালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুমমুঞ্জরী,
ভমর ফিরই গুঞ্জরী,
অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি রে।
শশিসনাথ যামিনী,
বিরহবিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে।
অধর উঠই কাঁপিয়া
সখিকরে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
চকিত হৃদয় চঞ্চলে কাননপথ চাহি রে।
কুঞ্জপানে হেরিয়া,
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহি রে!

৩

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে,
কণ্ঠে বিমলিন মালা।
বিরহবিষে দহি বহি গেল রয়নী,
নহি নহি আওল কালা।
বুঝনু বুঝনু সখি বিফল বিফল সব,
বিফল এ পীরিতি লেহা—

বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন,
বিফল রে এ মঝু দেহা!
চল সখি গৃহ চল, মুঞ্চ নয়ন-জল,
চল সখি চল গৃহকাজে,
মালতি-মালা রাখহ বালা,
ছি ছি সখি মরু মরু লাজে।
সখি লো দারুণ আধি-ভরাতুর
এ তরুণ যৌবন মোর,
সখি লো দারুণ প্রণয়-হলাহল
জীবন করল অঘোর।
তৃষিত প্রাণ মম দিবস-যামিনী
শ্যামক দরশন আশে,
আকুল জীবন থেহ ন মানে,
অহরহ জলত হুতাশে।
সজনি, সত্য কহি তোয়,
খোয়ব কব হম শ্যামক প্রেম
সদা ডর লাগয়ে মোয়।
হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব,
সো দিন আসব সখি রে,
বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে,
মরিব হলাহল ভখি রে।
ঐস বৃথা ভয় না কর বালা,
ভানু নিবেদয় চরণে,
সুজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি,
নহি টুটে জীবন-মরণে।

৪

শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর।
বিরহ সাথি করি সজনী রাধা
রজনী করত হি ভোর।
একলি নিরল বিরল পর বৈঠত
নিরখত যমুনা পানে,—
বরখত অশ্রু, বচন নহি নিকসত,
পরান থেহ ন মানে।
গহন তিমির নিশি ঝিল্লিমুখর দিশি
শূন্য কদম তরুমূলে,
ভূমিশয়ন 'পর আকুল কুন্তল,
কাঁদই আপন ভুলে।
মুগধ মৃগীসম চমকি উঠই কভু
পরিহরি সব গৃহকাজে
চাহি শূন্য 'পর কহে করুণ স্বর
বাজে রে বাঁশরি বাজে।
নিঠুর শ্যাম রে, কৈসন অব তুঁহু
রহই দূর মথুরায়—
রয়ন নিদারুণ কৈসন যাপসি
কৈস দিবস তব যায়!
কৈস মিটাওসি প্রেম-পিপাসা
কঁহা বজাওসি বাঁশি?
পীতবাস তুঁহু কথি রে ছোড়লি,
কথি সো বঙ্কিম হাসি?
কনক-হার অব পহিরলি কণ্ঠে,
কথি ফেকলি বনমালা?
হৃদিকমলাসন শূন্য করলি রে,
কনকাসন কর আলা!

এ দুখ চিরদিন রহল চিত্তমে,
ভানু কহে, ছি ছি কালা!
ঝটিতি আও তুঁহু হমারি সাথে,
বিরহ-ব্যাকুলা বালা।

৫

সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম-হার,
পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরি সিন্দূর দেকে
সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ
মিলন-গীতি গাও রে,
চঞ্চল মঞ্জীর-রাব
কুঞ্জ গগন ছাও রে।
সজনি অব উজার মঁদির
কনক-দীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জভবন
গন্ধসলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চমেলী বেলি
কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যূথি, গাঁথ জাতি,
গাঁথ বকুল-মালিকা।

তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জপথম চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে,
মৃদুল গান গাহিয়া।

৬

বঁধুয়া, হিয়া 'পর আও রে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি,
হমার মুখ 'পর চাও রে!
যুগ যুগ সম কত দিবস বহয়ি গল,
শ্যাম তু আওলি না,
চন্দ্র-উজর মধু-মধুর কুঞ্জ'পর
মুরলি বজাওলি না!
লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাস রে,
লয়ি গলি নয়ন-আনন্দ!
শূন্য কুঞ্জবন, শূন্য হৃদয় মন,
কঁহি তব ও মুখচন্দ?
ইথি ছিল আকুল গোপ-নয়নজল,
কথি ছিল ও তব হাসি?
ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট,
কথি ছিল ও তব বাঁশি;
তুঝ মুখ চাহয়ি শতযুগভর দুখ
নিমিখে ভেল অবসান।
লেশ হাসি তুঝ দূর করল রে
সকল মান-অভিমান।

ধন্য ধন্য রে ভানু গাহিছে
প্রেমক নাহিক ওর।
হরখে পুলকিত জগত-চরাচর
দুঁহুক প্রেমরস ভোর।

৭

শুন সখি বাজত বাঁশি।
গভীর রজনী, উজল কুঞ্জপথ,
চন্দ্রম ডারত হাসি।
দক্ষিণ পবনে কম্পিত তরুগণ,
তম্ভিত যমুনা বারি,
কুসুম-সুবাস উদাস ভইল, সখি,
উদাস হৃদয় হমারি।
বিগলিত মরম, চরণ খলিত-গতি
শরম ভরম গয়ি দূর,
নয়ন বারি-ভর, গরগর অন্তর,
হৃদয় পুলক-পরিপূর।
কহ সখি, কহ সখি, মিনতি রাখ সখি,
সো কি হমারই শ্যাম?
মধুর কাননে মধুর বাঁশরী
বজায় হমারি নাম?
কত কত যুগ সখি পুণ্য করনু হম,
দেবত করনু ধেয়ান,
তব ত মিলল সখি শ্যাম-রতন মম,
শ্যাম পরানক প্রাণ।

শ্যাম রে,
শুনত শুনত তব মোহন বাঁশি
জপত জপত তব নামে,
সাধ ভইল ময় দেহ ডুবায়ব
চাঁদ-উজল যমুনামে!
"চলহ তুরিত গতি শ্যাম চকিত অতি,
ধরহ সখীজন হাত,
নীদ-মগন মহী, ভয় ডর কছু নহি,
ভানু চলে তব সাথ।"

৮

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণ-নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বনমে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত ধার
বিমল রজত ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতি রে॥

দেখ সজনি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে ;
আও আও সজান-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে ॥

৯

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ বিষণ্ণ !
নীল অকাশে, তারক ভাসে
যমুনা গাওত গান,
পাদপ মরমর, নির্ঝর ঝরঝর
কুসুমিত বল্লিবিতান।
তৃষিত নয়ানে, বন-পথ পানে
নিরখে ব্যাকুল বালা,
দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে
গাঁথে বন-ফুল মালা।
সহসা রাধা চাহল সচকিত
দূরে খেপল মালা,
কহল "সজনি শুন, বাঁশরি বাজে
কুঞ্জে আওল কালা।"

চকিত গহন নিশি, দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে।
কণ্ঠ মিলাওল ঢলঢল যমুনা
কল কল কল্লোল গানে।
ভনে ভানু অব শুন গো কানু
পিয়াসিত গোপিনী প্রাণ।
তোঁহার পীরিত বিমল অমৃত রস
হরষে করবে পান।

১০

বজাও রে মোহন বাঁশী!
সারা দিবসক বিরহ-দহন-দুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি।
রিঝ-মন-ভেদন বাঁশরি-বাদন
কঁহা শিখলি রে কান?
হানে থিরথির, মরম-অবশকর
লহু লহু মধুময় বাণ।
ধসধস করতহ উরহ বিয়াকুলু
ঢুলু ঢুলু অবশ-নয়ান;
কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয়
অধীর করয় পরান।
কত শত আশা পূরল না বঁধু
কত সুখ করল পয়ান।
পহু গো কত শত পীরিত-যাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায় বঁধু, যমুনা-বারিম
ডারিব দগধ-পরান।

সাধ যায় পহু, রাখি চরণ তব
হৃদয় মাঝ হৃদয়েশ,
হৃদয়-জুড়াওন বদন-চন্দ্র তব
হেরব জীবনশেষ।
সাধ যায় ইহ চন্দ্রম-কিরণে,
কুসুমিত কুঞ্জবিতানে,
বসন্তবায়ে প্রাণ মিশায়ব,
বাঁশিক সুমধুর গানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু।

১১

আজু সখি মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।
যুবন মদ-বিলসিত,
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মূরছি জনু যায়।
আজু মধু চাঁদনী
প্রাণ উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভই লাজ।

বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর,
কুসুম-বন মাঝ।
মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায়।
আধফুট শতদল,
বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায়।
অলকে ফুল কাঁপয়ি
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড়ু পায়।
ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল
ভানু মরি যায়।

১২

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে
হাস বিকাশত কায়,
কোন স্বপন অব দেখত মাধব,
কহবে কোন হমায়!
নীদ-মেঘপর স্বপন-বিজলি সম
রাধা বিলসত হাসি।
শ্যাম, শ্যাম মম, কৈসে শোধব
তুঁহুক প্রেমঋণ রাশি।
বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি?
শ্যাম ঘুমায় হমারা,
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব
শীতল জোছন-ধারা।
তারক-মালিনী সুন্দর যামিনী
অবহুঁ ন যাও রে ভাগি,
নিরদয় রবি, অব কাহ তু আওলি
জ্বাললি বিরহক আগি।
ভানু কহত অব— "রবি অতি নিষ্ঠুর
নলিন-মিলন অভিলাষে
নরনারীক মিলন টুটাওত
ডারত বিরহ-হুতাশে।"

১৩

সজনি গো,
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশীথ যামিনী রে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত
ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত,
থরহর কম্পত দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্,
বরখত নীরদপুঞ্জ।
ঘোর গহন ঘন তাল তমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
বোল ত সজনী এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত
সকরুণ রাধা নাম।

সজনি,
মোতিম হারে বেশ বনা দে
সীঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম
বাঁধহ মালত মালে।
খোল দুয়ার ত্বরা করি সখি রে,
ছোড় সকল ভয়লাজে,
হৃদয় বিহগসম ঝটপট করত হি
পঞ্জর-পিঞ্জর মাঝে।

গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওল কিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব
কহে ভানু তব দাস।

১৪

বাদর বরখন, নীরদ গরজন,
বিজুলী চমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে, আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর।
ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহু
বজর পাত যব হোয়,
তুঁহুক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম
ডর অতি লাগত মোয়।
অঙ্গ-বসন তব, ভীঁখত মাধব
ঘন ঘন বরখত মেহ,
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো লাগয়
কাহ উপেখবি দেহ?
বইস বইস পহু কুসুমশয়ন 'পর
পদযুগ দেহ পসারি
সিক্ত চরণ তব মোছব যতনে
কুন্তলভার উঘারি।
শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর
রাখ বক্ষ 'পর মোর,
তনু তব ঘেরব পুলকিত পরশে
বাহু মৃণালক ডোর।
ভানু কহে বৃকভানুনন্দিনী
প্রেমসিন্ধু মম কালা
তোঁহার লাগয় প্রেমক লাগয়
সব কছু সহবে জালা।

১৫

মাধব, না কহ আদর বাণী,
  না কর প্রেমক নাম।
জানয়ি মুঝকো অবলা সরলা
  ছলনা না কর শ্যাম।
কপট, কাহ তুঁহু ঝূট বোলসি
  পীরিত করসি তু মোয় ?
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্ননু
  না পতিয়াব রে তোয়।
ছিদল তরী সম কপট প্রেম 'পর
  ডারনু যব মনপ্রাণ,
ডুবনু ডুবনু রে ঘোর সায়রে
  অব কুত নাহিক ত্রাণ।
মাধব, কঠোর বাত হমারা
  মনে লাগল কি তোর ?
মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ,
  ক্ষমহ গো কুবচন মোর!
নিদয় বাত অব কবহুঁ ন বোলব
  তুঁহু মম প্রাণক প্রাণ।
অতিশয় নির্মম, ব্যথিনু হিয়া তব
  ছোড়য়ি কুবচন-বাণ।
মিটল মান অব— ভানু হাসতহি
  হেরই পীরিত-লীলা।
কভু অভিমানিনী আদরিণী কভু
  পীরিতি-সাগর বালা।

১৬

সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব
মথুরাপুর যব যায়,
করল বিষম পণ মানিনী রাধা,
রোয়বে না সো, না দিবে বাধা,
কঠিন-হিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
শ্যামক করব বিদায়।
মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়ন-পান তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল,
দণ্ড দণ্ড সখি চাহয়ি রহল,
মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল
বিন্দু বিন্দু জল-ধার।
মৃদু মৃদু হাসে বৈঠল পাশে,
কহল শ্যাম কত মৃদু মধু ভাষে,
টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান,
গদগদ আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদল রাধা,
গদগদ ভাষ নিকাশল আধা,
শ্যামক চরণে বাহু পসারি,
কহল— শ্যাম রে, শ্যাম হমারি,
রহ তুঁহু, রহ তুঁহু, বঁধু গো রহ তুঁহু,
অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহু,
তুঁহু বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব,
আছয় কোন হমার!
পড়ল ভূমি 'পর শ্যামচরণ ধরি,
রাখল মুখ তছু শ্যামচরণ 'পরি,
উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি
রজনী করল প্রভাত।

মাধব বৈসল মৃদু মধু হাসল,
কত অশোয়াস বচন মিঠ ভাষল,
ধরইল বালিক হাত।
সখি লো, সখি লো বোল ত সখি লো
যত দুখ পাওল রাধা,
নিঠুর শ্যাম কিয়ে আপন মনমে
পাওল তছু কছু আধা?
হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি
বহুত স প্রবোধ দেল,
হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি
দূর দূর চলি গেল।
অব সো মথুরাপুরক পন্থমে,
ইঁহ যব রোয়ত রাধা,
মরমে কি লাগল তিলভর বেদন
চরণে কি তিলভর বাধা?
বরখি আঁখিজল ভানু কহে— অতি
দুখের জীবন ভাই।
হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু
কাঁদিবার কো নাই।

১৭

বার বার সখি বারণ করনু
ন যাও মথুরা ধাম।
বিসরি প্রেমদুখ, রাজভোগ যথি
করত হমারই শ্যাম।
ধিক তুঁহু দাম্ভিক, ধিক রসনা ধিক,
লইলি কাহারই নাম?
বোল ত সজনি, মথুরা অধিপতি
সো কি হমারই শ্যাম?

ধনকো শ্যাম সো, মথুরা পুরকো,
রাজ্য মানকো হোয়,
নহ পীরিতিকো, ব্রজ কামিনীকো,
নিচয় কহনু ময় তোয়।
যব তুঁহু ঠারবি, সো নব নরপতি
জনি রে করে অবমান,
ছিন্ন কুসুমসম ঝরব ধরা 'পর,
পলকে খোয়ব প্রাণ।
বিসরল বিসরল সো সব বিসরল
বৃন্দাবন সুখসঙ্গ,
নব নগরে সখি নবীন নাগর
উপজল নব নব রঙ্গ।
ভানু কহত— অয়ি বিরহকাতরা
মনমে বাঁধহ থেহ।
মুগুধা বালা, বুঝই বুঝলি না,
হমার শ্যামক লেহ।

১৮

হম যব না রব সজনী,
নিভৃত বসন্ত-নিকুঞ্জ-বিতানে
আসবে নির্ম্মল রজনী,
মিলন-পিপাসিত আসবে যব সখি
শ্যাম হমারি আশে,
ফুকারবে যব রাধা রাধা
মুরলী উরধ শ্বাসে,
যব সব গোপিনী আসবে ছুটই
যব হম আসব না;
যব সব গোপিনী জাগবে চমকই
যব হম জাগব না,

তব কি কুঞ্জপথ হমারি আশে
হেরবে আকুল শ্যাম ?
বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে
রাধা রাধা নাম ?
না যমুনা, সো এক শ্যাম মম
শ্যামক শত শত নারী ;
হম যব যাওব শত শত রাধা
চরণে রহবে তারি।
তব সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে,
কাহ তয়াগব দে ?
হমারি লাগি এ বৃন্দাবনমে
কহ সখি, রোয়ব কে ?
ভানু কহে চুপি— মানভরে রহ
আও বনে ব্রজ-নারী,
মিলবে শ্যামক থরথর আদর
ঝরঝর লোচন বারি।

১৯

মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান।

মরণ রে,
শ্যাম তোঁহারই নাম,
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহু ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আও রে আও।
ভুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি,
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহু নহি বিসরবি, তুঁহু নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহু বাঁশি বজাওসি,
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাটপর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা।
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর—

একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক পিয়া তুঁহু কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মুরতি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর।
ভানুসিংহ কহে— ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহু দেখ বিচারি।

২০

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হৃদয় কমল তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

বাঁশরি ধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,

উতল প্রাণ উতরোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,
চরণ-কমল যুগ ছোঁয়।
কো তুহু বোলবি মোয়!

গোপবধূজন বিকশিত যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর 'পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

তৃষিত আঁখি, তব মুখ 'পর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেম-রতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা থোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি,
জনম চরণ 'পর গোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

কড়ি ও কোমল

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দাদা মহাশয়
করকমলেষু

কবির মন্তব্য

যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। মনে পড়ে তখনকার দিনে নিজের মনের একটা উদ্বেল অবস্থা। তখন আমার বেশভূষায় আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর, তার খুঁটোয় বাঁধা ভোরবেলায় তোলা একমুঠো বেলফুল, পায়ে একজোড়া চটি। মনে আছে থ্যাকারের দোকানে বই কিনতে গেছি কিন্তু এর বেশি পরিচ্ছন্নতা নেই, এতে ইংরেজ দোকান-দারের স্বীকৃত আদবকায়দার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ হত। এই আত্ম-বিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা কড়ি ও কোমলের কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই রীতির কবিতা তখনো প্রচলিত ছিল না। সেইজন্যেই কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সাহিত্যবিচারকদের কাছ থেকে কটুভাষায় ভর্ৎসনা সহ্য করেছিলুম। সে-সব যে উপেক্ষা করেছি অনায়াসে সে কেবল যৌবনের তেজে। আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক। তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো একটা কাব্য-রীতির বাঁধা পথে চালনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণই ভুলে ছিলুম। আমাদের পরিবারের ব কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার প্রতি অনুরাগ আমার ছিল অভ্যস্ত। তাঁর প্রবর্তিত কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল। বড়োদাদার স্বপ্নপ্রয়াণের আমি ছিলুম অত্যন্ত ভক্ত, কিন্তু তাঁর বিশেষ কবিপ্রকৃতির সঙ্গে আমার বোধ হয় মিল ছিল না, সেইজন্যে ভালোলাগা সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব আমার কবিতা গ্রহণ করতে পারে নি। তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল। তার সঙ্গে বাহিরের কোনো মিশ্রণ যদি ঘটে

থাকে তো সে গৌণভাবে।

এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বারবার প্রবাহিত হয়েছে—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,—

যা নৈবেদ্যে আর এক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।

কড়ি ও কোমল

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

পুরাতন

হেথা হতে যাও, পুরাতন।
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।

সুনীল আকাশ 'পরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে,
পাখিরা ঝাড়িছে পাখা, কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা বালকে।
সমুখের সরোবরে আলো ঝিকিমিকি করে,
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর,
জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে বসে আছে মেয়ে,
শুনিছে পাতার মরমর।
কী জানি কত কী আশে চলিয়াছে চারিপাশে
কত লোক কত সুখে দুখে,
সবাই তো ভুলে আছে কেহ হাসে কেহ নাচে,
তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে।
বাতাস যেতেছে বহি তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস,
সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস।
উঠেছে প্রভাত-রবি, আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া।
বারেক যে চলে যায়, তারে তো কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া।
তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
লুকায়ে ধরার পানে চায় –
নিশীথের অন্ধকারে পুরানো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়!
কী দেখিতে আসিয়াছ! যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন।
স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত
ঝরে-পড়া পাতার মতন।
আজি বসন্তের বায় একেকটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতিদিন;

ধূলিতে মাটিতে রহি হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন।
ঢাকো তবে ঢাকো মুখ নিয়ে যাও দুঃখ সুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে,
হেথায় আলয় নাহি ; অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

নূতন

হেথাও তো পশে সূর্যকর।
ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে
বিদীরিল যে গিরি-শিখর—
বিশাল পর্বত কেটে, পাষাণ-হৃদয় ফেটে,
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—
প্রভাতে পুলকে ভাসি, বহিয়া নবীন হাসি,
হেথাও তো পশে সূর্যকর!
দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে তো যায় না সে রে,
শিহরি উঠে না আশঙ্কায়,
ভাঙা পাষাণের বুকে খেলা করে কোন্ সুখে,
হেসে আসে, হেসে চলে যায়।
হেরো হেরো, হায় হায়, যত প্রতিদিন যায়—
কে গাঁথিয়া দেয় তৃণজাল।
লতাগুলি লতাইয়া, বাহুগুলি বিথাইয়া
ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।
বজ্রদগ্ধ অতীতের, নিরাশার অতিথের
ঘোর স্তব্ধ সমাধি-আবাস,
ফুল এসে, পাতা এসে কেড়ে নেয় হেসে হেসে,
অন্ধকারে করে পরিহাস।

এরা সব কোথা ছিল, কেই বা সংবাদ দিল,
গৃহহারা আনন্দের দল—
বিশ্বে তিল শূন্য হলে, অনাহূত আসে চলে,
বাসা বাঁধে করি কোলাহল।
আনে হাসি, আনে গান, আনে রে নূতন প্রাণ,
সঙ্গে করে আনে রবিকর,
অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়
কাঁদিতে দেয় না অবসর।
বিষাদ বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া
তারে এরা করে না তো ভয়,
চারিদিক হতে তারে ছোটো ছোটো হাসি মারে,
অবশেষে করে পরাজয়।
এই যে রে মরুস্থল, দাবদগ্ধ ধরাতল,
এইখানে ছিল 'পুরাতন',
একদিন ছিল তার শ্যামল যৌবনভার,
ছিল তার দক্ষিণ-পবন।
যদি রে সে চলে গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,
শুষ্ক স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে,
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল।
সে কি চায় শুষ্ক বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন ?
আগেকার মতো করে স্নেহে তার নাম ধরে
উচ্ছ্বসিবে বসন্ত পবন ?
নহে নহে, সে কি হয়! সংসার জীবনময়
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয় রে, নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ, তোর হাসি গান।
ফোটা নব ফুলচয়, ওঠা নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।

যে যায় সে চলে যাক, সব তার নিয়ে যাক,
নাম তার যাক মুছে দিয়ে।
এ কি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি।
আয় রে কাঁদিয়া লই শুকাবে দু-দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারিধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোটো ছোটো সুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।
না রে, করিব না শোক, এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা।
সেও চলে যাবে কবে গীত গান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দু-দিনের খেলা।

উপকথা

মেঘের আড়ালে বেলা কখন যে যায়
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।
আর্দ্র-পাখা পাখিগুলি গীত গান গেছে ভুলি,
নিস্তব্ধে ভিজিছে তরুলতা।
বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা।
কভু মনে লয় হেন এ সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে।
উড়ন্ত মেঘের মতো ঘটনা ঘটিত কত,
সংসার উড়িত মনোরথে।

রাজপুত্র অবহেলে কোন্ দেশে যেত চলে,
কত নদী কত সিন্ধু পার।
সরোবর ঘাট আলা মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশভার।
সিন্ধুতীরে কত দূরে কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।
হাসি তার মণিকণা কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।
সাত ভাই একত্তরে চাঁপা হয়ে ফুটিত রে
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব একত্রে আছিল সব
দুটি ভাই সত্য আর ভুল।
বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা না ছিল কঠিন বাধা
নাহি ছিল বিধির বিধান,
হাসিকান্না লঘুকায়া শরতের আলোছায়া
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ।
আজি ফুরায়েছে বেলা, জগতের ছেলেখেলা
গেছে আলো-আঁধারের দিন।
আর তো নাই রে ছুটি, মেঘরাজ্য গেছে টুটি,
পদে পদে নিয়ম-অধীন।
মধ্যাহ্নে রবির দাপে বাহিরে কে রবে তাপে
আলয় গড়িতে সবে চায়
যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন
খেলারই মতন ভেঙে যায়।

যোগিয়া

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চলে,
রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে।
স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন যেন প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ বিদ্যুৎ-আলো নাচে।
জুঁই সরোবরতীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,
অতি মৃদু হাসি তার, বরষার বৃষ্টিধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
আজিকে আপন প্রাণে না জানি বা কোন্‌খানে
যোগিয়া রাগিণী গায় কে রে।
ধীরে ধীরে সুর তার মিলাইছে চারিধার
আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
গাছপালা চারিভিতে সংগীতের মাধুরীতে
মগ্ন হয়ে ধরে স্বপ্নছবি।
এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়,
রবি যেন আর কোনো রবি।
ভাবিতেছি মনে মনে কোথা কোন্‌ উপবনে
কী ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা, একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি।
তার কি পায়ের কাছে বাঁশিটি পড়িয়া আছে—
আলোছায়া পড়েছে কপোলে।
মলিন মালাটি তুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে।

বিষাদ-কাহিনী তার সাধ যায় শুনিবার
কোন্‌খানে তাহার ভবন।
তাহার আঁখির কাছে যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন।
এ কী রে আকুল ভাষা! প্রাণের নিরাশ আশা
পল্লবের মর্মরে মিশালো।
না জানি কাহারে চায় তার দেখা নাহি পায়
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।
এমন কত না প্রাতে চাহিয়া আকাশপাতে
কত লোক ফেলেছে নিশ্বাস,
সে সব প্রভাত গেছে তারা তার সাথে গেছে
লয়ে গেছে হৃদয়-হুতাশ।
এমন কত না আশা কত ম্লান ভালোবাসা
প্রতিদিন পড়িছে ঝরিয়া,
তাদের হৃদয়-ব্যথা তাদের মরণ-গাথা
কে গাইছে একত্র করিয়া।
পরস্পর পরস্পরে ডাকিতেছে নাম ধরে
কেহ তাহা শুনিতে না পায়।
কাছে আসে বসে পাশে, তবুও কথা না ভাষে
অশ্রুজলে ফিরে ফিরে যায়।
চায় তবু নাহি পায় অবশেষে নাহি চায়,
অবশেষে নাহি গায় গান,
ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া বনের ছায়ায় গিয়া
মুছে আসে সজল নয়ান।

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হেরো ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
উৎসবের হাসি-কোলাহল
শুনিতে পেয়েছে ভোরবেলা,
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া
তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
দেখিবারে আনন্দের খেলা।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশি
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন ;
চারিদিকে প্রভাতের আলো,
নয়নে লেগেছে বড়ো ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন।
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরনের বেশভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,
কত পরিজন দাসদাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন।

হেরো তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মার মায়া পায় নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে।
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা!
চেয়ে যেন মার মুখ পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে, 'মা গো এ কেমন ধারা।
এত বাঁশি, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন!'

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলি
ভাইবোন করি গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে—
আমি তো ওদের কেহ নই।
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে তো দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে করে নিয়ে
মুছায়ে তো দেয়নি নয়ন।
আপনার ভাই নেই বলে
ওরে কি রে ডাকিবে না কেহ?

আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ ?
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে ?

ওর প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড়ো বাঁশি,
দুয়ারেতে সজল নয়ন
এ বড়ো নিষ্ঠুর হাসিরাশি।
আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রধার,
গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নেই তার।
শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,
কী দিবে কিছুই নেই তার
চোখে শুধু অশ্রুজল আছে।
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি

সম্মুখে রয়েছে পড়ি যুগ-যুগান্তর।
অসীম নীলিমে লুটে ধরণী ধাইবে ছুটে,
প্রতিদিন আসিবে, যাইবে রবিকর।
প্রতিদিন প্রভাতে জাগিবে নরনারী,
প্রতিসন্ধ্যা শ্রান্তদেহে ফিরিয়া আসিবে গেহে,
প্রতিরাত্রে তারকা ফুটিবে সারি সারি।
কত আনন্দের ছবি, কত সুখ আশা,
আসিবে যাইবে হায়, সুখ-স্বপনের প্রায়
কত প্রাণে জাগিবে, মিলাবে ভালোবাসা।
তখনো ফুটিবে হেসে কুসুম-কানন,
তখনো রে কত লোকে কত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
আঁকিবে আকাশ-পটে সুখের স্বপন।
নিবিলে দিনের আলো, সন্ধ্যা হলে, নিতি
বিরহী নদীর ধারে না জানি ভাবিবে কারে,
না জানি সে কী কাহিনী, কী সুখ, কী স্মৃতি।

দূর হতে আসিতেছে, শুন কান পেতে—
কত গান, সেই মহা-রঙ্গভূমি হতে।
কত যৌবনের হাসি, কত উৎসবের বাঁশি,
তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে।
কত মিলনের গীত, বিরহের শ্বাস,
তুলেছে মর্মর তান বসন্ত-বাতাস,
সংসারের কোলাহল ভেদ করি অবিরল
লক্ষ নব কবি ঢালে প্রাণের উচ্ছ্বাস।

ওই দূর খেলাঘরে খেলাইছ কারা!
উঠেছে মাথার 'পরে আমাদেরি তারা

আমাদেরি ফুলগুলি সেথাও নাচিছে তুলি,
আমাদেরি পাখিগুলি গেয়ে হল সারা।
ওই দূর খেলাঘরে করে আনাগোনা
হাসে কাঁদে কত কে যে নাহি যায় গনা।
আমাদের পানে হায়, ভুলেও তো নাহি চায়,
মোদের ওরা তো কেউ ভাই বলিবে না।
ওই সব মধুমুখ অমৃত-সদন,
না জানি রে আর কারা করিবে চুম্বন।
শরমময়ীর পাশে বিজড়িত আধ-ভাষে
আমরা তো শুনাব না প্রাণের বেদন।

আমাদের খেলাঘরে কারা খেলাইছ!
সাঙ্গ না হইতে খেলা চলে এনু সন্ধেবেলা,
ধূলির সে ঘর ভেঙে কোথা ফেলাইছ।
হোথা, যেথা বসিতাম মোরা দুই জন,
হাসিয়া কাঁদিয়া হত মধুর মিলন,
মাটিতে কাটিয়া রেখা কত লিখিতাম লেখা,
কে তোরা মুছিলি সেই সাধের লিখন।
সুধাময়ী মেয়েটি সে হোথায় লুটিত,
চুমো খেলে হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিত।
তাই রে মাধবীলতা মাথা তুলেছিল হোথা,
ভেবেছিনু চিরদিন রবে মুকুলিত।
কোথায় রে, কে তাহারে করিলি দলিত।

ওই যে শুকানো ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে,
উহার মরম-কথা বুঝিতে নারিলে।
ও যেদিন ফুটেছিল, নব রবি উঠেছিল,
কানন মাতিয়াছিল বসন্ত-অনিলে।
ওই যে শুকায় চাঁপা পড়ে একাকিনী,
তোমরা তো জানিবে না উহার কাহিনী।

কবে কোন্ সন্ধেবেলা ওরে তুলেছিল বালা,
ওরি মাঝে বাজে কোন্ পুরবী রাগিণী।
যারে দিয়েছিল ওই ফুল উপহার,
কোথায় সে গেছে চলে, সে তো নেই আর।
একটু কুসুমকণা তাও নিতে পারিল না,
ফেলে রেখে যেতে হল মরণের পার;
কত সুখ, কত ব্যথা, সুখের দুখের কথা
মিশিছে ধূলির সাথে ফুলের মাঝার।

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগ-যুগান্তর।

মথুরায়

বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?

বিকচ বকুল ফুল দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়।
এ নহে কি বৃন্দাবন? কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুরধ্বনি বনপথে শুনা যায়?
একা আছি বনে বসি, পীত ধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখশশী পরান মজিল সই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?

এক বার রাধে রাধে ডাক্ বাঁশি মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।

কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতীমালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, এ নিশি পোহায়, হায়।
কবি যে হল আকুল, এ কি রে বিধির ভুল।
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই।
বাঁশরি বাজাতে গিয়ে বাঁশরি বাজিল কই ?

বনের ছায়া

কোথা রে তরুর ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ।
তট-তরু কোলে কোলে সারাদিন কলরোলে
স্রোতস্বিনী যায় চলে সুদূরে সাধের গেহ ;
কোথা রে তরুর ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ।
কোথা রে সুনীল দিশে বনান্ত রয়েছে মিশে
অনন্তের অনিমিষে নয়ন নিমেষ-হারা।
দূর হতে বায়ু এসে চলে যায় দূর-দেশে,
গীত-গান যায় ভেসে কোন্ দেশে যায় তারা।
হাসি, বাঁশি, পরিহাস, বিমল সুখের শ্বাস,
মেলামেশা বারো মাস নদীর শ্যামল তীরে ;
কেহ খেলে, কেহ দোলে ঘুমায় ছায়ার কোলে
বেলা শুধু যায় চলে কুলুকুলু নদীনীরে।
বকুল কুড়োয় কেহ কেহ গাঁথে মালাখানি ;
ছায়াতে ছায়ার প্রায়, বসে বসে গান গায়
করিতেছে কে কোথায় চুপিচুপি কানাকানি।
খুলে গেছে চুলগুলি, বাঁধিতে গিয়েছে ভুলি
আঙুলে ধরেছে তুলি আঁখি পাছে ঢেকে যায়,
কাঁকন খসিয়া গেছে খুঁজিছে গাছের ছায়।
বনের মর্মের মাঝে বিজনে বাঁশরি বাজে,
তারি সুরে মাঝে মাঝে ঘুঘু দুটি গান গায়।

ঝুরু ঝুরু কত পাতা গাহিছে বনের গাথা,
কত না মনের কথা তারি সাথে মিশে যায়।
লতাপাতা কত শত খেলে কাঁপে কত মতো
ছোটো ছোটো আলোছায়া ঝিকিমিকি বন ছেয়ে,
তারি সাথে তারি মতো খেলে কত ছেলেমেয়ে।

কোথায় সে গুন গুন ঝরঝর মরমর,
কোথা সে মাথার পরে লতাপাতা থরথর।
কোথায় সে ছায়া আলো, ছেলেমেয়ে খেলাধূলি,
কোথা সে ফুলের মাঝে এলোচুলে হাসিগুলি।
কোথা রে সরল প্রাণ, গভীর আনন্দ-গান,
অসীম শান্তির মাঝে প্রাণের সাধের গেহ,
তরুর শীতল ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ।

কোথায়

হায় কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!
হায়, কোথা যাবে!

কঠিন বিপুল এ জগৎ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে।
হায়, কোথা যাবে!

মোরা কেহ সাথে রহিব না,
মোরা কেহ কথা কহিব না।
নিমেষ যেমনি যাবে, আমাদের ভালোবাসা

আর নাহি পাবে।
হায়, কোথা যাবে!

মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়;
মহা সে বিজন মাঝে হয়তো বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে!

দেখো, এই ফুটিয়াছে ফুল,
বসন্তেরে করিছে আকুল;
পুরানো সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
কত স্নেহভাবে,
হায়, কোথা যাবে!

খেলাধুলা পড়ে না কি মনে,
কত কথা স্নেহের স্মরণে।
সুখে দুখে শত ফেরে সে-কথা জড়িত যে রে,
সেও কি ফুরাবে!
হায়, কোথা যাবে!

চিরদিন তরে হবে পর,
এ-ঘর রবে না তব ঘর।
যারা ওই কোলে যেত, তারাও পরের মতো,
বারেক ফিরেও নাহি চাবে।
হায়, কোথা যাবে!

হায়, কোথা যাবে!
যাবে যদি, যাও যাও, অশ্রু তব মুছে যাও,
এইখানে দুঃখ রেখে যাও।
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে, তাই যেন সেথা মিলে,

আরামে ঘুমাও।
যাবে যদি, যাও।

শান্তি

থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা, ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে।
আবার যদি জেগে ওঠে বাছা কান্না দেখে কান্না পাবে যে।
কত হাসি হেসে গেছে ও, মুছে গেছে কত অশ্রুধার,
হেসে কেঁদে আজ ঘুমাল, ওরে তোরা কাঁদাসনে আর।

কত রাত গিয়েছিল হায়, বয়েছিল বসন্তের বায়,
পুবের জানালাখানি দিয়ে চন্দ্রালোক পড়েছিল গায় ;
কত রাত গিয়েছিল হায়, দূর হতে বেজেছিল বাঁশি,
সুরগুলি কেঁদে ফিরেছিল বিছানার কাছে কাছে আসি।
কত রাত গিয়েছিল হায় কোলেতে শুকানো ফুলমালা
নত মুখে উলটি পালটি চেয়ে চেয়ে কেঁদেছিল বালা।
কত দিন ভোরে শুকতারা উঠেছিল ওর আঁখি 'পরে,
সমুখের কুসুম-কাননে ফুল ফুটেছিল থরে থরে।
একটি ছেলেরে কোলে নিয়ে বলেছিল সোহাগের ভাষা,
কারেও বা ভালোবেসেছিল, পেয়েছিল কারো ভালোবাসা!
হেসে হেসে গলাগলি করে খেলেছিল যাহাদের নিয়ে,
আজো তারা ওই খেলা করে, ওর খেলা গিয়েছে ফুরিয়ে
সেই রবি উঠেছে সকালে ফুটেছে সুমুখে সেই ফুল,
ও কখন খেলাতে খেলাতে মাঝখানে ঘুমিয়ে আকুল।
শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয়-বেদনা।
চুপ করে চেয়ে দেখো ওরে, থামো থামো হেসো না কেঁদো না

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাষাণী মা

হে ধরণী, জীবের জননী
শুনেছি যে মা তোমায় বলে,
তবে কেন তোর কোলে সবে
কেঁদে আসে কেঁদে যায় চলে।
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিয়াসা।
কেন চায়, কেন কাঁদে সবে,
কেন কেঁদে পায় না ভালোবাসা
কেন হেথা পাষাণ-পরান,
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর।
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে দেয় দূর।
কাঁদিয়া যে ফিরে চলে যায়,
তার তরে কাঁদিসনে কেহ,
এই কি মা জননীর প্রাণ,
এই কি মা জননীর স্নেহ!

হৃদয়ের ভাষা

হৃদয়. কেন গো মোরে ছলিছ সতত,
আপনার ভাষা তুমি শিখাও আমায়।
প্রত্যহ আকুল কণ্ঠে গাহিতেছি কত,
ভগ্ন বাঁশরিতে শ্বাস করে হায় হায়!
সন্ধ্যাকালে নেমে যায় নীরব তপন
সুনীল আকাশ হতে সুনীল সাগরে।

আমার মনের কথা, প্রাণের স্বপন
ভাসিয়া উঠিছে যেন আকাশের 'পরে।
ধ্বনিছে সন্ধ্যার মাঝে কার শান্ত বাণী,
ও কি রে আমারি গান? ভাবিতেছি তাই।
প্রাণের যে কথাগুলি আমি নাহি জানি,
সে-কথা কেমন করে জেনেছে সবাই।
মোর হৃদয়ের গান সকলেই গায়,
গাহিতে পারিনে তাহা আমি শুধু হায়।

পত্র

নৌকাযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন স্থলচরবরেষু

জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে, চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।
এখানে যে বাস করা দায় ভনভনানির বাজারে,
প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে হট্টগোলের মাঝারে।
কানে যখন তালা ধরে উঠি যখন হাঁপিয়ে
কোথায় পালাই, কোথায় পালাই— জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে
গঙ্গাপ্রাপ্তির আশা করে গঙ্গাযাত্রা করেছিলেম।
তোমাদের না বলে কয়ে আস্তে আস্তে সরেছিলেম।

দুনিয়ার এ মজলিসেতে এসেছিলেম গান শুনতে;
আপন মনে গুনগুনিয়ে রাগ-রাগিণীর জাল বুনতে।
গান শোনে সে কাহার সাধ্যি, ছোঁড়াগুলো বাজায় বাদ্যি,
বিদ্যেখানা ফাটিয়ে ফেলে থাকে তারা তুলো ধুনতে।
ডেকে বলে, হেঁকে বলে, ভঙ্গি করে বেঁকে বলে—

"আমার কথা শোনো সবাই গান শোনো আর নাই শোনো!
গান যে কাকে বলে সেইটে বুঝিয়ে দেব, তাই শোনো।"

টীকে করেন ব্যাখ্যা করেন, জেঁকে ওঠে বক্তিমে,
কে দেখে তার হাত-পা নাড়া, চক্ষু দুটোর রক্তিমে।
চন্দ্রসূর্য জ্বলছে মিছে আকাশখানার চালাতে—
তিনি বলেন, "আমিই আছি জ্বলতে এবং জ্বালাতে।"
কুঞ্জবনের তানপুরোতে স্বর বেঁধেছে বসন্ত,
সেটা শুনে নাড়েন কর্ণ হয় নাকো তাঁর পছন্দ।
তাঁরি সুরে গাক না সবাই টপ্পা খেয়াল ধ্রুবোদ,—
গায় না যে কেউ আসল কথা নাইকো কারো সুরবোধ!
কাগজওয়ালা সারি সারি নাড়ছে কাগজ হাতে নিয়ে—
বাঙলা থেকে শান্তি বিদায় তিন-শ কুলোর বাতাস দিয়ে!
কাগজ দিয়ে নৌকা বানায় বেকার যত ছেলেপিলে,
কর্ণ ধরে পার করবেন দু-এক পয়সা খেয়া দিলে।
সস্তা শুনে ছুটে আসে যত দীর্ঘকর্ণগুলো—
বঙ্গদেশের চতুর্দিকে তাই উড়েছে এত ধুলো।
খুদে খুদে 'আর্য' গুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন, "আমিই কল্কি," গাঁজার কল্কি হবে বুঝি!
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।

পাড়ায় এমন কত আছে কত কব তার,
বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা-অবতার।
দাঁতের জোরে হিন্দুশাস্ত্র তুলবে তারা পাঁকের থেকে,
দাঁতকপাটি লাগে, তাদের দাঁত-খিঁচুনির ভঙ্গি দেখে।
আগাগোড়াই মিথ্যে কথা, মিথ্যেবাদীর কোলাহল,
জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।
বাক্যবন্যা ফেনিয়ে আসে ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে,
কোনোক্রমে রক্ষে পেলাম মা-গঙ্গারি ক্রোড়ে।

হেথায় কিবা শান্তি-ঢালা কুলুকুলু তান।
সাগর পানে বহন করে গিরিরাজের গান।
ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয় জলের গায়ে কাঁটা।
আকাশেতে আলো-আঁধার খেলে জোয়ারভাঁটা।
তীরে তীরে গাছের সারি পল্লবেরি ঢেউ।
সারাদিবস হেলে দোলে দেখে না তো কেউ।
পূর্বতীরে তরুশিরে অরুণ হেসে চায়—
পশ্চিমেতে কুঞ্জমাঝে সন্ধ্যা নেমে যায়।
তীরে ওঠে শঙ্খধ্বনি ধীরে আসে কানে,
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে ধরণীর পানে।
ঝাউবনের আড়ালেতে চাঁদ ওঠে ধীরে,
ফোটে সন্ধ্যাদীপগুলি অন্ধকার তীরে।
এই শান্তি-সলিলেতে দিয়েছিলেম ডুব,
হট্টগোলটা ভুলেছিলেম সুখে ছিলেম খুব।

জান তো ভাই আমি হচ্ছি জলচরের জাত,
আপন মনে সাঁতরে বেড়াই— ভাসি যে দিনরাত।
রোদ পোহাতে ডাঙায় উঠি, হাওয়াটি খাই চোখ বুজে,
ভয়ে ভয়ে কাছে এগোই তেমন তেমন লোক বুঝে।
গতিক মন্দ দেখলে আবার ডুবি অগাধ জলে,
এমনি করেই দিনটা কাটাই লুকোচুরির ছলে।
তুমি কেন ছিপ ফেলেছ শুকনো ডাঙায় বসে?
বুকের কাছে বিদ্ধ করে টান মেরেছ কষে।
আমি তোমায় জলে টানি তুমি ডাঙায় টানো,
অটল হয়ে বসে আছ হার তো নাহি মানো।
আমারি নয় হার হয়েছে তোমারি নয় জিত—
খাবি খাচ্ছি ডাঙায় পড়ে হয়ে পড়ে চিত।
আর কেন ভাই, ঘরে চলো, ছিপ গুটিয়ে নাও,
রবীন্দ্রনাথ পড়ল ধরা ঢাক পিটিয়ে দাও।

বিরহীর পত্র

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
দূরে গেলে এই মনে হয় ;
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
জেগে থাকে সতত সংশয়।
এত লোক, এত জন, এত পথ গলি,
এমন বিপুল এ সংসার,
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি
ছাড়া পেলে কে আর কাহার।

তারায় তারায় সদা থাকে চোখে চোখে
অন্ধকারে অসীম গগনে।
ভয়ে ভয়ে অনিমেষে কম্পিত আলোকে
বাঁধা থাকে নয়নে নয়নে।
চৌদিকে অটল স্তব্ধ সুগভীর রাত্রি,
তরুহীন মরুময় ব্যোম,
মুখে মুখে চেয়ে তাই চলে যত যাত্রী
চলে গ্রহ রবি তারা সোম।

নিমেষের অন্তরালে কী আছে কে জানে,
নিমেষে অসীম পড়ে ঢাকা—
অন্ধ কাল-তুরঙ্গম রাশ নাহি মানে
বেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা।
কাছে কাছে পাছে পাছে চলিবারে চাই
জেগে জেগে দিতেছি পাহারা,
একটু এসেছে ঘুম—চমকি তাকাই
গেছে চলে কোথায় কাহারা!

ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কাঁদি তাই একা
বিরহের সমুদ্রের তীরে।
অনন্তের মাঝখানে দু-দণ্ডের দেখা
তাও কেন রাহু এসে ঘিরে।
মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়
পাঠায় সে বিরহের চর।
সকলেই চলে যাবে পড়ে রবে হায়
ধরণীর শূন্য খেলাঘর।

গ্রহ তারা ধূমকেতু কত রবি শশী
শূন্য ঘেরি জগতের ভিড়,
তারি মাঝে যদি ভাঙে, যদি যায় খসি
আমাদের দু-দণ্ডের নীড়,—
কোথায় কে হারাইব-- কোন্ রাত্রিবেলা
কে কোথায় হইব অতিথি।
তখন কি মনে রবে দু-দিনের খেলা
দরশের পরশের স্মৃতি।

তাই মনে করে কি রে চোখে জল আসে
একটুকু চোখের আড়ালে।
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভালোবাসে
সেও কি রবে না এক কালে।
আশা নিয়ে এ কি শুধু খেলাই কেবল—
সুখ দুঃখ মনের বিকার।
ভালোবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল,
চায়, পায়, হারায় আবার।

মঙ্গল-গীত

শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। নাসিক

এতবড়ো এ ধরণী মহাসিন্ধু ঘেরা,
তুলিতেছে আকাশ সাগরে,—
দিন-দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা যাব খেলা করে।
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি,
অরণ্য বহিছে ফুল-ফল,—
শত কোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি
গনিতেছে প্রতি দণ্ড পল।

শুধু কি মা হাসিখেলা প্রতি দিনরাত,
দিবসের প্রত্যেক প্রহর।
প্রভাতের পরে আসি নূতন প্রভাত
লিখিছে কি একই অক্ষর।
কানাকানি হাসাহাসি কোণেতে গুটায়ে
অলস নয়ন নিমীলন,
দণ্ড-দুই ধরণীর ধূলিতে লুটায়ে
ধূলি হয়ে ধূলিতে শয়ন।

নাই কি মা, মানবের গভীর ভাবনা,
হৃদয়ের সীমাহীন আশা।
জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা,
জীবনের অনন্ত পিপাসা।
হৃদয়েতে শুষ্ক কি মা উৎস করুণার,
শুনি না কি দুখীর ক্রন্দন।
জগৎ শুধু কি মা গো তোমার আমার
ঘুমাবার কুসুম-আসন।

শুনো না কাহারা ওই করে কানাকানি
অতি তুচ্ছ ছোটো ছোটো কথা।
পরের হৃদয় লয়ে করে টানাটানি
শকুনির মতো নির্মমতা।
শুনো না করিছে কারা কথা-কাটাকাটি
মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে,
রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি,
আপনার বুদ্ধিরে বাখানে।

তুমি এস দূরে এস, পবিত্র নিভৃতে,
ক্ষুদ্র অভিমান যাও ভুলি।
সযতনে ঝেড়ে ফেলো বসন হইতে
প্রতি নিমেষের যত ধূলি।
নিমেষের ক্ষুদ্র কথা ক্ষুদ্র রেণুজাল
আচ্ছন্ন করিছে মানবেরে,
উদার অনন্ত তাই হতেছে আড়াল
তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরে।

আছে মা তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ,
হৃদয়েতে উষার আভাস,
খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন,
চারিদিকে মর্তের প্রবাস।
আপনার ছায়া ফেলি আমরা সকলে
পথ তোর অন্ধকারে ঢাকি,
ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজে, ক্ষুদ্র শত ছলে,
কেন তোরে ভুলাইয়া রাখি।

কেন মা, তোমারে কেহ চাহে না জানাতে
মানবের উচ্চ কুলশীল,
অনন্তজগৎ ব্যাপী ঈশ্বরের সাথে
তোমার যে সুগভীর মিল।

কেন কেহ দেখায় না, চারিদিকে তব
ঈশ্বরের বাহুর বিস্তার।
ঘেরি তোরে, ভোগ-সুখ ঢালি নব নব
গৃহ বলি রচে কারাগার।

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি,
চেয়ে দেখো আকাশের পানে,
পড়ুক বিমল বিভা, পূর্ণ রূপরাশি
স্বর্গমুখী কমল-নয়ানে।
আনন্দে ফুটিয়া ওঠো শুভ্র সূর্যোদয়ে
প্রভাতের কুসুমের মতো
দাঁড়াও সায়াহ্নমাঝে পবিত্র হৃদয়ে
মাথাখানি করিয়া আনত।

শোনো শোনো উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল।
বিশ্ব-চরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল।
যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উঠেছে সংগীত কোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল্।

যাত্রা করি বৃথা যত অহংকার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা-দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে,
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মা গো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ-শোক।

জেনো মা এ সুখে-দুঃখে আকুল সংসারে
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ,
তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
কোরো না কোরো না অবিশ্বাস।
সুখ ব'লে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কী যে চাই জানি না আপনি,
আঁধারে জ্বলিছে ওই, ওরে কোরো ভয়,
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি।

ক্ষুদ্র সুখ ভেঙে যায় না সহে নিশ্বাস,
ভাঙে বালুকার খেলাঘর,
ভেঙে গিয়ে বলে দেয়, এ নহে আবাস,
জীবনের এ নহে নির্ভর।
সকলে শিশুর মতো কত আবদার
আনিছে তাঁহার সন্নিধান,
পূর্ণ যদি নাহি হল, অমনি তাহার
ঈশ্বরে করিছে অপমান।

কিছুই চাব না মা গো আপনার তরে,
পেয়েছি যা শুধিব সে ঋণ,
পেয়েছি যে প্রেমসুধা হৃদয় ভিতরে,
ঢালিয়া তা দিব নিশিদিন।
সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ,
নিশিদিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।

মধুপাত্রে হতপ্রাণ পিপীলির মতো
ভোগসুখে জীর্ণ হয়ে থাকা,
ঝুলে থাকা বাদুড়ের মতো শির নত
আঁকড়িয়া সংসারের শাখা।

জগতের হিসাবেতে শূন্য হয়ে হায়
আপনারে আপনি ভক্ষণ,
ফুলে উঠে ফেটে যাওয়া জলবিম্ব প্রায়
এই কি রে সুখের লক্ষণ।

এই অহিফেন-সুখ কে চায় ইহাকে
মানবত্ব এ নয় এ নয়।
রাহুর মতন সুখ গ্রাস করে রাখে
মানবের মানব-হৃদয়।
মানবেরে বল দেয় সহস্র বিপদ,
প্রাণ দেয় সহস্র ভাবনা,
দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা।

চিরদিবসের সুখ রয়েছে গোপন
আপনার আত্মার মাঝার।
চারিদিকে সুখ খুঁজে শ্রান্ত প্রাণমন,
হেথা আছে, কোথা নেই আর।
বাহিরের সুখ সে, সুখের মরীচিকা,
বাহিরেতে নিয়ে যায় ছলে,
যখন মিলায়ে যায় মায়া-কুহেলিকা,
কেন কাঁদি সুখ নেই বলে।

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে
চিরজ্যোতি চিরছায়াময়।
ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে
জীবনের অনন্ত আলয়।
পুণ্যজ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসিখানি,
অন্নপূর্ণা জননী সমান,
মহাসুখে সুখ-দুঃখ কিছু নাহি মানি
কর সবে সুখশান্তি দান।

মা, আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা ;
মানবেরে জ্যোতি দাও, করো আশীর্বাদ,
অকলঙ্ক মূর্তি মধুরিমা।
কাছে থেকে এত কথা বলা নাহি হয়,
হেসে খেলে দিন যায় কেটে,
দূরে ভয় হয় পাছে না পাই সময়,
বলিবার সাধ নাহি মেটে।

কত কথা বলিবারে চাহি প্রাণপণে
কিছুতে মা, বলিতে না পারি,
স্নেহমুখখানি তোর পড়ে মোর মনে,
নয়নে উথলে অশ্রুবারি।
সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্বাদ করো মা গ্রহণ।

বান্দোরা

২

শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। নাসিক

চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ 'পরে ঢেউ
গরজনে বধির শ্রবণ,
তীর কোন্‌দিকে আছে নাহি জানে কেউ,
হা হা করে আকুল পবন।

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যেদিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সেদিকে হেরিবে সবে পথ।

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে
মানে না বাহুর আক্রমণ।
একটি আলোকশিখা সমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।
এস মা উষার আলো, অকলঙ্ক প্রাণ,
দাঁড়াও এ সংসার-আঁধারে।
জাগাও জাগ্রত হৃদে আনন্দের গান,
কূল দাও নিদ্রার পাথারে।

চারিদিকে নৃশংসতা করে হানাহানি,
মানবের পাষাণ পরান।
শাণিত ছুরির মতো বিঁধাইয়া বাণী,
হৃদয়ের রক্ত করে পান।
তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল
উল্কাধারা করিছে বর্ষণ,
শ্যামল আশার ক্ষেত্র করিয়া বিফল
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ।

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি দুটি সকরুণ চোখ,
পড়ুক দু-ফোঁটা অশ্রু জগতের 'পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।

ব্যথিত করুক ম্লান তোমার নয়নে,
করুণার অমৃত-নির্ঝরে,
তোমারে কাতর হেরি, মানবের মনে
দয়া হবে মানবের 'পরে।

সমুদয় মানবের সৌন্দর্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই-চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্যে হোক মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।

বান্দোরা

৩

শ্রীমতী ইন্দিরা। প্রাণাধিকাসু। নাসিক

আমার এ গান, মা গো, শুধু কি নিমেষে
মিলাইবে হৃদয়ের কাছাকাছি এসে।
আমার প্রাণের কথা
নিদ্রাহীন আকুলতা
শুধু নিশ্বাসের মতো যাবে কি মা ভেসে।

এ গান তোমারে সদা ঘিরে যেন রাখে,
সত্যের পথের 'পরে নাম ধরে ডাকে।
সংসারের সুখে দুখে
চেয়ে থাকে তোর মুখে,
চির-আশীর্বাদ সম কাছে কাছে থাকে।

বিজনে সঙ্গীর মতো করে যেন বাস ;
অনুক্ষণ শোনে তোর হৃদয়ের আশ।
পড়িয়া সংসার-ঘোরে
কাঁদিতে হেরিলে তোরে
ভাগ করে নেয় যেন দুখের নিশ্বাস।

সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে
মধুমাখা বিষবাণী দুর্বল পরানে,
এ গান আপন সুরে
মন তোর রাখে পুরে,
ইষ্টমন্ত্রসম সদা বাজে তোর কানে।

আমার এ গান যেন সুদীর্ঘ জীবন
তোমার বসন হয় তোমার ভূষণ।
পৃথিবীর ধূলিজাল
করে দেয় অন্তরাল,
তোমারে করিয়া রাখে সুন্দর শোভন।

আমার এ গান যেন নাহি মানে মানা,
উদার বাতাস হয়ে এলাইয়া ডানা
সৌরভের মতো তোরে
নিয়ে যায় চুরি করে,
খুঁজিয়া দেখাতে যায় স্বর্গের সীমানা।

এ গান যেন রে হয় তোর ধ্রুবতারা
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সারা।
তোমার মুখের 'পরে
জেগে থাকে স্নেহভরে
অকূলে নয়ন মেলি দেখায় কিনারা।

আমার এ গান যেন পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় সমস্ত পরানে।
তপ্ত শোণিতের মতো
বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া উঠে মহত্ত্বের গানে।

এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে,
আঁখিতারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে।
এ যেন রে করে দান
সতত নূতন প্রাণ,
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে।

যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি,
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি।
যবে হায় সব গান
হয়ে যাবে অবসান,
এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি

খেলা

পথের ধারে অশথতলে
মেয়েটি খেলা করে;
আপন মনে আপনি আছে
সারাটি দিন ধরে।
উপর পানে আকাশ শুধু,
সমুখ পানে মাঠ,
শরৎকালে রোদ পড়েছে
মধুর পথঘাট।

দুটি একটি পথিক চলে
গল্প করে, হাসে।
লজ্জাবতী বধূটি গেল
ছায়াটি নিয়ে পাশে।
আকাশ-ঘেরা মাঠের ধারে
বিশাল খেলাঘরে,
একটি মেয়ে আপন মনে
কতই খেলা করে।

মাথার 'পরে ছায়া পড়েছে
রোদ পড়েছে কোলে,
পায়ের কাছে একটি লতা
বাতাস পেয়ে দোলে।
মাঠের থেকে বাছুর আসে
দেখে নূতন লোক,
ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে
ড্যাবা ড্যাবা চোখ।
কাঠবিড়ালি উস্থুখুস্থু
আশেপাশে ছোটে,
শব্দ পেলে লেজটি তুলে
চমক খেয়ে ওঠে।
মেয়েটি তাই চেয়ে দেখে
কত যে সাধ যায়,
কোমল গায়ে হাত বুলায়ে
চুমো খেতে চায়।

সাধ যেতেছে কাঠবিড়ালি
তুলে নিয়ে বুকে,
ভেঙে ভেঙে টুকুটুকু
খাবার দেবে মুখে।

মিষ্টি নামে ডাকবে তারে
গালের কাছে রেখে,
বুকের মধ্যে রেখে দেবে
আঁচল দিয়ে ঢেকে।
"আয় আয়" ডাকে সে তাই
করুণ স্বরে কয়,
"আমি কিছু বলব না তো
আমায় কেন ভয়।"
মাথা তুলে চেয়ে থাকে
উঁচু ডালের পানে,
কাঠবিড়ালি ছুটে পালায়
ব্যথা সে পায় প্রাণে।

রাখাল ছেলের বাঁশি বাজে
সুদূর তরুছায়,
খেলতে খেলতে মেয়েটি তাই
খেলা ভুলে যায়।
তরুর মূলে মাথা রেখে
চেয়ে থাকে পথে,
না জানি কোন্ পরীর দেশে
ধায় সে মনোরথে।
একলা কোথায় ঘুরে বেড়ায়
মায়াদ্বীপে গিয়ে;
হেনকালে চাষী আসে
দুটি গোরু নিয়ে।
শব্দ শুনে কেঁপে ওঠে
চমক ভেঙে চায়।
আঁখি হতে মিলায় মায়া
স্বপন টুটে যায়।

বসন্ত অবসান

কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান।
কখন বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান।
কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান॥

এবার বসন্তে কি রে যূথীগুলি জাগেনি রে?
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করেনি কি মধুপান?
এবার কি সমীরণ জাগায়নি ফুলবন,
সাড়া দিয়ে গেল না তো, চলে গেল ম্রিয়মান।
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান॥

যতগুলি পাখি ছিল গেয়ে বুঝি চলে গেল,
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপ-তান।
ভেঙেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি-খেলা,
এতক্ষণে সন্ধ্যাবেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ।
কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান॥

বসন্তের শেষ রাতে এসেছি রে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা কী তোমারে করি দান।
কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে ছল ছল অভিমান।
এবার বসন্ত গেল, হল না, হল না গান॥

বাঁশি

ওগো শোনো কে বাজায়।
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোনো কে বাজায়॥

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে,
যমুনারি কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়।
ওগো শোনো কে বাজায়॥

বিরহ

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে॥
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া॥
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।

আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি
কার দরশন যাচি রে।
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া
তাই আমি বসে আছি রে।
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন-আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া।
ওগো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুলবনে মধু-সমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে॥

ওই বাঁশি-স্বর তার আসে বারবার
সেই শুধু কেন আসে না।
এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে
যামিনী যে ওঠে শিহরি॥
ওগো যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে,
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কী!
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল
দেখে তারে আমি মরিব॥

বাকি

কুসুমের গিয়েছে সৌরভ,
জীবনের গিয়েছে গৌরব।
এখন যা-কিছু সব ফাঁকি,
ঝরিতে মরিতে শুধু বাকি।

বিলাপ

ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি।
তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
সেথা কি বাজে না বাঁশরি।
সখী হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন
সেথা কি পবন বহে না।
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ
মোর কথা তারে কহে না।
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী
আমারে ভুলাল কেন সে?
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন
এই ছিল তার মানসে।
যবে কুসুম-শয়নে নয়নে নয়নে
কেটেছিল সুখ-রাতি রে,
তবে কে জানিত তার বিরহ আমার
হবে জীবনের সাথি রে॥
যদি মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা পরানের আশা
চরণের তলে রেখে আয়।

আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার
কত আর ঢেকে রাখি বল্।
আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে
একফোঁটা তার আঁখিজল।
না না এত প্রেম সখী ভুলিতে যে পারে
তারে আর কেহ সেধো না।
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব,
মনে মনে স'ব বেদনা।
ওগো মিছে, মিছে সখী, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরানের বাসনা।
ওগো সুখ-দিন হায় যবে চলে যায়
আর ফিরে আর আসে না॥

সারাবেলা

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপন সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়ন-সলিল
রেখে যায় এই নয়ন-কোণে।
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।

সারাদিন গাঁথি গান
কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতন
বসে আছি ফুলবনে ॥

আকাঙ্ক্ষা

আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ-বিহগী কী যে গায়।
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়।
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায় ॥

আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো।
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
"এ নহে, এ নহে, নয় গো।"
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে,
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন্ উপবনে বিরহ বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায় ॥

আমি যদি গাঁথি গান অথির পরান
সে গান শুনাব কারে আর
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার।

আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়।
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়॥

তুমি

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা!
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা।
কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে,
ঐ নয়নের তারা॥
তুমি কথা ক'য়ো না,
তুমি চেয়ে চলে যাও।
এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গলে যাও।
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ-ধারা॥

গান

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে।
আমার ঘরে কেহ নাই যে।
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে॥
তার আকুল পরান বিরহের গান
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে।
আমি আমার কথা তারে জানাব কী করে,
প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে॥
কুসুমের মালা গাঁথা হল না,
ধূলিতে পড়ে শুকায় রে,
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ
মলিন মুখ লুকায় রে।
সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবন-ডালা সাজায়ে,
ওই বাঁশি-স্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়
আমি কেন থাকি হায় রে॥

ছোটো ফুল

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোটো ছোটো ফুলে,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়,
তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়,
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।
যারা থাকে অন্ধকারে, পাষাণ-কারায়,
আমার এ মালা যদি লহে গলে তুলে,
নিমেষের তরে তারা যদি সুখ পায়,
নিষ্ঠুর বন্ধন-ব্যথা যদি যায় ভুলে।

ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা, গভীর আশ্বাস—
মনে আনে রবিকর নিমেষ-স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।

যৌবন-স্বপ্ন

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।
পরানে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস।
বসন্তের কুসুম-কাননে গোলাপের আঁখি কেন নত ?
জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হয়ে এসে, মরমের শরমে বিব্রত।
প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ
সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে।
যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ,
শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল-মুকুলে ;
কে আমারে করেছে পাগল— শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

ক্ষণিক মিলন

আকাশের দুই দিক হতে দুইখানি মেঘ এল ভেসে,
দুইখানি দিশাহারা মেঘ— কে জানে এসেছে কোথা হতে

সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে,
দোঁহাপানে চাহিল দু-জনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।
ক্ষীণালোকে বুঝি মনে পড়ে দুই অচেনার চেনাশোনা,
মনে পড়ে কোন্ ছায়া-দ্বীপে, কোন্ কুহেলিকা-ঘেরা দেশে,
কোন্ সন্ধ্যা-সাগরের কূলে দু-জনের ছিল আনাগোনা।
মেলে দোঁহে তবুও মেলে না তিলেক বিরহ রহে মাঝে,
চেনা বলে মিলিবারে চায়, অচেনা বলিয়া মরে লাজে।
মিলনের বাসনার মাঝে আধখানি চাঁদের বিকাশ,—
দুটি চুম্বনের ছোঁয়াছুয়ি, মাঝে যেন শরমের হাস,
দুখানি অলস আঁখিপাতা, মাঝে সুখস্বপন-আভাস।
দোঁহার পরশ লয়ে দোঁহে ভেসে গেল, কহিল না কথা,
বলে গেল সন্ধ্যার কাহিনী, লয়ে গেল উষার বারতা॥

গীতোচ্ছ্বাস

নীরব বাঁশরিখানি বেজেছে আবার।
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্ত কানন মাঝে বসন্ত-সমীরে।
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত।
তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত।
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হয়ে পল্লবের মতো।
জগৎ-কমল-বনে কমল-আসনা
কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে।
সে এল না এল তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হয়ে এল তার স্বর,
দৃষ্টি তার ফিরে এল— কোথা সে নয়ন?
চুম্বন এসেছে তার— কোথা সে অধর॥

স্তন

১

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত-সমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ-সুধায় করে পরান পাগল।
মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল
উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে।
কী যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়,
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে
শরমে মরিতে চায় অঞ্চল-আড়ালে।
প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হেরো নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির॥

২

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা-বিহারভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
শিশু রবি হোথা হতে ওঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্ত রবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।
দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে,
বিমল পবিত্র দুটি বিজন শিখরে।
চিরস্নেহ-উৎসধারে অমৃত-নির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।

জাগে সদা সুখসুপ্ত ধরণীর ’পরে,
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।
ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে তুমি
দেবশিশু মানবের ওই মাতৃভূমি॥

চুম্বন

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হতে কুসুম-চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর-শয়ন॥

বিবসনা

ফেলো গো বসন ফেলো— ঘুচাও অঞ্চল।
পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ
সুর-বালিকার বেশ কিরণ-বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা।

সর্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ
সর্বাঙ্গে মলয়-বায়ু করুক সে খেলা।
অসীম নীলিমা মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মতো।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল উষা মানব-ভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা— শুভ্র বিবসনে॥

বাহু

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা,
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেয়ো না যেয়ো না।
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা।
কোথা হতে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা
গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক-অক্ষরে।
পরশে বহিয়া আনে মরম-বারতা
মোহ মেখে রেখে যায় প্রাণের ভিতরে।
কণ্ঠ হতে উতারিয়া যৌবনের মালা
দুইটি আঙুলে ধরি তুলি দেয় গলে।
দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে।
লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন,
ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন॥

চরণ

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়—
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ

শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শত লক্ষ কুসুমের পরশ স্বপন।
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্যলোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণছায়ায়।
যৌবন-সংগীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে,
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হোথা যে নিঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল—
এস গো হৃদয়ে এস, ঝুরিছে হেথায়
লাজ-রক্ত লালসার রাঙা শতদল॥

হৃদয়-আকাশ

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস।
ঐ গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন—
বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার,
যদি নিয়ে যাই ওই শূন্য হয়ে পার
আমার দুখানি পাখা কনক-বরন।
হৃদয় চাতক হয়ে চাবে অশ্রুধার,
হৃদয়-চকোর চাবে হাসির কিরণ॥

অঞ্চলের বাতাস

পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়,
শুধু দেখা গেল তার আধখানি পাশ,
শিহরি পরশি গেল অঞ্চলের বায়।
অজানা হৃদয়-বনে উঠেছে উচ্ছ্বাস,
অঞ্চলে বহিয়া এল দক্ষিণ-বাতাস,
সেথা যে বেজেছে বাঁশি তাই শুনা যায়,
সেথায় উঠিছে কেঁদে ফুলের সুবাস।
কার প্রাণখানি হতে করি হায় হায়
বাতাসে উড়িয়া এল পরশ-আভাস।
ওগো কার তনুখানি হয়েছে উদাস।
ওগো কে জানাতে চাহে মরম-বারতা।
দিয়ে গেল সর্বাঙ্গের আকুল নিশ্বাস,
বলে গেল সর্বাঙ্গের কানে কানে কথা।॥

দেহের মিলন

প্রতি অঙ্গ কাদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে।
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ 'পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরান আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়রে,
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন।

সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহমন চির রাত্রিদিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন

তনু

ওই তনুখানি তব আমি ভালোবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী
শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল
সারানিশি সারাদিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালোবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল,
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি।
পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে সুবাস।
মরি মরি কোথা সেই নিভৃত নিলয়,
কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিশ্বাস
তনু-ঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়।
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা॥

স্মৃতি

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।

যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুমকানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন॥

হৃদয়-আসন

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কি রে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়।
সেই নিরালায়, সেই কোমল আসনে,
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়,
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষকিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়।
কত-না মধুর আশা ফুটিছে সেথায়—
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিশ্বাসবায়ু বসন্তসন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রুকণা।
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে॥

কল্পনার সাথি

যখন কুসুমবনে ফির একাকিনী,
ধরায় লুটায়ে পড়ে পূর্ণিমাযামিনী,
দক্ষিণ-বাতাসে আর তটিনীর গানে
শোন যবে আপনার প্রাণের কাহিনী —
যখন শিউলি ফুলে কোলখানি ভরি,
দুটি পা ছড়ায়ে দিয়ে আনত-বয়ানে
ফুলের মতন দুটি অঙ্গুলিতে ধরি
মালা গাঁথ ভোরবেলা গুন গুন তানে—
মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতায়নে বসে,
নয়নে মিলাতে চায় সুদূর আকাশ,
কখন আঁচলখানি পড়ে যায় খসে,
কখন হৃদয় হতে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
কখন অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে—
তখন আমি কি, সখী, থাকি তব সাথে

হাসি

সুদূর প্রবাসে আজি কেন রে কী জানি
কেবলি পড়িছে মনে তার হাসিখানি।
কখন নামিয়া গেল সন্ধ্যার তপন,
কখন থামিয়া গেল সাগরের বাণী।
কোথায় ধরার ধারে বিরহবিজন
একটি মাধবীলতা আপন ছায়াতে
দুটি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন।
সারা রাত নয়নের সলিল সিঞ্চিয়া
রেখেছে কাহার তরে যতনে সঞ্চিয়া

সে হাসিটি কে আসিয়া করিবে চয়ন,
লুব্ধ এই জগতের সবারে বঞ্চিয়া।
তখন দুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া
তুলিবে অমর করি একটি চুম্বন॥

নিদ্রিতার চিত্র

মায়ায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ-আঁধার,
চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায়।
এলাইয়া ছড়াইয়া গুচ্ছ কেশভার
বাহুতে মাথাটি রেখে রমণী ঘুমায়।
চারি দিকে পৃথিবীতে চিরজাগরণ
কে ওরে পাড়ালে ঘুম তারি মাঝখানে।
কোথা হতে আহরিয়া নীরব গুঞ্জন
চিরদিন রেখে গেছে ওরি কানে কানে।
ছবির আড়ালে কোথা অনন্ত নির্ঝর
নীরব ঝর্ঝর গানে পড়িছে ঝরিয়া।
চিরদিন কাননের নীরব মর্মর,
লজ্জা চিরদিন আছে দাঁড়ায়ে সমুখে—
যেমনি ভাঙিবে ঘুম মরমে মরিয়া
বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে॥

কল্পনা-মধুপ

প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুন গুন গান,
লালসে অলস-পাখা অলির মতন।
বিকল হৃদয় লয়ে পাগল পরান
কোথায় করিতে যায় মধু অন্বেষণ।

বেলা বহে যায় চলে— শ্রান্ত দিনমান,
তরুতলে ক্লান্ত ছায়া করিছে শয়ন,
মুরছিয়া পড়িতেছে বাঁশরির তান,
সেঁউতি শিথিলবৃন্ত মুদিছে নয়ন।
কুসুমদলের বেড়া, তারি মাঝে ছায়া,
সেথা বসে করি আমি কল্পমধু পান.
বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া,
তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান ;
রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী।

পূর্ণ মিলন

নিশিদিন কাঁদি, সখী, মিলনের তরে
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে—
লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে—
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে
অনন্তকালের মোর জীবন-মরণ।
বিজন বিশ্বের মাঝে মিলনশ্মশানে
নির্বাপিতসূর্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর
এ কী দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে

শ্রান্তি

সুখশ্রমে আমি, সখী, শ্রান্ত অতিশয় ;
পড়েছে শিথিল হয়ে শিরার বন্ধন।
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুমশয়ন,
কুসুমরেণুর সাথে হয়ে যাই লয়।
স্বপনের জালে যেন পড়েছি জড়ায়ে।
যেন কোন্ অস্তাচলে সন্ধ্যাস্বপ্নময়
রবির ছবির মতো যেতেছি গড়ায়ে,
সুদূরে মিলিয়া যায় নিখিল নিলয়।
ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে
কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাস রুদ্ধ হয়—
পরান কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে।
এ যে সৌরভের বেড়া, পাষাণের নয়—
কেমনে ভাঙিতে হবে ভাবিয়া না পাই,
অসীম নিদ্রার ভারে পড়ে আছি তাই॥

বন্দী

দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ—
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।
কোথায় উষার আলো, কোথায় আকাশ—
এ চির পূর্ণিমারাত্রি হোক অবসান।
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।

ঘুমঘোরে শূন্যপানে দেখি মুখ তুলি
শুধু অবিশ্রামহাসি একখানি চাঁদ।
স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায়—
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তার পায়॥

কেন

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া,
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধুহাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া।
কেন তনু বাহুডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে,
হায় যদি এত লজ্জা কথায় কথায়,
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে।
কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল—
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া।
মানবহৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্মভেদী খেলা॥

মোহ

এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।

কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়।
ফুল ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখিতে।
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর।
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণবিকশিত,
কম্পিত পুলকভরে, যৌবনকাতর।
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চিরপিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণ-পরিপূর্ণ মরণ-অনল—
মনে পড়ে হাসি আসে? চোখে আসে জল?

পবিত্র প্রেম

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া।
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে।
ওই দেখো তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনানিশ্বাস তব গরল বরষে।
জান না কি হৃদিমাঝে ফুটেছে যে ফুল,
ধুলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর।
জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার।
আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায়,
সাধ করে কে আজি রে হবে পথহারা—
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায়।
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালোবাস তারে করিছ বিনাশ।

পবিত্র জীবন

মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা।
চেয়ে দেখো, পবিত্র এ মানবজীবন,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা।
ভেসে ভেসে এই মহা চরাচরস্রোতে
কে জানে গো আসিয়াছে কোন্‌খান হতে,
কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস,
কোন্‌ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে।
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ—
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী,
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি।
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

মরীচিকা

এস, ছেড়ে এস, সখী, কুসুমশয়ন।
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশকুসুমবনে স্বপন চয়ন।
দেখো ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপশিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখদুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়—
হাসি-কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসারসংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখরৌদ্রমরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ॥

গান-রচনা

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন,
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারাবেলা
আপনার ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া-খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ করে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে।
কারে যেন দেব বলে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথি কে আছে?
ভুলে ভুলে গান গাই—কে শোনে, কে নাই শোনে
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে॥

সন্ধ্যার বিদায়

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে—
যেতে যেতে কনক-আঁচল বেধে যায় বকুলকাননে,
চরণের পরশ-রাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে ;
নীরবে-বিদায়-চাওয়া চোখে, গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে
আঁধারের ম্লান বধূ যায় বিষাদের বাসরশয়নে।
সন্ধ্যাতারা পিছনে দাঁড়ায়ে চেয়ে থাকে আকুল নয়নে।
যমুনা কাঁদিতে চাহে বুঝি, কেন রে কাঁদে না কণ্ঠ তুলে,
বিস্ফারিত হৃদয় বহিয়া চলে যায় আপনার মনে।
মাঝে মাঝে ঝাউবন হতে গভীর নিশ্বাস ফেলে ধরা।
সপ্ত ঋষি দাঁড়াইল আসি নন্দনের সুরতরুমূলে,
চেয়ে থাকে পশ্চিমের পথে, ভুলে যায় আশীর্বাদ করা।
নিশীথিনী রহিল জাগিয়া বদন ঢাকিয়া এলোচুলে।
কেহ আর কহিল না কথা, একটিও বহিল না শ্বাস ;
আপনার সমাধি-মাঝারে নিরাশা নীরবে করে বাস ॥

রাত্রি

জগতেরে জড়াইয়া শত পাকে যামিনীনাগিনী
আকাশ-পাতাল জুড়ি ছিল পড়ে নিদ্রায় মগনা,
আপনার হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী।
মিটি মিটি তারকায় জ্বলে তার অন্ধকার ফণা।
উষা আসি মন্ত্র পড়ি বাজাইল ললিত রাগিণী।
রাঙা আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি,
একে একে খুলে পাক, আঁকি বাঁকি কোথা যায় ভাগি

পশ্চিমসাগরতলে আছে বুঝি বিরাট গহ্বর,
সেথায় ঘুমাবে বলে ডুবিতেছে বাসুকিভগিনী
মাথায় বহিয়া তার শত লক্ষ রতনের কণা।
শিয়রেতে সারাদিন জেগে রবে বিপুল সাগর ;
নিভৃতে স্তিমিত দীপে চুপি চুপি কহিয়া কাহিনী
মিলি কত নাগবালা স্বপ্নমালা করিবে রচনা ॥

বৈতরণী

অশ্রুস্রোতে স্ফীত হয়ে বহে বৈতরণী,
চৌদিকে চাপিয়া আছে আঁধার রজনী।
পূর্ব তীর হতে হুহু আসিছে নিশ্বাস,
যাত্রী লয়ে পশ্চিমেতে চলেছে তরণী।
মাঝে মাঝে দেখা দেয় বিদ্যুৎ-বিকাশ,
কেহ কারে নাহি চেনে বসে নতশিরে।
গলে ছিল বিদায়ের অশ্রুকণা-হার
ছিন্ন হয়ে একে একে ঝ'রে পড়ে নীরে।
ওই বুঝি দেখা যায় ছায়া পরপার,
অন্ধকারে মিটি মিটি তারা-দীপ জ্বলে।
হোথায় কি বিস্মরণ, নিঃস্বপ্ন নিদ্রার
শয়ন রচিয়া দিবে ঝরা ফুলদলে।
অথবা অকূলে শুধু অনন্ত রজনী
ভেসে চলে কর্ণধারবিহীন তরণী ॥

মানবহৃদয়ের বাসনা

নিশীথে রয়েছি জেগে ; দেখি অনিমেখে,
লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়।
কত দিক হতে তারা ধায় কত দিকে।
কত-না অদৃশ্যকায়া ছায়া-আলিঙ্গন
বিশ্বময় কারে চাহে, করে হায় হায়।
কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশানশয়ন .
অন্ধকারে হেরো শত তৃষিত নয়ন
ছায়াময় পাখি হয়ে কার পানে ধায়।
ক্ষীণশ্বাস মুমূর্ষুর অতৃপ্ত বাসনা
ধরণীর কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়ায়।
উদ্দেশে ঝরিছে কত অশ্রুবারিকণা,
চরণ খুঁজিয়া তারা মরিবারে চায়।
কে শুনিছে শত কোটি হৃদয়ের ডাক ·
নিশীথিনী স্তব্ধ হয়ে রয়েছে অবাক॥

সিন্ধুগর্ভ

উপরে স্রোতের ভরে ভাসে চরাচর
নীল সমুদ্রের 'পরে নৃত্য ক'রে সারা।
কোথা হতে ঝরে যেন অনন্ত নির্ঝর,
ঝরে আলোকের কণা রবি শশী তারা।
ঝরে প্রাণ, ঝরে গান, ঝরে প্রেমধারা-
পূর্ণ করিবারে চায় আকাশ সাগর।
সহসা কে ডুবে যায় জলবিম্বপারা,
দু-একটি আলো-রেখা যায় মিলাইয়া,

তখন ভাবিতে বসি কোথায় কিনারা,
কোন্ অতলের পানে ধাই তলাইয়া।
নিম্নে জাগে সিন্ধুগর্ভ স্তব্ধ অন্ধকার।
কোথা নিবে যায় আলো, থেমে যায় গীত,
কোথা চিরদিন তরে অসীম আড়াল।
কোথায় ডুবিয়া গেছে অনন্ত অতীত॥

ক্ষুদ্র অনন্ত

অনন্ত দিবসরাত্রি কালের উচ্ছ্বাস
তারি মাঝখানে শুধু একটি নিমেষ
একটি মধুর সন্ধ্যা, একটু বাতাস,
মৃদু আলো-আঁধারের মিলন-আবেশ—
তারি মাঝখানে শুধু একটুকু জুঁই
একটুকু হাসিমাখা সৌরভের লেশ,
একটু অধর তার ছুঁই কি না ছুঁই,
আপন আনন্দ লয়ে উঠিতেছে ফুটে
আপন আনন্দ লয়ে পড়িতেছে টুটে।
সমগ্র অনন্ত ওই নিমেষের মাঝে
একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।
যেমনি পলক টুটে ফুল ঝরে যায়
অনন্ত আপনা-মাঝে আপনি মিলায়॥

সমুদ্র

কিসের অশান্তি এই মহাপারাবারে,
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন।
অব্যক্ত অস্ফুট বাণী ব্যক্ত করিবারে
শিশুর মতন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন।
যুগযুগান্তর ধরি যোজন যোজন
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে উত্তাল উচ্ছ্বাস ;
অশান্ত বিপুল প্রাণ করিছে গর্জন,
নীরবে শুনিছে তাই প্রশান্ত আকাশ।
আছাড়ি চূর্ণিতে চাহে সমগ্র হৃদয়
কঠিন পাষাণময় ধরণীর তীরে,
জোয়ারে সাধিতে চায় আপন প্রলয়,
ভাঁটায় মিলাতে চায় আপনার নীরে।
অন্ধ প্রকৃতির হৃদে মৃত্তিকায় বাঁধা
সতত দুলিছে ওই অশ্রুর পাথার,
উন্মুখী বাসনা পায় পদে পদে বাধা,
কাঁদিয়া ভাসাতে চাহে জগৎ-সংসার।
সংসারের কণ্ঠ হতে কেড়ে নিয়ে কথা
সাধ যায় ব্যক্ত করি মানবভাষায় ;
শান্ত করে দিই ওই চির-ব্যাকুলতা,
সমুদ্রবায়ুর ওই চির হায়-হায়।
সাধ যায় মোর গীতে দিবস-রজনী
ধ্বনিতে পৃথিবী-ঘেরা সংগীতের ধ্বনি

অস্তমান রবি

আজ কি তপন তুমি যাবে অস্তাচলে
না শুনে আমার মুখে একটিও গান।
দাঁড়াও গো, বিদায়ের দুটি কথা বলে
আজিকার দিন আমি করি অবসান।
থামো ওই সমুদ্রের প্রান্তরেখা-'পরে,
মুখে মোর রাখো তব একমাত্র আঁখি।
দিবসের শেষ পলে নিমেষের তরে
তুমি চেয়ে থাকো আর আমি চেয়ে থাকি
দুজনের আঁখি-'পরে সায়াহ্ন-আঁধার
আঁখির পাতার মতো আসুক মুদিয়া,
গভীর তিমিরস্নিগ্ধ শান্তির পাথার
নিবায়ে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া।
শেষ গান সাঙ্গ করে থেমে গেছে পাখি
আমার এ গানখানি ছিল শুধু বাকি॥

অস্তাচলের পরপারে

সন্ধ্যাসূর্যের প্রতি

আমার এ গান তুমি যাও সাথে করে
নূতন সাগরতীরে দিবসের পানে।
সায়াহ্নের কূল হতে যদি ঘুমঘোরে
এ গান উষার কূলে পশে কারো কানে,
সারা রাত্রি নিশীথের সাগর বাহিয়া
স্বপনের পরপারে যদি ভেসে যায়,
প্রভাত-পাখিরা যবে উঠিবে গাহিয়া
আমার এ গান তারা যদি খুঁজে পায়।

গোধূলির তীরে বসে কেঁদেছে যে জন,
ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রুজল কত,
তার অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নূতন
নবপ্রভাতের মাঝে শিশিরের মতো।
সায়াহ্নের কুঁড়িগুলি আপনা টুটিয়া
প্রভাতে কি ফুল হয়ে উঠে না ফুটিয়া॥

প্রত্যাশা

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে!
আমি কি দিই নি ফাঁকি কত জনে হায়,
রেখেছি কত-না ঋণ এই পৃথিবীতে।
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ,
সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে।
এক তিল না পাইলে দিই অভিশাপ,
অমনি কেন রে বসি কাতরে কাঁদিতে।
হা ঈশ্বর, আমি কিছু চাহি নাকো আর,
ঘুচাও আমার এই ভিক্ষার বাসনা।
মাথায় বহিয়া লয়ে চির ঋণভার
"পাইনি" "পাইনি" বলে আর কাঁদিব না।
তোমারেও মাগিব না, অলস কাঁদনি—
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি॥

স্বপ্নরুদ্ধ

নিষ্ফল হয়েছি আমি সংসারের কাজে,
লোকমাঝে আঁখি তুলে পারি না চাহিতে।
ভাসায়ে জীবনতরী সাগরের মাঝে
তরঙ্গ লঙ্ঘন করি পারি না বাহিতে।
পুরুষের মতো যত মানবের সাথে
যোগ দিতে পারি নাকো লয়ে নিজ বল,
সহস্র সংকল্প শুধু ভরা দুই হাতে
বিফলে শুকায় যেন লক্ষ্মণের ফল।
আমি গাঁথি আপনার চারি দিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি।
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি॥

অক্ষমতা

এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা,
সলিল রয়েছে পড়ে শুধু দেহ নাই।
এ কেবল হৃদয়ের দুর্বল দুরাশা
সাধের বস্তুর মাঝে করে চাই চাই।
দুটি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা
মানবজীবন যেন সকলি নিষ্ফল—
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা।
চিরদিন বুভুক্ষিত প্রাণহুতাশন
আমারে করিছে ছাই প্রতি পলে পলে,

মহত্ত্বের আশা শুধু ভারের মতন
আমারে ডুবায়ে দেয় জড়ত্বের তলে।
কোথা সংসারের কাজে জাগ্রত হৃদয়,
কোথা রে সাহস মোর অস্থিমজ্জাময়॥

জাগিবার চেষ্টা

মা কেহ কি আছ মোর, কাছে এস তবে,
পাশে বসে স্নেহ ক'রে জাগাও আমায়।
স্বপ্নের সমাধি মাঝে বাঁচিয়া কী হবে,
যুঝিতেছি জাগিবারে— আঁখি রুদ্ধ হায়।
ডেকো না ডেকো না মোরে ক্ষুদ্রতার মাঝে,
স্নেহময় আলস্যেতে রেখো না বাঁধিয়া,
আশীর্বাদ করে মোরে পাঠাও গো কাজে—
পিছনে ডেকো না আর কাতরে কাঁদিয়া।
মোর বলে কাহারেও দেব না কি বল,
মোর প্রাণে পাবে না কি কেহ নবপ্রাণ।
করুণা কি শুধু ফেলে নয়নের জল,
প্রেম কি ঘরের কোণে গাহে শুধু গান?
তবেই ঘুচিবে মোর জীবনের লাজ
যদি মা করিতে পারি কারো কোনো কাজ॥

কবির অহংকার

গান গাহি বলে কেন অহংকার করা।
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না শরমে।
খাঁচার পাখির মতো গান গেয়ে মরা,
এই কি মা আদি অন্ত মানবজনমে।

সুখ নাই, সুখ নাই, শুধু মর্মব্যথা—
মরীচিকা-পানে শুধু মরি পিপাসায়।
কে দেখালে প্রলোভন, শূন্য অমরতা,
প্রাণে ম'রে গানে কি রে বেঁচে থাকা যায়।
কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে করো গো আহ্বান
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রুজল—
দূর করি হীন গর্ব, শূন্য অভিমান।
তার পরে একসাথে এস কাজ করি,
কেবলি বিলাপগান দূরে পরিহরি॥

বিজনে

আমারে ডেকো না আজি, এ নহে সময়—
একাকী রয়েছি হেথা গভীর বিজন,
রুধিয়া রেখেছি আমি অশান্ত হৃদয়,
দুরন্ত হৃদয় মোর করিব শাসন।
মানবের মাঝে গেলে এ যে ছাড়া পায়,
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা,
লুব্ধ মুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায়,
চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা।
ভর্ৎসনা করিব তারে বিজনে বিরলে,
একটুকু ঘুমাক সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
শ্যামল বিপুল কোলে আকাশ-অঞ্চলে
প্রকৃতি জননী তারে রাখুন বাঁধিয়া।
শান্ত স্নেহকোলে বসে শিখুক সে স্নেহ,
আমারে আজিকে তোরা ডাকিস নে কেহ।

সিন্ধুতীরে

হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কানাকানি,
ধ্বনিত হতেছে চির-দিবসের বাণী
চিরদিবসের রবি ওঠে অস্ত যায়,
চিরদিবসের কবি গাহিছে হেথায়।
ধরণীর চারি দিকে সীমাশূন্য গানে
সিন্ধু শত তটিনীরে করিছে আহ্বান—
হেথায় দেখিলে চেয়ে আপনার পানে
দুই চোখে জল আসে, কেঁদে ওঠে প্রাণ
শত যুগ হেথা বসে মুখপানে চায়,
বিশাল আকাশে পাই হৃদয়ের সাড়া।
তীব্র বক্র ক্ষুদ্র হাসি পায় যদি ছাড়া
রবির কিরণে এসে মরে সে লজ্জায়।
সবারে আনিতে বুকে বুক বেড়ে যায়,
সবারে করিতে ক্ষমা আপনারে ছাড়া॥

সত্য

ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
হৃদয়ের আলোটুকু নিবে গেছে ব'লে;
কে কী বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে,
কী হয় কী হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে।
"আলো" "আলো" খুঁজে মরি পরের নয়নে,
"আলো" "আলো" খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে,
অবশেষে শুয়ে পড়ি ধূলির শয়নে—
ভয় হয় এক পদ অগ্রসর হতে।

বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙো অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙে যায় সেও তবু ভালো।
যে গৃহে জানালা নাই সে তো কারাগার—
ভেঙে ফেলো, আসিবেক স্বরগের আলো।
হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি।
চলিব সরল পথে অশঙ্কিত গতি॥

২

জ্বালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবিশশী
দাঁড়ায়ে রয়েছ একা অসীমসুন্দর।
সুগভীর শান্ত নেত্র রয়েছে বিকশি,
চিরস্থির শুভ্র হাসি, প্রসন্ন অধর।
আনন্দে আঁধার মরে চরণ পরশি,
লাজ ভয় লাজে ভয়ে মিলাইয়া যায়—
আপন মহিমা হেরি আপনি হরষি
চরাচর শির তুলি তোমাপানে চায়।
আমার হৃদয়দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে দাও জ্বালাইয়া—
ওই ধ্রুবতারাখানি রেখেছ যেথায়
সেই গগনের প্রান্তে রাখো ঝুলাইয়া।
চিরদিন জেগে রবে নিবিবে না আর,
চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার॥

আত্মাভিমান

আপনি কণ্টক আমি, আপনি জর্জর।
আপনার মাঝে আমি শুধু ব্যথা পাই।
সকলের কাছে কেন যাচি গো নির্ভর—
গৃহ নাই, গৃহ নাই, মোর গৃহ নাই।

অতি তীক্ষ্ণ অতি ক্ষুদ্র আত্ম-অভিমান
সহিতে পারে না হায় তিল অসম্মান।
আগেভাগে সকলের পায়ে ফুটে যায়
ক্ষুদ্র ব'লে পাছে কেহ জানিতে না পায়।
বরঞ্চ আঁধারে রব ধুলায় মলিন,
চাহি না চাহি না এই দীন অহংকার—
আপন দারিদ্র্যে আমি রহিব বিলীন,
বেড়াব না চেয়ে চেয়ে প্রসাদ সবার।
আপনার মাঝে যদি শান্তি পায় মন
বিনীত ধূলার শয্যা সুখের শয়ন॥

আত্ম-অপমান

মোছো তবে অশ্রুজল, চাও হাসিমুখে
বিচিত্র এ জগতের সকলের পানে।
মানে আর অপমানে সুখে আর দুখে
নিখিলেরে ডেকে লও প্রসন্ন পরানে।
কেহ ভালোবাসে কেহ নাহি ভালোবাসে,
কেহ দূরে যায় কেহ কাছে চলে আসে,
আপনার মাঝে গৃহ পেতে চাও যদি
আপনারে ভুলে তবে থাকো নিরবধি।
ধনীর সন্তান আমি, নহি গো ভিখারি,
হৃদয়ে লুকানো আছে প্রেমের ভাণ্ডার,
আমি ইচ্ছা করি যদি বিলাইতে পারি
গভীর সুখের উৎস হৃদয় আমার।
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি মাগি অন্নপান
কেন আমি করি তবে আত্ম-অপমান

ক্ষুদ্র আমি

বুঝেছি বুঝেছি, সখা, কেন হাহাকার,
আপনার 'পরে মোর কেন সদা রোষ।
বুঝেছি বিফল কেন জীবন আমার—
আমি আছি তুমি নাই তাই অসন্তোষ।
সকল কাজের মাঝে আমারেই হেরি—
ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার,
শীর্ণবাহু-আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
করিছে আমার হায় অস্থিচর্ম সার।
কোথা নাথ, কোথা তব সুন্দর বদন—
কোথায় তোমার নাথ, বিশ্ব-ঘেরা হাসি।
আমারে কাড়িয়া লও, করো গো গোপন—
আমারে তোমার মাঝে করো গো উদাসী
ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড়ো অহংকার,
ভাঙো নাথ, ভাঙো নাথ, অভিমান তার॥

প্রার্থনা

তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো, সখা, তাই
"আমি বড়ো" "আমি বড়ো" করিছে সবাই
সকলেই উঁচু হয়ে দাঁড়ায়ে সমুখে
বলিতেছে, "এ জগতে আর কিছু নাই।"
নাথ তুমি একবার এস হাসিমুখে
এরা সব ম্লান হয়ে লুকাক লজ্জায়—
সুখদুঃখ টুটে যাক তব মহাসুখে,
যাক আলো-অন্ধকার তোমার প্রভায়।
নহিলে ডুবেছি আমি, মরেছি হেথায়,
নহিলে ঘুচে না আর মর্মের ক্রন্দন –

শুষ্ক ধূলি তুলি শুধু সুধাপিপাসায়,
প্রেম ব'লে পরিয়াছি মরণবন্ধন।
কভু পড়ি কভু উঠি, হাসি আর কাঁদি-
খেলাঘর ভেঙে প'ড়ে রচিবে সমাধি॥

বাসনার ফাঁদ

যারে চাই তার কাছে আমি দিই ধরা,
সে আমার না হইতে আমি হই তার।
পেয়েছি বলিয়ে মিছে অভিমান করা,
অন্যেরে বাঁধিতে গিয়ে বন্ধন আমার।
নিরখিয়া দ্বারমুক্ত সাধের ভাণ্ডার
দুই হাতে লুটে নিই রত্ন ভূরি ভূরি -
নিয়ে যাব মনে করি, ভারে চলা ভার,
চোরা দ্রব্য বোঝা হয়ে চোরে করে চুরি।
চিরদিন ধরণীর কাছে ঋণ চাই,
পথের সম্বল ব'লে জমাইয়া রাখি,
আপনারে বাঁধা রাখি সেটা ভুলে যাই—
পাথেয় লইয়া শেষে কারাগারে থাকি।
বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে-ডোবে তরী,
ফেলিতে সরে না মন, উপায় কী করি॥

চিরদিন

কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা,
কে বা আসে কে বা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা,
কে বা হাসে কে বা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা।

কোথা খসে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে,
উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
বহে যায় কালবায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
ঝর ঝর মর মর শুষ্ক পত্র শ্যাম পত্রে মিলে।
এত ভাঙা এত গড়া, আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
এত গান এত তান এত কান্না এত কলরব—
কোথা কে বা, কোথা সিন্ধু, কোথা ঊর্মি, কোথা তার বেলা—
গভীর অসীম গর্ভে নির্বাসিত নির্বাপিত সব।
জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশমণ্ডপে শুধু বসে আছে এক 'চিরদিন'।

২

কী লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি,
প্রলয়ের পরপারে নেহারিছ কার আগমন,
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ,
চিরবিরহীর মতো চিররাত্রি রহিয়াছ জাগি।
অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস,
আকাশপ্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়বাতাস,
জগতের ঊর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি।
অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিক দোসর,
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখিদের স্বর।
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস,
সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর—
হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি, নাই তব হাসি কান্না মায়া—
আসি, থাকি, চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া॥

৩

তাই কি? সকলি ছায়া? আসে, থাকে, আর মিলে যায়?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই?

যুগযুগান্তর ধরে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই ?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায় ?
এ ফুল চাহে না কেহ ? লহে না এ পূজা-উপহার ?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়।
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে ?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধার ?
যুগযুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে ?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
বাঁশি শুনি চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা অভিসার।
ব'লো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন,
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন ?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

৪

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন,
অসীমে জগতে একি পিরিতির আদান-প্রদান।
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন-উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে, কোথা সেই অনন্ত জীবন।
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন—
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে॥

বঙ্গভূমির প্রতি

কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে।
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে।
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না—
মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভানে।
তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমার-
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না, কিছু না—
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরানে।
মনের বেদনা রাখো মা মনে,
নয়নবারি নিবারো নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলিশয়নে,
ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।
শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গনি গনি
দেখো কাটে কি না দীর্ঘ রজনী—
দুঃখ জানায়ে কী হবে, জননী,
নির্মম চেতনহীন পাষাণে।

বঙ্গবাসীর প্রতি

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা দরিদ্রের আশ,

এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরমবেদনা।
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে
মিছে কাজে নিশি-যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মা'র পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।

আহ্বানগীত

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ,
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কই রে বাঙালি কই।
সুগভীর স্বর কাঁদিয়া বেড়ায়
বঙ্গসাগরের তীরে,
"বাঙালির ঘরে কে আছিস আয়"
ডাকিতেছে ফিরে ফিরে।
ঘরে ঘরে কেন দুয়ার ভেজানো,
পথে কেন নাই লোক,
সারা দেশ ব্যাপি মরেছে কে যেন—
বেঁচে আছে শুধু শোক।

গঙ্গা বহে শুধু আপনার মনে,
চেয়ে থাকে হিমগিরি,
রবি শশী উঠে অনন্ত গগনে
আসে যায় ফিরি ফিরি।
কত-না সংকট, কত-না সন্তাপ
মানবশিশুর তরে,
কত-না বিবাদ কত-না বিলাপ
মানবশিশুর ঘরে।
কত ভায়ে ভায়ে নাহি যে বিশ্বাস,
কেহ কারে নাহি মানে,
ঈর্ষা নিশাচরী ফেলিছে নিশ্বাস
হৃদয়ের মাঝখানে।
হৃদয়ে লুকানো হৃদয়বেদনা,
সংশয়-আঁধারে যুঝে,
কে কাহারে আজি দিবে গো সান্ত্বনা—
কে দিবে আলয় খুঁজে।
মিটাতে হইবে শোক তাপ ত্রাস,
করিতে হইবে রণ,
পৃথিবী হইতে উঠেছে উচ্ছ্বাস—
শোনো শোনো সৈন্যগণ।
পৃথিবী ডাকিছে আপন সন্তানে,
বাতাস ছুটেছে তাই—
গৃহ তেয়াগিয়া ভায়ের সন্ধানে
চলিয়াছে কত ভাই।
বঙ্গের কুটিরে এসেছে বারতা,
শুনেছে কি তাহা সবে।
জেগেছে কি কবি শুনাতে সে কথা
জলদগম্ভীর রবে।
হৃদয় কি কারো উঠেছে উথলি।
আঁখি খুলেছে কি কেহ।

ভেঙেছে কি কেহ সাধের পুতলি।
ছেড়েছে খেলার গেহ ?
কেন কানাকানি, কেন রে সংশয়।
কেন মরো ভয়ে লাজে।
খুলে ফেলো দ্বার, ভেঙে ফেলো ভয়,
চলো পৃথিবীর মাঝে।
ধরাপ্রান্তভাগে ধূলিতে লুটায়ে,
জড়িমাজড়িত তনু,
আপনার মাঝে আপনি গুটায়ে
ঘুমায় কীটের অণু।
চারি দিকে তার আপন উল্লাসে
জগৎ ধাইছে কাজে,
চারি দিকে তার অনন্ত আকাশে
স্বরগসংগীত বাজে।
চারি দিকে তার মানবমহিমা
উঠিছে গগনপানে,
খুঁজিছে মানব আপনার সীমা
অসীমের মাঝখানে।
সে কিছুই তার করে না বিশ্বাস,
আপনারে জানে বড়ো।
আপনি গনিছে আপন নিশ্বাস,
ধূলা করিতেছে জড়ো।
সুখদুঃখ লয়ে অনন্ত সংগ্রাম,
জগতের রঙ্গভূমি—
হেথায় কে চায় ভীরুর বিশ্রাম,
কেন গো ঘুমাও তুমি।
ডুবিছ ভাসিছ অশ্রুর হিল্লোলে,
শুনিতেছ হাহাকার—
তীর কোথা আছে দেখো মুখ তুলে,
এ সমুদ্র করো পার।

মহা কলরবে সেতু বাঁধে সবে,
তুমি এস, দাও যোগ--
বাধার মতন জড়াও চরণ
একি রে করম-ভোগ।
তা যদি না পারো সরো তবে সরো
ছেড়ে দাও তবে স্থান,
ধুলায় পড়িয়া মরো তবে মরো—
কেন এ বিলাপগান।

ওরে চেয়ে দেখ্ মুখ আপনার,
ভেবে দেখ্ তোরা কারা।
মানবের মতো ধরিয়া আকার,
কেন রে কীটের পারা।
আছে ইতিহাস আছে কুলমান,
আছে মহত্ত্বের খনি—
পিতৃপিতামহ গেয়েছে যে গান
শোন্ তার প্রতিধ্বনি।
খুঁজেছেন তাঁরা চাহিয়া আকাশে
গ্রহতারকার পথ,
জগৎ ছাড়ায়ে অসীমের আশে
উড়াতেন মনোরথ।
চাতকের মতো সত্যের লাগিয়া
তৃষিত আকুল প্রাণে,
দিবসরজনী ছিলেন জাগিয়া
চাহিয়া বিশ্বের পানে।
তবে কেন সবে বধির হেথায়,
কেন অচেতন প্রাণ,
বিফল উচ্ছ্বাসে কেন ফিরে যায়
বিশ্বের আহ্বানগান।

মহত্ত্বের গাথা পশিতেছে কানে,
কেন রে বুঝি নে ভাষা।
তীর্থযাত্রী যত পথিকের গানে
কেন রে জাগে না আশা।
উন্নতির ধ্বজা উড়িছে বাতাসে,
কেন রে নাচে না প্রাণ।
নবীন কিরণ ফুটেছে আকাশে
কেন রে জাগে না গান।
কেন আছি শুয়ে, কেন আছি চেয়ে,
পড়ে আছি মুখোমুখি—
মানবের স্রোত চলে গান গেয়ে,
জগতের সুখে সুখী।
চলো দিবালোকে, চলো লোকালয়ে,
চলো জনকোলাহলে—
মিশাব হৃদয় মানবহৃদয়ে
অসীম আকাশতলে।
তরঙ্গ তুলিব তরঙ্গের 'পরে,
নৃত্যগীত নব নব—
বিশ্বের কাহিনী কোটি কণ্ঠস্বরে
এক-কণ্ঠ হয়ে কব।
মানবের সুখ মানবের আশা
বাজিবে আমার প্রাণে,
শত লক্ষ কোটি মানবের ভাষা
ফুটিবে আমার গানে।
মানবের কাজে মানবের মাঝে
আমরা পাইব ঠাঁই,
বঙ্গের দুয়ারে তাই শিঙা বাজে—
শুনিতে পেয়েছি ভাই।
মুছে ফেলো ধুলা, মুছ অশ্রুজল,
ফেলো ভিখারির চীর—

পরো নব সাজ, ধরো নব বল,
তোলো তোলো নত শির।
তোমাদের কাছে আজি আসিয়াছে
জগতের নিমন্ত্রণ—
দীনহীন বেশ ফেলে যেয়ো পাছে,
দাসত্বের আভরণ।
সভার মাঝারে দাঁড়াবে যখন,
হাসিয়া চাহিবে ধীরে,
পুরব রবির হিরণ কিরণ
পড়িবে তোমার শিরে।
বাঁধন টুটিয়া উঠিবে ফুটিয়া
হৃদয়ের শতদল,
জগৎ-মাঝারে যাইবে লুটিয়া
প্রভাতের পরিমল।
উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ,
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে,
ভাসিবে নয়নজলে—
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে
মায়ের চরণতলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।
এক বার কবি মায়ের ভাষায়
গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়,
ঘুচে যায় অপমান।

শেষ কথা

মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।
কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।
শত গান উঠিতেছে তারি অন্বেষণে,
পাখির মতন ধায় চরাচরময়।
শত গান মরে গিয়ে, নূতন জীবনে
একটি কথায় চাহে হইতে বিলয়।
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরি,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন-তরে,
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি,
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে।

মানসী

বিলাতে রবীন্দ্রনাথ

১২৯৭

সূচনা

বাল্যকাল থেকে পশ্চিম-ভারত আমার কাছে রোম্যান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। এইখানেই নিরবচ্ছিন্নকাল বিদেশীয়দের সঙ্গে এ দেশের সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটে এসেছে। বহুশতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের বিপুল পটভূমিকায় বহু সাম্রাজ্যের উত্থানপতন এবং নব নব ঐশ্বর্যের বিকাশ ও বিলয় আপন বিচিত্র বর্ণের ছবির ধারা অঙ্কিত করে চলেছে। অনেক দিন ইচ্ছা করেছি এই পশ্চিম-ভারতের কোনো-এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ করব মনের মধ্যে। অবশেষে এক সময়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এত দেশ থাকতে কেন যে গাজিপুর বেছে নিয়েছিলুম তার দুটো কারণ আছে। শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের খেত। আমি যেন মনের মধ্যে গোলাপবিলাসী সিরাজের ছবি এঁকে নিয়েছিলুম। তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল। সেখানে গিয়ে দেখলুম ব্যাবসাদারের গোলাপের খেত, এখানে বুলবুলের আমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই; হারিয়ে গেল সেই ছবি। অপর পক্ষে, গাজিপুরে মহিমান্বিত প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর কোথাও বড়ো রেখায় ছাপ দেয় নি। আমার চোখে এর চেহারা ঠেকল সাদা-কাপড়-পরা বিধবার মতো, সেও কোনো বড়োঘরের ঘরণী নয়।

তবু গাজিপুরেই রয়ে গেলুম, তার একটা কারণ এখানে ছিলেন আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়, আফিম-বিভাগের একজন বড়ো কর্মচারী। এখানে আমার সমস্ত ব্যবস্থা সহজ হল তাঁরই সাহায্যে। একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের খেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণ-টানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পূর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিমগাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা

ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার-চাল-ওয়ালা পল্লী।

গাজিপুর আগ্রা-দিল্লির সমকক্ষ নয়, সিরাজ-সমরখন্দের সঙ্গেও এর তুলনা হয় না, তবু মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে। আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল। আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বারবার দেখেছি। এইজন্যেই আলমোড়ায় যখন ছিলুম আমার লেখনী হঠাৎ নতুন পথ নিল 'শিশু'র কবিতায়, অথচ সে-জাতীয় কবিতার কোনো প্রেরণা কোনো উপলক্ষ্যই সেখানে ছিল না। পূর্বতন রচনাধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নূতন কাব্য-রূপের প্রকাশ। মানসী'ও সেই রকম। নূতন আবেষ্টনে এই কবিতা-গুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল'এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।

উপহার

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর—
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা।
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সেই আনন্দ-মুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

জোড়াসাঁকো
৩০ বৈশাখ ১৮৯০

ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার-চাল-ওয়ালা পল্লী।

গাজিপুর আগ্রা-দিল্লির সমকক্ষ নয়, সিরাজ-সমরখন্দের সঙ্গেও এর তুলনা হয় না, তবু মন নিমগ্ন হল অক্ষুণ্ণ অবকাশের মধ্যে। আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল। আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বারবার দেখেছি। এইজন্যেই আলমোড়ায় যখন ছিলুম আমার লেখনী হঠাৎ নতুন পথ নিল 'শিশু'র কবিতায়, অথচ সে-জাতীয় কবিতার কোনো প্রেরণা কোনো উপলক্ষ্যই সেখানে ছিল না। পূর্বতন রচনাধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নূতন কাব্য-রূপের প্রকাশ। মানসী'ও সেই রকম। নূতন আবেষ্টনে এই কবিতা-গুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববর্তী 'কড়ি ও কোমল'এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।

উপহার

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর—
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা।
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সেই আনন্দ-মুহূর্তগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

জোড়াসাঁকো
৩০ বৈশাখ ১৮৯০

মানসী

ভুলে

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে।
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না,
এসেছি ভুলে।

বেল-কুঁড়ি দুটি করে ফুটি-ফুটি
অধর খোলা।
মনে পড়ে গেল সেকালের সেই
কুসুম তোলা।
সেই শুকতারা সেই চোখে চায়,
বাতাস কাহারে খুঁজিয়া বেড়ায়,
উষা না ফুটিতে হাসি ফুটে তার
গগনমূলে।
সেদিন যে গেছে ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি,
লাজে বাধো-বাধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস
নয়ন-কূলে।
তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে।

কাননের ফুল, এরা তো ভোলে নি,
আমরা ভুলি?
সেই তো ফুটেছে পাতায় পাতায়
কামিনীগুলি।
চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণকিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে?
কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভুলে।

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি?
দখিনে বাতাসে কেহ নেই পাশে
সাথের সাথি।
চারি দিক হতে বাঁশি শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তারা গান গায়—

আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে,
বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ
আসিলে ভুলে ?

বৈশাখ ১৮৮৭

ভুল-ভাঙা

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া—
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

হাসিটুকু আর পড়ে না তো ধরা
অধরকোণে,
আপনারে আর চাহ না লুকাতে
আপন মনে।
স্বর শুনে আর উতলা হৃদয়
উথলি উঠে না সারা দেহময়,
গান শুনে আর ভাসে না নয়নে
নয়নলোর।
আঁখিজলরেখা ঢাকিতে চাহে না
শরম চোর।

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মতো,
জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা
জীবনহত।
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না—
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি আঁচোর।
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর।

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশি—
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি।
মধু নিশা গেছে, স্মৃতি তারি আজ
মর্মে মর্মে হানিতেছে লাজ—
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর।
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

কতই না জানি জেগেছ রজনী
করুণ দুখে,
সদয় নয়নে চেয়েছ আমার
মলিন মুখে।

পরদুখভার সহে নাকো আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার—
তবু আসি আমি পাষাণ হৃদয়
বড়ো কঠোর।
ঘুমাও, ঘুমাও, আঁখি ঢুলে আসে
ঘুমে কাতর।

৪৯, পার্ক স্ট্রীট
বৈশাখ ১৮৮৭

বিরহানন্দ

এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক সেইখানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
বিরহতপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত ;
অটবী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি।
কখনো ফুল দুটো আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে পড়িত রে নিশাসি।

তবু সে ছিনু ভালো আধা-আলো- আঁধারে,
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে।
নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত,
উদাস বায়ু সে তো ডেকে যেত আমারে।
ভাবনা কত সাজে হৃদিমাঝে আসিত,
খেলাত অবিরত কত শত আকারে !

বিরহপরিপূত ছায়াযুত শয়নে,
ঘুমের সাথে স্মৃতি আসে নিতি নয়নে।
কপোত দুটি ডাকে বসি শাখে মধুরে,
দিবস চলে যায় গলে যায় গগনে।

কোকিল কুহুতানে ডেকে আনে বধূরে,
নিবিড় শীতলতা তরুলতা- গহনে।

আকাশে চাহিতাম গাহিতাম একাকী,
মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি?
দিবসনিশি ধ'রে ধ্যান ক'রে তাহারে
নীলিমা-পরপার পাব তার দেখা কি?
তটিনী অনুখন ছোটে কোন্ পাথারে,
আমি যে গান গাই তারি ঠাঁই শেখা কি?

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে ঢাকা ভবনে।
পাতার মরমর কলেবর হরষে,
তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে!
মুকুল সুকুমার যেন তার পরশে,
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারি সুধা- স্বপনে।

করুণা অনুখন প্রাণ মন ভরিত,
ঝরিলে ফুলদল চোখে জল ঝরিত।
পবন হুহু করে করিত রে হাহাকার,
ধরার তরে যেন মোর প্রাণ ঝুরিত।
হেরিলে দুখে শোকে কারো চোখে আঁখিধার
তোমারি আঁখি কেন মনে যেন পড়িত।

শিশুরে কোলে নিয়ে জুড়াইয়ে যেত বুক,
আকাশে বিকশিত তোরি মতো স্নেহমুখ।

দেখিলে আঁখি-রাঙা পাখা-ভাঙা পাখিটি
"আহাহা" ধ্বনি তোর প্রাণে মোর দিত দুখ।
মুছালে দুখনীর দুখিনীর আঁখিটি,
জাগিত মনে ত্বরা দয়া-ভরা তোর সুখ।

সারাটা দিনমান রচি গান কত-না!
তোমারি পাশে রহি যেন কহি বেদনা।
কানন মরমরে কত স্বরে কহিত,
ধ্বনিত যেন দিশে তোমারি সে রচনা।
সতত দূরে কাছে আগে পাছে বহিত
তোমারি যত কথা পাতা-লতা ঝরনা।

তোমারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া
বিরহ ছায়াতল সুশীতল করিয়া।
কখনো দেখি যেন ম্লান-হেন মুখানি,
কখনো আঁখিপুটে হাসি উঠে ভরিয়া।
কখনো সারা রাত ধরি হাত দুখানি
রহি গো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া।

বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে?
মিলনদাবানলে গেল জলে যেন রে।
কই সে দেবী কই? হেরো ওই একাকার,
শ্মশানবিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।
নাই গো দয়ামায়া স্নেহছায়া নাহি আর—
সকলি করে ধুধু, প্রাণ শুধু শিহরে।

জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৭

ক্ষণিক মিলন

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারি দিক সুবিজন,
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া।
দখিনবায়ুভরে থরথরে কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম তারি সম দুলিয়া।

আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে,
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।
আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।
সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়,
তাহারি চরণের শরণের লালসে।

যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়,
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।
সকল রূপহার উপহার চরণে,
ধায় গো উদাসিয়া যত হিয়া পায় পায়।
যে জন পড়ে থাকে একা ডাকে মরণে,
সুদূর হতে হাসি আর বাঁশি শোনা যায়।

শবদ নাহি আর, চারি ধার প্রাণহীন,
কেবল ধুক্ ধুক্ করে বুক নিশিদিন।
যেন গো ধ্বনি এই তারি সেই চরণের,
কেবলি বাজে শুনি, তাই গুনি দুই তিন।
কুড়ায়ে সব-শেষ অবশেষ স্মরণের
বসিয়া একজন আনমন উদাসীন।

জোড়াসাঁকো
৯ ভাদ্র ১৮৮৯

শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা

আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে ?
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল স্রোতে
বহায় যদি।
আবার দুটি নয়নে লুটি
হৃদয় হরে নিবে কে ?
আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে ?

আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা ?
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে
স্বরগ হতে করুণা ?
নিশীথনভে শুনিব কবে
গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব
নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি
কুমারী উষা অরুণা।
আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা ?

কোথা এ মোর জীবন-ডোর
বাঁধা রে ?

প্রেমের ফুল ফুটে' আকুল
কোথায় কোন্ আঁধারে ?
গভীরতম বাসনা মম
কোথায় আছে ?
আমার গান আমার প্রাণ
কাহার কাছে ?
কোন গগনে মেঘের কোণে
লুকায়ে কোন্ চাঁদা রে ?
কোথায় মোর জীবন-ডোর
বাঁধা রে ?

অনেক দিন পরানহীন
ধরণী।
বসনাবৃত খাঁচার মতো
তামসঘনবরনী।
নাই সে শাখা, নাই সে পাখা,
নাই সে পাতা,
নাই সে ছবি, নাই সে রবি,
নাই সে গাথা ;
জীবন চলে আঁধার জলে
আলোকহীন তরণী।
অনেক দিন পরানহীন
ধরণী।

মায়া-কারায় বিভোর প্রায়
সকলি ;
শতেক পাকে জড়ায়ে রাখে
ঘুমের ঘোর শিকলি।
দানব-হেন আছে কে যেন
দুয়ার আঁটি।

কাহার কাছে না জানি আছে
সোনার কাঠি ?
পরশ লেগে উঠিবে জেগে
হরষ-রস-কাকলি।
মায়া-কারায় বিভোর-প্রায়
সকলি।

দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।
তাহার হাতে আঁখির পাতে
জগত-জাগা জাগরণ।
সে হাসিখানি আনিবে টানি
সবার হাসি,
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ
জীবনরাশি।
প্রকৃতিবধূ চাহিবে মধু,
পরিবে নব আভরণ।
সে দিবে খুলি এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।

পাগল করে দিবে সে মোরে
চাহিয়া,
হৃদয়ে এসে মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া।
আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি
আকুল নীরে,
ঝরনা সম জগৎ মম
ঝরিবে শিরে।

তাহার বাণী দিবে গো আনি
সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল করে দিবে সে মোরে
চাহিয়া।

৪৯, পার্ক স্ট্রীট
আষাঢ় ১৮৮৭

আত্মসমর্পণ

আমি এ কেবল মিছে বলি,
শুধু আপনার মন ছলি।
কঠিন বচন শুনায়ে তোমারে
আপন মর্মে জ্বলি।
থাক্ তবে থাক্ ক্ষীণ প্রতারণা,
কী হবে লুকায়ে বাসনা বেদনা,
যেমন আমার হৃদয়-পরান
তেমনি দেখাব খুলি।

আমি মনে করি যাই দূরে,
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে।
যত দূরে যাই ততই তোমার
কাছাকাছি ফিরি ঘুরে।
চোখে চোখে থেকে কাছে নহ তবু,
দূরেতে থেকেও দূর নহ কভু,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।

আমি যেমনি করিয়া চাই,
আমি যেমনি করিয়া গাই,

বেদনাবিহীন ওই হাসিমুখ
সমান দেখিতে পাই।
ওই রূপরাশি আপনা বিকাশি
রয়েছে পূর্ণ গৌরবে ভাসি,
আমার ভিখারি প্রাণের বাসনা
হোথায় না পায় ঠাঁই।

শুধু ফুটন্ত ফুল-মাঝে
দেবী, তোমার চরণ সাজে।
অভাবকঠিন মলিন মর্ত
কোমল চরণে বাজে।
জেনে শুনে তবু কী ভ্রমে ভুলিয়া
আপনারে আমি এনেছি তুলিয়া,
বাহিরে আসিয়া দরিদ্র আশা
লুকাতে চাহিছে লাজে।

তবু থাক্ পড়ে ওইখানে,
চেয়ে তোমার চরণ-পানে।
যা দিয়েছি তাহা গেছে চিরকাল
আর ফিরিবে না প্রাণে।
তবে ভালো করে দেখো একবার
দীনতা হীনতা যা আছে আমার,
ছিন্ন মলিন অনাবৃত হিয়া
অভিমান নাহি জানে।

তবে লুকাব না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয়ভার।
আপনার হাতে চাব না রাখিতে
আপনার অধিকার।

বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ,
বদ্ধ বেদনা ছাড়া পেল আজ,
আশা-নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শত বার।

জোড়াসাঁকো
১১ ভাদ্র ১৮৮৯

নিষ্ফল কামনা

বৃথা এ ক্রন্দন।
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।
দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি।
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়।
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির-তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য-শিখা।

তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কোথায় পাব—
তাই এ ক্রন্দন।

বৃথা এ ক্রন্দন।
হায় রে দুরাশা,
এ রহস্য এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো,
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে?
আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,

এরি মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চিরসহচরে
চিররাত্রিদিন
একা অসহায় ?
যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন-তরে ?

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য-বিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে,
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

১৩ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

সংশয়ের আবেগ

ভালোবাস কি না বাস বুঝিতে পারি নে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি
সর্বগ্রাসী আঁখি।
তাই সারা রাত্রিদিন শ্রান্তি তৃপ্তি-নিদ্রাহীন
করিতেছি পান
যতটুকু হাসি পাই, যতটুকু কথা,
যতটুকু গান।

তাই কভু ফিরে যাই, কভু ফেলি শ্বাস,
কভু ধরি হাত।
কখনো কঠিন কথা, কখনো সোহাগ,
কভু অশ্রুপাত।
তুলি ফুল দেব ব'লে, ফেলে দিই ভূমিতলে
করি' খান খান।
কখনো আপন মনে আপনার সাথে
করি অভিমান।

জানি যদি ভালোবাস চির-ভালোবাসা
জনমে বিশ্বাস,
যেথা তুমি যেতে বল সেথা যেতে পারি—
ফেলি নে নিশ্বাস।

তরঙ্গিত এ হৃদয় তরঙ্গিত সমুদয়
বিশ্বচরাচর
মুহূর্তে হইবে শান্ত, টলমল প্রাণ
পাইবে নির্ভর।

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে,
যাবে অভিমান,
হৃদয়দেবতা হবে, করিব চরণে
পুষ্প-অর্ঘ্য দান।
দিবানিশি অবিরল লয়ে শ্বাস অশ্রুজল
লয়ে হাহুতাশ
চির ক্ষুধাতৃষা লয়ে আঁখির সম্মুখে
করিব না বাস।

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শত গুণ বলে—
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম,
দিব তা সকলে।

নহে তো আঘাত করো কঠোর কঠিন
কেঁদে যাই চলে।
কেড়ে লও বাহু তব, ফিরে লও আঁখি,
প্রেমে দাও দ'লে।
কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে— প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।

১৫ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

বিচ্ছেদের শান্তি

সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
তবে আর কেন মিছে করুণনয়নে
আমার মুখের পানে চাও ?
এ চোখে ভাসিছে জল, এ শুধু মায়ার ছল,
কেন কাঁদি তাও নাহি জানি।
নীরব আঁধার রাতি, তারকার ম্লান ভাতি
মোহ আনে বিদায়ের বাণী।
নিশিশেষে দিবালোকে এ জল রবে না চোখে,
শান্ত হবে অধীর হৃদয়—
জাগ্রত জগৎ-মাঝে ধাইব আপন কাজে,
কাঁদিবার রবে না সময়।

দেখেছি অনেক দিন বন্ধন হয়েছে ক্ষীণ
ছেঁড় নাই করুণার বশে।
গানে লাগিত না সুর, কাছে থেকে ছিলে দূর,
যাও নাই কেবল আলসে।
পরান ধরিয়া তবু পারিতাম না তো কভু
তোমা ছেড়ে করিতে গমন।
প্রাণপণে কাছে থাকি দেখিতাম মেলি আঁখি
পলে পলে প্রেমের মরণ।
তুমি তো আপনা হতে এসেছ বিদায় ল'তে—
সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও।

আমি রহি এক ধারে, তুমি যাও পরপারে,
মাঝখানে বহুক বিস্মৃতি—

একেবারে ভুলে যেয়ো, শত গুণে ভালো সেও,
ভালো নয় প্রেমের বিকৃতি।
কে বলে যায় না ভোলা! মরণের দ্বার খোলা,
সকলেরই আছে সমাপন।
নিবে যায় দাবানল, শুকায় সমুদ্রজল,
থেমে যায় ঝটিকার রণ।
থাকে শুধু মহা শান্তি, মৃত্যুর শ্যামল কান্তি,
জীবনের অনন্ত নির্ঝর—
শত সুখ দুঃখ দ'লে কালচক্র যায় চলে,
রেখা পড়ে যুগ-যুগান্তর।

যেখানে যে এসে পড়ে, আপনার কাজ করে,
সহস্র জীবন-মাঝে মিশে,
কত যায় কত থাকে, কত ভোলে কত রাখে,
চলে যায় বিষাদে হরিষে।
তুমি আমি যাব দূরে— তবুও জগৎ ঘুরে,
চন্দ্র সূর্য জাগে অবিরল,
থাকে সুখ দুঃখ লাজ, থাকে শত শত কাজ,
এ জীবন হয় না নিষ্ফল।
মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও—
নূতন আশ্রয়-ঠাঁই, দেখি পাই কি না পাই—
সেই ভালো তবে তুমি যাও।

১৪ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

তবু

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে

হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি—
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।
তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি–
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,
অথবা শারদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্ত-রাতে থেমে যায় খেলা।
তবু মনে রেখো, যদি মনে প'ড়ে আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

একাল ও সেকাল

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে

সেদিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া।
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িৎ-চকিত-দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।

বিরহিণী মর্মে-মরা মেঘমন্দ্র স্বরে।
নয়নে নিমেষ নাহি,
গগনে রহিত চাহি,
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে।

চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে।
মল্লার গাহিত কারা,
ঝরিত বরষাধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরানে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন;
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্নশিথিল বেশ,
সেদিনও এমনিতর অন্ধকার দিন।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনো হরিছে চিত্ত—
ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণতিমির।

আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা
সারা দিন, সারা বেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে।

২১ বৈশাখ ১৮৮৮

আকাঙ্ক্ষা

আর্দ্র তীব্র পূর্ববায়ু বহিতেছে বেগে,
ঢেকেছে উদয়পথ ঘননীল মেঘে।
দূরে গঙ্গা, নৌকা নাই, বালু উড়ে যায়,
বসে বসে ভাবিতেছি— আজি কে কোথায়।

শুষ্ক পাতা উড়ে পড়ে জনহীন পথে,
বনের উতল রোল আসে দূর হতে।
নীরব প্রভাত-পাখি, কম্পিত কুলায়,
মনে জাগিতেছে সদা— আজি সে কোথায়।

কত কাল ছিল কাছে, বলি নি তো কিছু,
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।
কত হাস্যপরিহাস, বাক্য-হানাহানি,
তার মাঝে রয়ে গেছে হৃদয়ের বাণী।

মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়,
ধ্বনিতে ধ্বনিত আর্দ্র উতরোল বায়।

ঘনাইত নিস্তব্ধতা দূর ঝটিকার,
নদীতীরে মেঘে বনে হত একাকার।
এলোকেশ মুখে তার পড়িত নামিয়া,
নয়নে সজল বাষ্প রহিত থামিয়া।

জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা,
অরণ্যমর্মরসম মর্মব্যাকুলতা,
ইহপরকালব্যাপী সুমহান প্রাণ,
উচ্ছ্বসিত উচ্চ আশা, মহত্ত্বের গান,

বৃহৎ-বিষাদ ছায়া, বিরহ গভীর,
প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর,
বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন—
নির্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন।

যথা দিবা-অবসানে নিশীথনিলয়ে
বিশ্ব দেখা দেয় তার গ্রহতারা লয়ে,
হাস্যপরিহাসমুক্ত হৃদয়ে আমার
দেখিত সে অন্তহীন জগৎ-বিস্তার।

নিম্নে শুধু কোলাহল খেলাধূলা হাস,
উপরে নির্লিপ্ত শান্ত অন্তর-আকাশ।
আলোকেতে দেখো শুধু ক্ষণিকের খেলা,
অন্ধকারে আছি আমি অসীম একেলা।

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে গেছে চলে,
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা ব'লে।
কল্পনার সত্যরাজ্য দেখাই নি তারে,
বসাই নি এ নির্জন আত্মার আঁধারে।

এ নিভৃতে, এ নিস্তব্ধে, এ মহত্ত্ব-মাঝে
দুটি চিত্ত চিরনিশি যদি রে বিরাজে—
হাসিহীন শব্দশূন্য ব্যোম দিশাহারা,
প্রেমপূর্ণ চারি চক্ষু জাগে চারি তারা।

শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, বাধা নাই পথে,
জীবন ব্যাপিয়া যায় জগতে জগতে—
দুটি প্রাণতন্ত্রী হতে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন-পানে।

২০ বৈশাখ ১৮৮৮

নিষ্ঠুর সৃষ্টি

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবই অন্ধ দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙে, এই গড়ে,
এই উঠে, এই পড়ে—
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।

মনে হয়, যেন ওই অবারিত শূন্যতলপথে
অকস্মাৎ আসিয়াছে সৃজনের বন্যা ভয়ানক—
অজ্ঞাত শিখর হতে
সহসা প্রচণ্ড স্রোতে
ছুটে আসে সূর্য চন্দ্র, ধেয়ে আসে লক্ষ কোটি লোক।

কোথাও পড়েছে আলো, কোথাও বা অন্ধকার নিশি,
কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত আবিল,
সৃজনে প্রলয়ে মিশি
আক্রমিছে দশ দিশি—
অনন্ত প্রশান্ত শূন্য তরঙ্গিয়া করিছে ফেনিল।

মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমুখে চলিয়াছি ছুটি,
অর্ধ পলকের তরে কোথাও দাঁড়াতে নাহি ঠাঁই।
এই ডুবি, এই উঠি,
ঘুরে ঘুরে পড়ি লুটি—
এই যারা কাছে আসে এই তারা কাছাকাছি নাই।

সৃষ্টিস্রোত-কোলাহলে বিলাপ শুনিবে কে বা কার,
আপন গর্জনে বিশ্ব আপনারে করেছে বধির।
শতকোটি হাহাকার
কলধ্বনি রচে তার—
পিছু ফিরে চাহিবার কাল নাই, চলেছে অধীর।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে ?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে ?

তুমি কি শুনিছ বসি হে বিধাতা, হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে প্রলাপজল্পনা ?
সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহককল্পনা।

গাজিপুর
১৩ বৈশাখ ১৮৮৮

প্রকৃতির প্রতি

শত শত প্রেমপাশে টানিয়া হৃদয়
একি খেলা তোর ?
ক্ষুদ্র এ কোমল প্রাণ, ইহারে বাঁধিতে
কেন এত ডোর ?
ঘুরে ফিরে পলে পলে
ভালোবাসা নিস ছলে,
ভালো না বাসিতে চাস
হায় মনচোর।

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই
নিষ্ঠুরা প্রকৃতি !
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধ গান,
কোথায় পিরিতি !

আপন রূপের রাশে
আপনি লুকায়ে হাসে,
আমরা কাঁদিয়া মরি
এ কেমন রীতি।

শূন্যক্ষেত্রে নিশিদিন আপনার মনে
কৌতুকের খেলা।
বুঝিতে পারি নে তোর কারে ভালোবাসা
কারে অবহেলা।
প্রভাতে যাহার 'পর
বড়ো স্নেহ সমাদর,
বিস্মৃত সে ধূলিতলে
সেই সন্ধ্যাবেলা।

তবু তোরে ভালোবাসি, পারি নে ভুলিতে
অয়ি মায়াবিনী।
স্নেহহীন আলিঙ্গন জাগায় হৃদয়ে
সহস্র রাগিণী।
এই সুখে দুঃখে শোকে
বেঁচে আছি দিবালোকে,
নাহি চাহি হিমশান্ত
অনন্ত যামিনী।

আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোর মুখ
রহস্যনিলয়
প্রেমের বেদনা আনে হৃদয়ের মাঝে,
সঙ্গে আনে ভয়।
বুঝিতে পারি নে তব
কত ভাব নব নব,
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণ
পরিপূর্ণ হয়।

প্রাণমন পসারিয়া ধাই তোর পানে,
নাহি দিস ধরা।
দেখা যায় মৃদু মধু কৌতুকের হাসি,
অরুণ-অধরা।
যদি চাই দূরে যেতে
কত ফাঁদ থাক পেতে—
কত ছল, কত বল
চপলা-মুখরা।

আপনি নাহিক জান আপনার সীমা,
রহস্য আপন।
তাই, অন্ধ রজনীতে যবে সপ্তলোক
নিদ্রায় মগন,
চুপি চুপি কৌতূহলে
দাঁড়াস আকাশতলে,
জ্বালাইয়া শত লক্ষ
নক্ষত্র-কিরণ।

কোথাও বা বসে আছ চির-একাকিনী,
চিরমৌনব্রতা।
চারি দিকে সুকঠিন তৃণতরুহীন
মরুনির্জনতা।
রবি শশী শিরোপর
উঠে যুগ-যুগান্তর
চেয়ে শুধু চলে যায়,
নাহি কয় কথা।

কোথাও বা খেলা কর বালিকার মতো,
উড়ে কেশবেশ—
হাসিরাশি উচ্ছ্বসিত উৎসের মতন,
নাহি লজ্জালেশ।

রাখিতে পারে না প্রাণ
আপনার পরিমাণ,
এত কথা এত গান
নাহি তার শেষ।

কখনো বা হিংসাদীপ্ত উন্মাদ নয়ন
নিমেষনিহত,
অনাথা ধরার বক্ষে অগ্নি-অভিশাপ
হানে অবিরত।
কখনো বা সন্ধ্যালোকে
উদাস উদার শোকে
মুখে পড়ে ম্লান ছায়া
করুণার মতো।

তবে তো করেছ বশ এমনি করিয়া
অসংখ্য পরান।
যুগ-যুগান্তর ধরে রয়েছে নূতন
মধুর বয়ান।
সাজি শত মায়াবাসে
আছ সকলেরই পাশে,
তবু আপনারে কারে
কর নাই দান।

যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহা রূপরাশি।
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস
তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালোবাসি।

১৫ বৈশাখ ১৮৮৮

মরণস্বপ্ন

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়
ম্লান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে।
ক্ষুদ্র নৌকা থরথরে চলিয়াছে পালভরে
কালস্রোতে যথা ভেসে যায়
অলস ভাবনাখানি আধোজাগা মনে।

এক পারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া,
অন্য পারে ঢালু তট শুভ্র বালুকায়
মিশে যায় চন্দ্রালোকে— ভেদ নাহি পড়ে চোখে—
বৈশাখের গঙ্গা কৃশকায়া
তীরতলে ধীরগতি অলস লীলায়।

স্বদেশ পুরব হতে বায়ু বহে আসে
দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস।
জাগ্রত আঁখির আগে কখনো বা চাঁদ জাগে
কখনো বা প্রিয়মুখ ভাসে—
আধেক উলস প্রাণ আধেক উদাস।

ঘনচ্ছায়া আম্রকুঞ্জ উত্তরের তীরে—
যেন তারা সত্য নহে, স্মৃতি-উপবন।
তীর, তরু, গৃহ, পথ, জ্যোৎস্নাপটে চিত্রবৎ—
পড়িয়াছে নীলাকাশ নীরে
দূর মায়া-জগতের ছায়ার মতন।

স্বপ্নাকুল আঁখি মুদি ভাবিতেছি মনে
রাজহংস ভেসে যায় অপার আকাশে
দীর্ঘ শুভ্র পাখা খুলি চন্দ্রালোক পানে তুলি—
পৃষ্ঠে আমি কোমল শয়নে,
সুখের মরণসম ঘুমঘোর আসে।

যেন রে প্রহর নাই, নাইক প্রহরী,
এ যেন রে দিবাহারা অনন্ত নিশীথ।
নিখিল নির্জন, স্তব্ধ, শুধু শুনি জলশব্দ
কলকল-কল্লোল-লহরী—
নিদ্রাপারাবার যেন স্বপ্ন-চঞ্চলিত।

কত যুগ চলে যায় নাহি পাই দিশা—
বিশ্ব নিব্‌-নিব্‌, যেন দীপ তৈলহীন।
গ্রাসিয়া আকাশকায়া ক্রমে পড়ে মহাছায়া,
নতশিরে বিশ্বব্যাপী নিশা
গনিতেছে মৃত্যুপল এক দুই তিন।

চন্দ্র শীর্ণতর হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়,
কলধ্বনি ক্ষীণ হয়ে মৌন হয়ে আসে।
প্রেতনয়নের মতো নির্নিমেষ তারা যত
সবে মিলে মোর পানে চায়,
একা আমি জনপ্রাণী অখণ্ড আকাশে।

চির যুগরাত্রি ধরে শতকোটি তারা
পরে পরে নিবে গেল গগন-মাঝার।
প্রাণপণে চক্ষু চাহি আঁখিতে আলোক নাহি,
বিঁধিতে পারে না আঁখিতারা
তুষারকঠিন মৃত্যুহিম অন্ধকার।

অসাড় বিহঙ্গ-পাখা পড়িল ঝুলিয়া,
লুটায় সুদীর্ঘ গ্রীবা— নামিল মরাল।
ধরিয়া অযুত অব্দ হুহু পতনের শব্দ
কর্ণরন্ধ্রে উঠে আকুলিয়া,
দ্বিধা হয়ে ভেঙে যায় নিশীথ করাল।

সহসা এ জীবনের সমুদয় স্মৃতি
ক্ষণেক জাগ্রত হয়ে নিমেষে চকিতে
আমারে ছাড়িয়া দূরে পড়ে গেল ভেঙেচুরে,
পিছে পিছে আমি ধাই নিতি—
একটি কণাও আর পাই না লখিতে।

কোথাও রাখিতে নারি দেহ আপনার,
সর্বাঙ্গ অবশ ক্লান্ত নিজ লৌহভারে।
কাতরে ডাকিতে চাহি, শ্বাস নাহি, স্বর নাহি,
কণ্ঠেতে চেপেছে অন্ধকার—
বিশ্বের প্রলয় একা আমার মাঝারে।

দীর্ঘ তীক্ষ্ণ হই ক্রমে তীব্র গতিবলে
ব্যগ্রগামী ঝটিকার আর্তস্বরসম,
সূক্ষ্ম বাণ সূচিমুখ অনন্ত কালের বুক
বিদীর্ণ করিয়া যেন চলে—
রেখা হয়ে মিশে আসে দেহমন মম।

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা,
অনন্তে মুহূর্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যাপ্তিহারা শূন্যসিন্ধু শুধু যেন এক বিন্দু
গাঢ়তম অন্তিম কালিমা—
আমারে গ্রাসিল সেই বিন্দু-পারাবার।

অন্ধকারহীন হয়ে গেল অন্ধকার।
'আমি' ব'লে কেহ নাই, তবু যেন আছে।
অচৈতন্যতলে অন্ধ চৈতন্য হইল বন্ধ,
রহিল প্রতীক্ষা করি কার
মৃত হয়ে প্রাণ যেন চিরকাল বাঁচে।

নয়ন মেলিনু, সেই বহিছে জাহ্নবী—
পশ্চিমে গৃহের মুখে চলেছে তরণী।
তীরে কুটিরের তলে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলে,
শূন্যে চাঁদ সুধামুখচ্ছবি।
সুপ্ত জীব কোলে লয়ে জাগ্রত ধরণী।

১৭ বৈশাখ ১৮৮৮

কুহুধ্বনি

প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনলশ্বসনা,
অন্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা
মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।
ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন-চারি
সিসুগাছ পাণ্ডুকিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা,
আম্রবন তাম্রফলময়।
গোলক-চাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে,
বন হতে আসে বাতায়নে—
ঝাউগাছ ছায়াহীন নিশ্বসিছে উদাসীন
শূন্যে চাহি আপনার মনে।
দূরান্ত প্রান্তর শুধু তপনে করিছে ধু ধু,
বাঁকা পথ শুষ্ক তপ্তকায়া—
তারি প্রান্তে উপবন, মৃদুমন্দ সমীরণ,
ফুলগন্ধ, শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া।
ছায়ায় কুটিরখানা দু ধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীসম করিছে বিরাজ,
তারি তলে সবে মিলি চলিতেছে নিরিবিলি
সুখে দুঃখে দিবসের কাজ।

কোথা হতে নিদ্রাহীন রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিন
কোকিল গাহিছে কুহুস্বরে।
সেই পুরাতন তান প্রকৃতির মর্ম-গান
পশিতেছে মানবের ঘরে।

বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি।
বাঁধা কূপ, তরুতল, বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লানমুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর, বসিয়া মাচার 'পর
শস্যখেত আগলিছে চাষি।
রাখালশিশুরা জুটে নাচে গায় খেলে ছুটে,
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।
কত কাজ কত খেলা কত মানবের মেলা,
সুখদুঃখ ভাবনা অশেষ—
তারি মাঝে কুহুস্বর একতান সকাতর
কোথা হতে লভিছে প্রবেশ।
নিখিল করিছে মগ্ন— জড়িত মিশ্রিত ভগ্ন
গীতহীন কলরব কত,
পড়িতেছে তারি 'পর পরিপূর্ণ সুধাস্বর
পরিস্ফুট পুষ্পটির মতো।
এত কাণ্ড, এত গোল, বিচিত্র এ কলরোল
সংসারের আবর্তবিভ্রমে—
তবু সেই চিরকাল অরণ্যের অন্তরাল
কুহুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।
যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি।

সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে,
জটিল সে ঝঞ্ঝনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্যের সরল সংগীতে।
তাই ওই চিরদিন ধ্বনিতেছে শ্রান্তিহীন
কুহুতান, করিছে কাতর—
সংগীতের ব্যথা বাজে, মিশিয়াছে তার মাঝে
করুণার অনুনয়-স্বর।

কেহ বসে গৃহমাঝে, কেহ বা চলেছে কাজে,
কেহ শোনে, কেহ নাহি শোনে—
তবুও সে কী মায়ায় ওই ধ্বনি থেকে যায়
বিশ্বব্যাপী মানবের মনে।
তবু যুগ-যুগান্তর মানবজীবনস্তর
ওই গানে আর্দ্র হয়ে আসে,
কত কোটি কুহুতান মিশায়েছে নিজ প্রাণ
জীবের জীবন-ইতিহাসে।
সুখে দুঃখে উৎসবে গান উঠে কলরবে
বিরল গ্রামের মাঝখানে,
তারি সাথে সুধাস্বরে মিশে ভালোবাসাভরে
পাখি-গানে মানবের গানে।
কোজাগর পূর্ণিমায় শিশু শূন্যে হেসে চায়,
ঘিরে হাসে জনকজননী—
সুদূর বনান্ত হতে দক্ষিণসমীরস্রোতে
ভেসে আসে কুহুকুহু ধ্বনি।
প্রচ্ছায় তমসাতীরে শিশু কুশলব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে—
ঘন সহকারশাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে,
কুহুতানে করুণা বরিষে।

লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থরথর,
তখনো সে কুহু-ভাষা রমণীর ভালোবাসা
করেছিল সুমধুরতর।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই
শুনিয়া আকুল কুহুরব—
বিশাল মানবপ্রাণ মোর মাঝে বর্তমান,
দেশকাল করি অভিভব।
অতীতের দুঃখসুখ, দূরবাসী প্রিয়মুখ,
শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান,
ওই কুহুমন্ত্রবলে জাগিতেছে দলে দলে
লভিতেছে নূতন পরান।

গাজিপুর
২২ বৈশাখ ১৮৮৮
শান্তিনিকেতন
৫ কার্তিক ১৮৮৮। সংশোধন

পত্র

বাসস্থানপরিবর্তন-উপলক্ষে

বন্ধুবর,
দক্ষিণে বেঁধেছি নীড়, চুকেছে লোকের ভিড় ;
বকুনির বিড় বিড় গেছে থেমে-থুমে।
আপনারে করে জড়ো কোণে বসে আছি দড়ো,
আর সাধ নেই বড়ো আকাশকুসুমে।
সুখ নেই, আছে শান্তি, ঘুচেছে মনের ভ্রান্তি,
'বিমুখা বান্ধবা যান্তি' বুঝিয়াছি সার।
কাছে থেকে কাটে সুখে গল্প ও গুড়ুক ফুঁকে,
গেলে দক্ষিণের মুখে দেখা নেই আর।

কাজ কী এ মিছে নাট, তুলেছি দোকান হাট,
গোলমাল চণ্ডীপাঠ আছি ভাই ভুলি।
তবু কেন খিটিমিটি, মাঝে মাঝে কড়া চিঠি,
থেকে থেকে দু-চারিটি চোখা চোখা বুলি।
'পেটে খেলে পিঠে সয়' এই তো প্রবাদে কয়,
ভুলে যদি দেখা হয় তবু সয়ে থাকি।
হাত করে নিশপিশ, মাঝে রেখে পোস্টাপিস
ছাড় শুধু দশ-বিশ শব্দভেদী ফাঁকি।
বিষম উৎপাত এ কী! হায় নারদের ঢেঁকি!
শেষকালে এ যে দেখি ঝগড়ার মতো।
মেলা কথা হল জমা, এইখানে দিই 'কমা',
আমার স্বভাব ক্ষমা, নির্বিবাদ ব্রত।
কেদারার 'পরে চাপি ভাবি শুধু ফিলজাফি,
নিতান্তই চুপিচাপি মাটির মানুষ।
লেখা তো লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের
সে কেবল কাগজের রঙিন ফানুস।
আঁধারের কূলে কূলে ক্ষীণশিখা মরে দুলে,
পথিকেরা মুখ তুলে চেয়ে দেখে তাই।
নকল নক্ষত্র হায় ধ্রুবতারা পানে ধায়,
ফিরে আসে এ ধরায় একরত্তি ছাই।
সবারে সাজে না ভালো, হৃদয়ে স্বর্গের আলো
আছে যার সেই জ্বালো আকাশের ভালে—
মাটির প্রদীপ যার নিবে-নিবে বারবার
সে দীপ জ্বলুক তার গৃহের আড়ালে।
যারা আছে কাছাকাছি তাহাদের নিয়ে আছি—
শুধু ভালোবেসে বাঁচি, বাঁচি যত কাল।
আশা কভু নাহি মেটে ভূতের বেগার খেটে,
কাগজে আঁচড় কেটে সকাল বিকাল।
কিছু নাহি করি দাওয়া, ছাতে বসে খাই হাওয়া
যতটুকু পড়ে-পাওয়া ততটুকু ভালো—

যারা মোরে ভালোবাসে ঘুরে ফিরে কাছে আসে,
হাসিখুশি আশেপাশে নয়নের আলো।
বাহবা যে জন চায় বসে থাক্ চৌমাথায়,
নাচুক তৃণের প্রায় পথিকের স্রোতে—
পরের মুখের বুলি ভরুক ভিক্ষার ঝুলি,
নাই চাল নাই চুলি ধুলির পর্বতে।

বেড়ে যায় দীর্ঘ ছন্দ, লেখনী না হয় বন্ধ,
বক্তৃতার নামগন্ধ পেলে রক্ষে নেই।
ফেনা ঢোকে নাকে চোখে, প্রবল মিলের ঝোঁকে
ভেসে যাই একরোখে বুঝি দক্ষিণেই।
বাহিরেতে চেয়ে দেখি দেবতাদুর্যোগ এ কী,
বসে বসে লিখিতে কি আর সরে মন।
আর্দ্র বায়ু বহে বেগে, গাছপালা ওঠে জেগে,
ঘনঘোর স্নিগ্ধ মেঘে আঁধার গগন।
বেলা যায়, বৃষ্টি বাড়ে, বসি আলিসার আড়ে
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে।
রাজপথ জনহীন, শুধু পান্থ দুই তিন
ছাতার ভিতরে লীন ধায় গৃহমুখে।
বৃষ্টি-ঘেরা চারি ধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ-ঝুপ শব্দ আর ঝর-ঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ—
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর দুটি ছলছল নলিননয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।

বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহব্যথায়।

দোহাই কল্পনা তোর, ছিন্ন কর্ মায়াডোর,
কবিতায় আর মোর নাই কোনো দাবি।
বিরহ, বকুল, আর বৃন্দাবন স্তূপাকার
সেগুলো চাপাই কার স্কন্ধে তাই ভাবি।
এখন ঘরের ছেলে বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে,
দু-দণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার
কলম হাঁকিয়ে ফেরা সকল রোগের সেরা,
তাই কবি-মানুষেরা অস্থিচর্মসার।
কলমের গোলামিটা আর নাহি লাগে মিঠা,
তার চেয়ে দুধ-ঘি'টা বহু গুণে শ্রেয়।
সাঙ্গ করি এইখানে— শেষে বলি কানে কানে,
পুরানো বন্ধুর পানে মুখ তুলে চেয়ো।

বৈশাখ ১৮৮৭

সিন্ধুতরঙ্গ

পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষে

দোলে রে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্র কোলে,
উৎসব ভীষণ।
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দম পবন।
আকাশ সমুদ্র-সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি, হা হা করে ফেনরাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির।

চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা, ছিঁড়েছে বন্ধন।

হারাইয়া চারি ধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে, ক্রন্দনে,
রোষে, ত্রাসে, ঊর্ধ্বশ্বাসে, অট্টরোলে, অট্টহাসে,
উন্মাদ গর্জনে,
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে যায় টুটে,
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কূল—
যেন রে পৃথিবী ফেলি বাসুকি করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি, আছাড়ি লাঙ্গুল।
যেন রে তরল নিশি টলমলি দশ দিশি
উঠিছে নড়িয়া,
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া।

নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন, নিরানন্দ
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠিছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ?
জল বাষ্প বজ্র বায়ু লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবনস্নায়ু টানিছে হতাশে,
দিগ্বিদিক নাহি জানে, বাধাবিঘ্ন নাহি মানে
ছুটেছে প্রলয়-পানে আপনারি ত্রাসে;
হেরো, মাঝখানে তারি আট শত নরনারী
বাহু বাঁধি বুকে,
প্রাণে আঁকড়িয়া প্রাণ, চাহিয়া সম্মুখে।

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে— রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে,
“দাও, দাও, দাও!”
সিন্ধু ফেনোচ্ছল ছলে কোটি ঊর্ধ্বকরে বলে,
“দাও, দাও, দাও!”
বিলম্ব দেখিয়া রোষে ফেনায়ে ফেনায়ে ফোষে,
নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে উঠে।
ক্ষুদ্র তরী গুরুভার সহিতে পারে না আর,
লৌহবক্ষ ওই তার যায় বুঝি টুটে।
অধ ঊর্ধ্ব এক হয়ে ক্ষুদ্র এ খেলেনা লয়ে
খেলিবারে চায়।
দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

নরনারী কম্পমান ডাকিতেছে, ভগবান!
হায় ভগবান!
দয়া করো, দয়া করো! উঠিছে কাতর স্বর,
রাখো রাখো প্রাণ!
কোথা সেই পুরাতন রবি শশী তারাগণ
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল!
আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার,
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল!
যে দিকে ফিরিয়া চাই পরিচিত কিছু নাই,
নাই আপনার—
সহস্র করাল মুখ সহস্র-আকার।

ফেটেছে তরণীতল, সবেগে উঠিছে জল,
সিন্ধু মেলে গ্রাস।
নাই তুমি, ভগবান, নাই দয়া, নাই প্রাণ—
জড়ের বিলাস।

ভয় দেখে ভয় পায়, শিশু কাঁদে উভরায়—
নিদারুণ হায়-হায় থামিল চকিতে।
নিমেষেই ফুরাইল, কখন জীবন ছিল
কখন জীবন গেল নারিল লখিতে।
যেন রে একই ঝড়ে নিবে গেল একত্তরে
শত দীপ আলো,
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরালো।

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা,
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথাভরা স্নেহময়
মানবের মন।
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তার পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে।
মধুর রবির করে কত ভালোবাসা-ভরে
কতদিন খেলা করে কত সুখে দুখে।
কেন করে টলমল দুটি ছোটো অশ্রুজল,
সকরুণ আশা।
দীপশিখাসম কাঁপে ভীত ভালোবাসা।

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব।
সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব।
ওই-যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে
কেন বাঁধে বক্ষ-'পরে সন্তান আপন।
মরণের মুখে ধায়, সেথাও দিবে না তায়—
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন।

আকাশেতে পারাবারে দাঁড়ায়েছে এক ধারে
এক ধারে নারী,
দুর্বল শিশুটি তার কে লইবে কাড়ি ?

এ বল কোথায় পেলে, আপন কোলের ছেলে
এত ক'রে টানে।
এ নিষ্ঠুর জড়স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে।
নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে,
অপূর্ব অমৃতপানে অনন্ত নবীন—
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনোখান
তিলেক পেয়েছে স্থান সে কি মাতৃহীন ?
এ প্রলয়-মাঝখানে অবলা জননী-প্রাণে
স্নেহ মৃত্যুজয়ী—
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী ?

পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে, দয়া নাই—
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা-আশা একত্র বেঁধেছে বাসা,
এক-সাথে রয়।
কে বা সত্য, কে বা মিছে, নিশিদিন আকুলিছে,
কভু ঊর্ধ্বে কভু নীচে টানিছে হৃদয়।
জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে—
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
এ কি দুই দেবতার দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙাগড়াময় ?
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয় ?

৪৯, পার্ক স্ট্রীট
আষাঢ় ১৮৮৭

শ্রাবণের পত্র

বন্ধু হে,

পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়,
কাজকর্ম করো সায়, এস চট্‌পট্‌ !
শামলা আঁটিয়া নিত্য তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা প'ড়ে মোর চিত্ত করে ছট্‌ফট্‌।
যখন যা সাজে ভাই তখন করিবে তাই,
কালাকাল মানা নাই কলির বিচার !
শ্রাবণে ডেপুটিপনা এ তো কভু নয় সনা-
তন প্রথা, এ যে অনা-সৃষ্টি অনাচার।
ছুটি লয়ে কোনোমতে পোট্‌মাণ্টো তুলি রথে
সেজেগুজে রেলপথে করো অভিসার :
লয়ে দাড়ি লয়ে হাসি অবতীর্ণ হও আসি,
রুধিয়া জানালা শাসি বসি একবার।
বজ্ররবে সচকিত কাঁপিবে গৃহের ভিত,
পথে শুনি কদাচিৎ চক্র খড়্‌খড়্‌।
হা রে রে ইংরাজ-রাজ, এ সাধে হানিলি বাজ—
শুধু কাজ, শুধু কাজ, শুধু ধড়্‌ফড়্‌।
আমলা-শামলা-স্রোতে ভাসাইলি এ ভারতে,
যেন নেই ত্রিজগতে হাসি গল্প গান—
নেই বাঁশি, নেই বঁধু, নেই রে যৌবনমধু,
মুছেছে পথিকবধূ সজল নয়ান।
যেন রে শরম টুটে কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল—
কেবল জগৎটাকে জড়ায়ে সহস্র পাকে
গবর্মেণ্ট পড়ে থাকে বিরাট বিপুল।
বিষম রাক্ষস ওটা, মেলিয়া আপিস-কোটা
গ্রাস করে গোটা গোটা বন্ধুবান্ধবেরে—

বৃহৎ বিদেশে দেশে কে কোথা তলায় শেষে
কোথাকার সর্বনেশে সর্বিসের ফেরে।
এ দিকে বাদর ভরা, নবীন শ্যামল ধরা,
নিশিদিন জল-ঝরা সঘন গগন।
এ দিকে ঘরের কোণে বিরহিণী বাতায়নে,
দিগন্তে তমালবনে নয়ন মগন।
হেঁট মুণ্ড করি হেঁট মিছে কর agitate,
খালি রেখে খালি পেট ভরিছ কাগজ।
এ দিকে যে গোরা মিলে কালা বন্ধু লুটে নিলে,
তার বেলা কী করিলে নাই কোনো খোঁজ।
দেখিছ না আঁখি খুলে ম্যাঞ্চেস্টর লিভারপুলে
দেশী শিল্প জলে গুলে করিল finish।
'আষাঢ়ে গল্প' সে কই, সেও বুঝি গেল ওই
আমাদের নিতান্তই দেশের জিনিস।
তুমি আছ কোথা গিয়া, আমি আছি শূন্যহিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া শোকতাপহরা।
সে তাকিয়া— গল্পগীতি সাহিত্যচর্চার স্মৃতি
কত হাসি কত প্রীতি কত তুলো -ভরা!
কোথায় সে যদুপতি, কোথা মথুরার গতি,
অথ, চিন্তা করি ইতি কুরু মনস্থির—
মায়াময় এ জগৎ নহে সৎ নহে সৎ,
যেন পদ্মপত্রবৎ, তদুপরি নীর।
অতএব ত্বরা ক'রে উত্তর লিখিবে মোরে,
সর্বদা নিকটে ঘোরে কাল সে করাল—
(সুধী তুমি ত্যজি নীর গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর)
এই তত্ত্ব এ চিঠির জানিয়ো moral।

শ্রাবণ ১৮৮৭

নিষ্ফল প্রয়াস

ওই যে সৌন্দর্য লাগি পাগল ভুবন,
ফুটন্ত অধরপ্রান্তে হাসির বিলাস,
গভীরতিমিরমগ্ন আঁখির কিরণ,
লাবণ্যতরঙ্গভঙ্গ গতির উচ্ছ্বাস,
যৌবনললিতলতা বাহুর বন্ধন,
এরা তো তোমারে ঘিরে আছে অনুক্ষণ—
তুমি কি পেয়েছ নিজ সৌন্দর্য-আভাস ?
মধুরাতে ফুলপাতে করিয়া শয়ন
বুঝিতে পার কি নিজ মধু-আলিঙ্গন ?
আপনার প্রস্ফুটিত তনুর উল্লাস
আপনারে করেছে কি মোহ-নিমগন ?
তবে মোরা কী লাগিয়া করি হা হুতাশ।
দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন ;
রূপ নাহি ধরা দেয়— বৃথা সে প্রয়াস।

৪৯, পার্ক স্ট্রীট
১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

হৃদয়ের ধন

কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি—
তাহার সৌন্দর্য লয়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি,
আঁখিতলে বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া।
অধরের হাসি লব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি লব নয়নে আঁকিয়া,
কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবসনিশি সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া।

নাই, নাই, কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ—
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে— শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিনমুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?

১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

নিভৃত আশ্রম

সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে
অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরীমুরতি
স্থাপনা করিব যত্নে হৃদয়-আসনে।
প্রেমের প্রদীপ লয়ে করিব আরতি।
রাখিব দুয়ার রুধি আপনার মনে,
তাহার আলোকে রব আপন ছায়ায়—
পাছে কেহ কুতূহলে কৌতুকনয়নে
হৃদয়দুয়ারে এসে দেখে হেসে যায়।
মর যেমন থাকে কমলশয়নে,
সৌরভসদনে, কারো পথ নাহি চায়,
পদশব্দ নাহি গণে, কথা নাহি শোনে,
তেমনি হইব মগ্ন পবিত্র মায়ায়।
লোকালয়-মাঝে থাকি রব তপোবনে,
একেলা থেকেও তবু রব সাথি-সনে।

১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

নারীর উক্তি

মিছে তর্ক— থাক্ তবে থাক্।
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি—
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে
ওই তব আঁখি-তুলে চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে যাওয়া?

কেন আন বসন্তনিশীথে
আঁখিভরা আবেশ বিহ্বল
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্তমনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল?

আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষ-মানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান?

মনে আছে সেই এক দিন
প্রথম প্রণয় সে তখন।
বিমল শরৎকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল,
মৃদু শীতবায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ।

কাননে ফুটিত শেফালিকা,
ফুলে ছেয়ে যেত তরুমূল।
পরিপূর্ণ সুরধুনী, কুলুকুলু ধ্বনি শুনি,
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল।

আমা-পানে চাহিয়ে, তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি তো জান না তাহা, আমি তাহা জানি।

সে কি মনে পড়িবে তোমার—
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে কোন আকর্ষণডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।

ক্ষণিক বিরহ-অবসানে
নিবিড় মিলন-ব্যাকুলতা।
মাঝে মাঝে সব ফেলি রহিতে নয়ন মেলি,
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা।

কোনো কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।
নীরবে চরণ ফেলে চুপিচুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া।

আজ তুমি দেখেও দেখ না,
সব কথা শুনিতে না পাও।
কাছে আস আশা ক'রে আছি সারাদিন ধরে,
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে যাও।

দীপ জেলে দীর্ঘ ছায়া লয়ে
বসে আছি সন্ধ্যায় ক'জনা—
হয়তো বা কাছে এস, হয়তো বা দূরে বস,
সে সকলি ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা।

এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছ অন্যমনে।
সর্বত্র ছিলাম আমি— এখন এসেছি নামি
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে।

দিয়েছিলে হৃদয় যখন
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ—
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ।

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভালোবেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কী কুগ্রহ, আজ তারে অনুগ্রহ—
মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটি দুই-তিন।

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে।

তুমিই তো দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না এত আশা)
প্রেমে দেয় কতখানি কোন্ হাসি কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালোবাসা।

তোমারি সে ভালোবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালোবাসা—
আজি এই দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশি রাশি,
এই দূরে চলে-যাওয়া, এই কাছে আসা।

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পার না ?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি ? এই মুছিলাম আঁখি—
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।

২১ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

পুরুষের উক্তি

যেদিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবনপথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন।

তখন উষার আধো আলো
পড়েছিল মুখে দুজনার।
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে,
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার।

কে জানিত শ্রান্তি তৃপ্তি ভয়,
কে জানিত নৈরাশ্যযাতনা !
কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া,
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা।

আঁখি মেলি যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো বলে জানি।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না তো সে সংশয়,
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি।

অনন্ত বাসরসুখ যেন
নিত্যহাসি প্রকৃতিবধূর—
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ, পাখির অশ্রান্ত গান,
বিশ্ব করেছিল ভান অনন্ত মধুর!

সেই গানে, সেই ফুল্ল ফুলে,
সেই প্রাতে প্রথম যৌবনে,
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়,
প্রেম চিরদিন রয় এ চিরজীবনে।

তাই সেই আশার উল্লাসে
মুখ তুলে চেয়েছিনু মুখে।
সুধাপাত্র লয়ে হাতে কিরণকিরীট মাথে
তরুণ দেবতাসম দাঁড়ানু সম্মুখে।

পত্রপুষ্প-গ্রহতারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কী মূর্তি আঁকিলে প্রাণে—
কী ললাট, কী নয়ন, কী শান্ত অধর!

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল,
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢলঢল—
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

পরিপূর্ণ পূর্ণিমার মাঝে
ঊর্ধ্বমুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায়, ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ-স্বপন-ছাওয়া জ্যোৎস্না-আবরণ—

তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর
তুলিতে যাইত কত বার
একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে
মধুর রহস্যময় সৌন্দর্য তোমার।

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে হাতে ঠেকা, সেই আধো চোখে দেখা,
চুপিচুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা!

অজানিত সকলি নূতন,
অবশ চরণ টলমল!
কোথা পথ কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হতে উঠে হাসি কোথা অশ্রুজল!

অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে লয়ে
অবারিত প্রেমের ভবনে
যাহা পাই তাই তুলি, খেলাই আপনা ভুলি—
কী যে রাখি কী যে ফেলি বুঝিতে পারি নে।

ক্রমে আসে আনন্দ-আলস
কুসুমিত ছায়াতরুতলে—
জাগাই সরসীজল, ছিঁড়ি বসে ফুলদল,
ধূলি সেও ভালো লাগে খেলাবার ছলে।

অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া—
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় করে ওঠে হায়-হায়,
অরণ্য মর্মরি ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মনে হয় একি সব ফাঁকি !
এই বুঝি, আর কিছু নাই !
অথবা যে রত্ন-তরে এসেছিনু আশা ক'রে
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই।

সুখের কাননতলে বসি
হৃদয়ের মাঝারে বেদনা···
নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।

এরি মাঝে ক্লান্তি কেন আসে,
উঠিবারে করি প্রাণপণ !
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশি,
শরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার।
সেই মায়া-উপবন কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকালো পাথার।

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়—
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা এই নিশা এই ক্ষুধা এই তৃষা,
প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনার টানে।

আমি চাই তোমারে যেমন
তুমি চাও তেমনি আমারে—
কৃতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে,
তুমি এসে বসে আছ আমার দুয়ারে।

সৌন্দর্যসম্পদ-মাঝে বসি
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা।
ভিক্ষা ভিক্ষা সব ঠাঁই— তবে আর কোথা যাই
ভিখারিনী হল যদি কমল-আসনা।

তাই আর পারি না সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমা ছাড়া ছিল না তোমার বাড়া,
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।

কখনো বা চাঁদের আলোতে
কখনো বসন্তসমীরণে
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপাররহস্যময়ী
আনন্দ-মুরতিখানি জেগে ওঠে মনে।

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া
নবীন যৌবনময় প্রাণে—
কেন হেরি অশ্রুজল হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে।

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না চেয়ো না তবে আর।
এস থাকি দুই জনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্প অর্ঘ্যভার।

পার্ক স্ট্রীট
২৩ অগ্রহায়ণ ১৮৮৭

শূন্য গৃহে

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানবহৃদয়ে,
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন!
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে,
তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন!

প্রাণ যাহা চায় তাহা দাও বা না দাও,
তা বলে কি করুণা পাব না?
দুর্লভ ধনের তরে শিশু কাঁদে সকাতরে,
তা বলে কি জননীর বাজে না বেদনা?

দুর্বল মানব-হিয়া বিদীর্ণ যেথায়,
মর্মভেদী যন্ত্রণা বিষম,
জীবন নির্ভরহারা ধুলায় লুটায়ে সারা,
সেথাও কেন গো তব কঠিন নিয়ম।

সেথাও জগৎ তব চিরমৌনী কেন,
নাহি দেয় আশ্বাসের সুখ।
ছিন্ন করি অন্তরাল অসীম রহস্যজাল
কেন না প্রকাশ পায় গুপ্ত স্নেহমুখ!

ধরণী জননী কেন বলিয়া উঠে না
—করুণমর্মর কণ্ঠস্বর—
"আমি শুধু ধুলি নই, বৎস, আমি প্রাণময়ী
জননী, তোদের লাগি অন্তর কাতর।

"নহ তুমি পরিত্যক্ত অনাথ সন্তান
চরাচর নিখিলের মাঝে;
তোমার ব্যাকুল স্বর উঠিছে আকাশ-'পর,
তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে বাজে।"

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে,
কোথাও কি আছে প্রভু, হেন বজ্রপাত ?

আছে সেই সূর্যালোক, নাই সেই হাসি—
আছে চাঁদ, নাই চাঁদমুখ।
শূন্য পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ, নাই কেহ—
রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ।

সেইটুকু মুখখানি, সেই দুটি হাত,
সেই হাসি অধরের ধারে,
সে নহিলে এ জগৎ শুষ্ক মরুভূমিবৎ—
নিতান্ত সামান্য এ কি এ বিশ্বব্যাপারে ?

এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট
চৌদিকের চিরনীরবতা ?
সমস্ত মানবপ্রাণ বেদনায় কম্পমান
নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা !

গাজিপুর
১১ বৈশাখ ১৮৮৮

জীবনমধ্যাহ্ন

জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে,
চলেছিনু আপনার বলে,
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে
আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।

অশ্রুতে ছিল না তাপ, হাস্যে উপহাস,
  বচনে ছিল না বিষানল—
ভাবনাভ্রূকুটিহীন সরল ললাট
  সুপ্রশান্ত আনন্দ-উজ্জ্বল।

কুটিল হইল পথ, জটিল জীবন,
  বেড়ে গেল জীবনের ভার—
ধরণীর ধূলিমাঝে গুরু আকর্ষণ,
  পতন হইল কত বার।
আপনার 'পরে আর কিসের বিশ্বাস,
  আপনার মাঝে আশা নাই—
দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে, ধূলি-সাথে মিশে
  লজ্জাবস্ত্র জীর্ণ শত ঠাঁই।

তাই আজ বার বার ধাই তব পানে,
  ওহে তুমি নিখিলনির্ভর—
অনন্ত এ দেশকাল আচ্ছন্ন করিয়া
  আছ তুমি আপনার 'পর।
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে পথে দেখিতেছি চেয়ে
  তোমার এ ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ—
কোথায় এসেছি আমি, কোথায় যেতেছি,
  কোন্ পথে চলেছে জগৎ।

প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান
  চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা—
নিশীথ-আকাশ-মাঝে নয়ন তুলিয়া
  দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা—
সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন
  জ্যোতির্ময় তোমার আভাস
ওহে মহা অন্ধকার, ওহে মহাজ্যোতি,
  অপ্রকাশ, চির-স্বপ্রকাশ।

যখন জীবনভার ছিল লঘু অতি
যখন ছিল না কোনো পাপ
তখন তোমার পানে দেখি নাই চেয়ে,
জানি নাই তোমার প্রতাপ—
তোমার অগাধ শান্তি, রহস্য অপার,
সৌন্দর্য অসীম অতুলন—
স্তব্ধভাবে মুগ্ধনেত্রে নিবিড় বিস্ময়ে
দেখি নাই তোমার ভুবন।

কোমল সায়াহ্নলেখা বিষণ্ণ উদার
প্রান্তরের প্রান্ত-আম্রবনে,
বৈশাখের নীলধারা বিমলবাহিনী
ক্ষীণগঙ্গা সৈকতশয়নে,
শিরোপরি সপ্ত ঋষি যুগ-যুগান্তের
ইতিহাসে নিবিষ্ট-নয়ান,
নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে
নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান—

নিত্যনিশ্বসিত বায়ু, উন্মেষিত উষা,
কনকে শ্যামলে সম্মিলন,
দূরদূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস,
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন,
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি—
জগতের মর্ম হতে মোর মর্মস্থলে
আনিতেছে জীবনলহরী।

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহবিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষঃস্থল।

প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা,
মিশে যায় মহাপ্রাণসাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপধারা।

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দমুরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবনকুহরে
মঙ্গল-আনন্দধ্বনি বাজে।

১৪ বৈশাখ ১৮৮৮

শ্রান্তি

কত বার মনে করি পূর্ণিমানিশীথে
স্নিগ্ধ সমীরণ,
নিদ্রালস আঁখি-সম ধীরে যদি মুদে আসে
এ শ্রান্ত জীবন।
গগনের অনিমেষ জাগ্রত চাঁদের পানে
মুক্ত দুটি বাতায়নদ্বার—
সুদূরে প্রহর বাজে, গঙ্গা কোথা বহে চলে,
নিদ্রায় সুষুপ্ত দুই পার।
মাঝি গান গেয়ে যায় বৃন্দাবনগাথা
আপনার মনে,
চিরজীবনের স্মৃতি অশ্রু হয়ে গলে আসে
নয়নের কোণে।

স্বপ্নের সুধীর স্রোতে দূরে ভেসে যায় প্রাণ
স্বপ্ন হতে নিঃস্বপ্ন অতলে,
ভাসানো প্রদীপ যথা নিবে গিয়ে সন্ধ্যাবায়ে
ডুবে যায় জাহ্নবীর জলে।

১৬ বৈশাখ ১৮৮৮

বিচ্ছেদ

ব্যাকুল নয়ন মোর, অস্তমান রবি,
সায়াহ্ন মেঘাবনত পশ্চিম গগনে,
সকলে দেখিতেছিল সেই মুখচ্ছবি—
একা সে চলিতেছিল আপনার মনে।

ধরণী ধরিতেছিল কোমল চরণ,
বাতাস লভিতেছিল বিমল নিশ্বাস,
সন্ধ্যার আলোক-আঁকা দুখানি নয়ন
ভুলায়ে লইতেছিল পশ্চিম আকাশ।

রবি তারে দিতেছিল আপন কিরণ,
মেঘ তারে দিতেছিল স্বর্ণময় ছায়া,
মুগ্ধহিয়া পথিকের উৎসুক নয়ন
মুখে তার দিতেছিল প্রেমপূর্ণ মায়া।

চারি দিকে শস্যরাশি চিত্রসম স্থির,
প্রান্তে নীল নদীরেখা, দূর পরপারে
শুভ্র চর, আরো দূরে বনের তিমির
দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত-মাঝারে।

দিবসের শেষ দৃষ্টি— অন্তিম মহিমা—
সহসা ঘেরিল তারে কনক-আলোকে,

বিষণ্ণ কিরণপটে মোহিনী প্রতিমা
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে অনিমেষ চোখে।

নিমেষে ঘুরিল ধরা, ডুবিল তপন,
সহসা সম্মুখে এল ঘোর অন্তরাল—
নয়নের দৃষ্টি গেল, রহিল স্বপন,
অনন্ত আকাশ, আর ধরণী বিশাল।

১৯ বৈশাখ ১৮৮৮

মানসিক অভিসার

মনে হয় সেও যেন রয়েছে বসিয়া
চাহি বাতায়ন হতে নয়ন উদাস—
কপোলে, কানের কাছে, যায় নিশ্বসিয়া
কে জানে কাহার কথা বিষণ্ণ বাতাস।

ত্যজি তার তনুখানি কোমল হৃদয়
বাহির হয়েছে যেন দীর্ঘ অভিসারে,
সম্মুখে অপার ধরা কঠিন নিদয়—
একাকিনী দাঁড়ায়েছে তাহারি মাঝারে।

হয়তো বা এখনি সে এসেছে হেথায়
মৃদুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে,
মানস-মুরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।

তারি ভালোবাসা, তারি বাহু সুকোমল,
উৎকণ্ঠ চকোর-সম বিরহ-তিয়াষ,

বহিয়া আনিছে এই পুষ্প-পরিমল –
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্ত-বাতাস।

২১ বৈশাখ ১৮৮৮

পত্রের প্রত্যাশা

চিঠি কই! দিন গেল. বইগুলো ছুঁড়ে ফেলো,
আর তো লাগে না ভালো ছাইপাঁশ পড়া।
মিটায়ে মনের খেদ গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ
পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদ মিছে মন-গড়া।
কাননপ্রান্তের কাছে ছায়া পড়ে গাছে গাছে,
ম্লান আলো শুয়ে আছে বালুকার তীরে।
বায়ু উঠে ঢেউ তুলি, টলমল পড়ে ঢুলি
কূলে বাঁধা নৌকাগুলি জাহ্নবীর নীরে।

চিঠি কই! হেথা এসে একা বসে দূর দেশে
কী পড়িব দিনশেষে সন্ধ্যার আলোকে!
গোধূলির ছায়াতলে কে বলো গো মায়াবলে
সেই মুখ অশ্রুজলে এঁকে দেবে চোখে।
গভীর গুঞ্জনস্বনে ঝিল্লিরব উঠে বনে,
কে মিশাবে তারি সনে স্মৃতিকণ্ঠস্বর।
তীরতরু-ছায়ে-ছায়ে কোমল সন্ধ্যার বায়ে
কে আনিয়া দিবে গায়ে সুকোমল কর।

পাখি তরুশিরে আসে, দূর হতে নীড়ে আসে,
তরীগুলি তীরে আসে, ফিরে আসে সবে—
তার সেই স্নেহস্বর ভেদি দূর-দূরান্তর
কেন এ কোলের ’পর আসে না নীরবে!
দিনান্তে স্নেহের স্মৃতি একবার আসে নিতি
কলরব-ভরা প্রীতি লয়ে তার মুখে—

দিবসের ভার যত তবে হয় অপগত,
নিশি নিমেষের মতো কাটে স্বপ্নসুখে।

সকলি তো মনে আছে যতদিন ছিল কাছে
কত কথা বলিয়াছে কত ভালোবেসে—
কত কথা শুনি নাই হৃদয়ে পায় নি ঠাঁই,
মুহূর্ত শুনিয়া তাই ভুলেছি নিমেষে।
পাতা পোরাবার ছলে আজ সে যা-কিছু বলে
তাই শুনে মন গলে, চোখে আসে জল—
তারি লাগি কত ব্যথা, কত মনোব্যাকুলতা,
দু-চারিটি তুচ্ছ কথা জীবনসম্বল।

দিবা যেন আলোহীনা এই দুটি কথা বিনা
'তুমি ভালো আছ কি না' 'আমি ভালো আছি'
স্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে,
দুটি কথা দূর থেকে করে কাছাকাছি।
দরশ পরশ যত সকল বন্ধন গত,
মাঝে ব্যবধান কত নদীগিরিপারে—
স্মৃতি শুধু স্নেহ বয়ে দুঁহু করস্পর্শ লয়ে
অক্ষরের মালা হয়ে বাঁধে দুজনারে।

কই চিঠি! এল নিশা, তিমিরে ডুবিল দিশা,
সারা দিবসের তৃষা রয়ে গেল মনে—
অন্ধকার নদীতীরে বেড়াতেছি ফিরে ফিরে,
প্রকৃতির শান্তি ধীরে পশিছে জীবনে।
ক্রমে আঁখি ছলছল্, দুটি ফোঁটা অশ্রুজল
ভিজায় কপোলতল, শুকায় বাতাসে—
ক্রমে অশ্রু নাহি বয়, ললাট শীতল হয়
রজনীর শান্তিময় শীতল নিশ্বাসে।

আকাশে অসংখ্য তারা চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা
হৃদয় বিস্ময়ে সারা হেরি একদিঠি—
আর যে আসে না আসে মুক্ত এই মহাকাশে
প্রতি সন্ধ্যা পরকাশে অসীমের চিঠি।
অনন্ত বারতা বহে, অন্ধকার হতে কহে,
“যে রহে যে নাহি রহে কেহ নহে একা—
সীমাপরপারে থাকি সেথা হতে সবে ডাকি
প্রতি রাত্রে লিখে রাখি জ্যোতিপত্রলেখা।”

২৩ বৈশাখ ১৮৮৮

বধূ

“বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্!”—
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথ তল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে “জলকে চল্”।

কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধুধু,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি।

শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনি-ফুলে-ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ ধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁষে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া!
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট,
পাখির গান কই, বনের ছায়া!

কে যেন চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে,
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে।
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন-কাছে।

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে,
অবাক্ হয়ে সবে কারণ খোঁজে।
"কিছুতে নাহি তোষ, এ তো বিষম দোষ
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও যে।

স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে বসে নয়ন বোজে ?”

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ,
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের 'পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট—
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো।
উঠিলে নব শশী, ছাদের 'পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো!

হৃদয়বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা, আঁখিজলে রজনী জাগো,
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে,
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।

নিমেষতরে তাই আপনা ভুলি
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি।
অমনি চারি ধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি।

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্—
"বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্।"
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস যদি কেহ আমায় বল্।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮
সংশোধন-পরিবর্ধন :
শান্তিনিকেতন। ৭ কার্তিক

ব্যক্ত প্রেম

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ?
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন?

আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি,
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে,
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।

তুলিতে পূজার ফুল যেতেম যখন
সেই পথ ছায়া-করা, সেই বেড়া লতা-ভরা,
সেই সরসীর তীরে করবীর বন—

সেই কুহরিত পিক শিরীষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা, কত হাসি কত খেলা—
কে জানিত কী ছিল এ প্রাণের আড়ালে।

বসন্তে উঠিত ফুটে বনে বেলফুল,
কেহ বা পরিত মালা, কেহ বা ভরিত ডালা,
করিত দক্ষিণবায়ু অঞ্চল আকুল।

বরষায় ঘনঘটা, বিজুলি খেলায়—
প্রান্তরের প্রান্তদিশে মেঘে বনে যেত মিশে,
জুঁইগুলি বিকশিত বিকাল বেলায়।

বর্ষ আসে বর্ষ যায়, গৃহকাজ করি—
সুখদুঃখ ভাগ লয়ে প্রতিদিন যায় বয়ে,
গোপন স্বপন লয়ে কাটে বিভাবরী।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত!
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মতো জলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

ভাঙিয়া দেখিলে ছিছি নারীর হৃদয়!
লাজে ভয়ে থর্‌থর্ ভালোবাসা-সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয়!

আজিও তো সেই আসে বসন্ত শরৎ।
বাঁকা সেই চাঁপা-শাখে সোনা-ফুল ফুটে থাকে,
সেই তারা তোলে এসে— সেই ছায়াপথ।

সবাই যেমন ছিল, আছে অবিকল—
সেই তারা কাঁদে হাসে, কাজ করে, ভালোবাসে,
করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে আনে জল।

কেহ উঁকি মারে নাই তাহাদের প্রাণে—
ভাঙিয়া দেখে নি কেহ হৃদয় গোপন গেহ,
আপন মরম তারা আপনি না জানে।

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি,
পল্লবের সুচিকন ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি ধুলায় হায় যাই গড়াগড়ি।

নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালোবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি দিবে অন্তরাল,
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে।

মুখ ফিরাতেছ সখা, আজ কী বলিয়া!
ভুল করে এসেছিলে? ভুলে ভালোবেসেছিলে?
ভুল ভেঙে গেছে, তাই যেতেছ চলিয়া?

তুমি তো ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল—
আমার যে ফিরিবার পথ রাখ নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল।

একি নিদারুণ ভুল! নিখিলনিলয়ে
এত শত প্রাণ ফেলে ভুল করে কেন এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে!

ভেবে দেখো আনিয়াছ মোরে কোন্‌খানে—
শত লক্ষ আঁখিভরা কৌতুককঠিন ধরা
চেয়ে রবে অনাবৃত কলঙ্কের পানে।

ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে,
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনা-বেশে!

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

পরিবর্ধন: শান্তিনিকেতন। ৭ কার্তিক

গুপ্ত প্রেম

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে!

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে,
কী ব'লে আপনারে দিব তায়?

ভালো বাসিলে ভালো যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভালো বাসিতে।
মধুর হাসি তার দিক সে উপহার
মাধুরী ফুটে যার হাসিতে।

যার নবনীসুকুমার কপোলতল,
কী শোভা পায় প্রেমলাজে গো!
যাহার ঢলঢল নয়ন শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো।

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালোবাসিতে মরি শরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

আহা এ তনু-আবরণ শ্রীহীন ম্লান
ঝরিয়া পড়ে যদি শুকায়ে,
হৃদয়মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে।

যত গোপনে ভালোবাসি পরান ভরি
পরান ভরি উঠে শোভাতে—
যেমন কালো মেঘে অরুণ-আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।

আমি সে শোভা কাহারে তো দেখাতে নারি,
এ পোড়া দেহ সবে দেখে যায়--
প্রেম যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে,
মনেরই অন্ধকূপে থেকে যায়।

দেখো, বনের ভালোবাসা আঁধারে বসি
কুসুমে আপনারে বিকাশে,
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন আলো দিয়া লিখা সে।

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে,
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই,
পরান কেঁদে তাই মরিছে।

আমি আপন মধুরতা আপনি জানি
পরানে আছে যাহা জাগিয়া,
তাহারে লয়ে সেথা দেখাতে পারিলে তা
যেত এ ব্যাকুলতা ভাগিয়া।

আমি রূপসী নহি, তবু আমারো মনে
প্রেমের রূপ সে তো সুমধুর।
ধন সে যতনের শয়ন-স্বপনের,
করে সে জীবনের তমোদূর।

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না তো অপমান।
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তাহারো চেয়ে সে যে মহীয়ান।

পাছে কুরূপ কভু তারে দেখিতে হয়
কুরূপ দেহমাঝে উদিয়া,
প্রাণের এক ধারে দেহের পরপারে
তাই তো রাখি তারে রুধিয়া।

তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহি নে তারে,
নীরবে থাকে তাই রসনা।
মুখে সে চাহে যত নয়ন করি নত,
গোপনে মরে কত বাসনা।

তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মনো-আশা দলে যাই,
পাছে সে মোরে দেখে থমকি বলে "এ কে!"
দু হাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী—
পাছে সে মনে ভানে, "এও কি প্রেম জানে!
আমি তো এর পানে চাহি নি!"

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে!

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

অপেক্ষা

সকল বেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্তছবি
কিছুতে যেতে চায় না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণী-পানে
বিদায় নাহি চায়।

মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে
মিলায়ে থাকে মাঠে,
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে,
কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে
দাঁড়ায়ে থাকে দীর্ঘ ছায়া
মেলিয়া ঘাটে বাটে।

এখনো ঘুঘু ডাকিছে ডালে
করুণ একতানে।
অলস দুখে দীর্ঘ দিন
ছিল সে বসে মিলনহীন,
এখনো তার বিরহগাথা
বিরাম নাহি মানে।

বধূরা দেখো আইল ঘাটে,
এল না ছায়া তবু।
কলস-ঘায়ে ঊর্মি টুটে,
রশ্মিরাশি চূর্ণি উঠে,
শ্রান্ত বায়ু প্রান্তনীর
চুম্বি যায় কভু।

দিবসশেষে বাহিরে এসে
সেও কি এতখনে
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে
নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,
প্রাচীরে-ঘেরা ছায়াতে-ঢাকা
বিজন ফুলবনে ?

স্নিগ্ধ জল মুগ্ধভাবে
ধরেছে তনুখানি।
মধুর দুটি বাহুর ঘায়
অগাধ জল টুটিয়া যায়,
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠি
করিছে কানাকানি।

কপোলে তার কিরণ প'ড়ে
তুলেছে রাঙা করি।
মুখের ছায়া পড়িয়া জলে
নিজেরে যেন খুঁজিছে ছলে,
জলের 'পরে ছড়ায়ে পড়ে
আঁচল খসি পড়ি।

জলের 'পরে এলায়ে দিয়ে
আপন রূপখানি
শরমহীন আরামসুখে
হাসিটি ভাসে মধুর মুখে,
বনের ছায়া ধরার চোখে
দিয়েছে পাতা টানি

সলিলতলে সোপান-'পরে
　　উদাস বেশবাস।
আধেক কায়া আধেক ছায়া
জলের 'পরে রচিছে মায়া,
দেহেরে যেন দেহের ছায়া
　　করিছে পরিহাস।

আম্রবন মুকুলে ভরা
　　গন্ধ দেয় তীরে।
গোপন শাখে বিরহী পাখি,
আপন-মনে উঠিছে ডাকি,
বিবশ হয়ে বকুল ফুল
　　খসিয়া পড়ে নীরে।

দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে
　　মিলায়ে আসে আলো।
নিবিড় ঘন বনের রেখা
আকাশশেষে যেতেছে দেখা,
নিদ্রালস আঁখির 'পরে
　　ভুরুর মতো কালো।

বুঝি বা তীরে উঠিয়াছে সে
　　জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চলেছে গেহে,
সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে—
যৌবনলাবণ্য যেন
　　লইতে চাহে কেড়ে।

মাজিয়া তনু যতন ক'রে
পরিবে নব বাস।
কাঁচল পরি আঁচল টানি
আঁটিয়া লয়ে কাঁকনখানি
নিপুণ করে রচিয়া বেণী
বাঁধিবে কেশপাশ।

উরসে পরি যূথীর হার
বসনে মাথা ঢাকি
বনের পথে নদীর তীরে
অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে
রেখার মতো রাখি।

বাজিবে তার চরণধ্বনি
বুকের শিরে শিরে।
কখন, কাছে না আসিতে সে
পরশ যেন লাগিবে এসে,
যেমন করে দখিন বায়ু
জাগায় ধরণীরে।

যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে
আর কি হবে কথা?
ক্ষণেক শুধু অবশ কায়
থমকি রবে ছবির প্রায়,
মুখের পানে চাহিয়া শুধু
সুখের আকুলতা।

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে
আলোর ব্যবধান।
আঁধারতলে গুপ্ত হয়ে
বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে,
আসিবে মুদে লক্ষকোটি
জাগ্রত নয়ান।

অন্ধকারে নিকট করে
আলোতে করে দূর।
যেমন, দুটি ব্যথিত প্রাণে
দুঃখনিশি নিকটে টানে,
সুখের প্রাতে যাহারা রহে
আপনা-ভরপুর।

আঁধারে যেন দুজনে আর
দুজন নাহি থাকে।
হৃদয়মাঝে যতটা চাই
ততটা যেন পুরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়—
হৃদয় বাকি রাখে।

হৃদয় দেহ আঁধারে যেন
হয়েছে একাকার।
মরণ যেন অকালে আসি
দিয়েছে সব বাঁধন নাশি,
ত্বরিত যেন গিয়েছি দোঁহে
জগৎ-পরপার।

দু দিক হতে দুজনে যেন
বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুলগতি ব্যগ্রপ্রাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল
নিশীথপারাবারে।

থামিয়া গেল অধীর স্রোত
থামিল কলতান,
মৌন এক মিলনরাশি
তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি,
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে
দোঁহার অবসান।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

দুরন্ত আশা

মর্মে যবে মত্ত আশা
সর্পসম ফোঁষে
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
দাপিয়া বৃথা রোষে
তখনো ভালোমানুষ সেজে
বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে
খেলিতে হবে কষে!
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোষে ব'সে।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি—
গৃহের প্রতি টান।
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন।
বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন।

বিপদ-মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে—

অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান যাহা
সঙ্গী পরানের,
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ
সিন্ধুমাঝে লুটে।

নিমেষতরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন-উচ্ছ্বাসে—
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে
আম্রবনছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি
বাজাও ওকি সুর—
তবলা-বাঁয়া কোলেতে টেনে
বাদ্যে ভরপুর!
কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে
পোলিটিকাল তর্ক করে,
জানলা দিয়ে পশিছে ঘরে
বাতাস ঝুরুঝুর্।

পানের বাটা, ফুলের মালা,
তবলা-বাঁয়া দুটো,
দম্ভ-ভরা কাগজগুলো
করিয়া দাও দূর !

কিসের এত অহংকার !
দম্ভ নাহি সাজে —
বরং থাকো মৌন হয়ে
সসংকোচ লাজে।
অত্যাচারে মত্ত-পারা
কভু কি হও আত্মহারা ?
তপ্ত হয়ে রক্তধারা
ফুটে কি দেহমাঝে ?
অহর্নিশি হেলার হাসি
তীব্র অপমান
মর্মতল বিদ্ধ করি
বজ্রসম বাজে ?

দাস্যসুখে হাস্যমুখ,
বিনীত জোড়-কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
দোদুল কলেবর !
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি ঘর।
ঘরেতে ব'সে গর্ব কর
পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজদর্পভরে

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে
মিষ্ট হাসি টানি
বলিতে আমি পারিব না তো
ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি
বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,
প্রকাশহীন চিন্তারাশি
করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে—
ভব্যতার গণ্ডিমাঝে
শান্তি নাহি মানি।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

দেশের উন্নতি

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ,
রয়েছে রেশ কানে—
কী যেন করা উচিত ছিল,
কী করি কে তা জানে!
অন্ধকারে ওই রে শোন্
ভারতমাতা করেন 'গ্রোন',
এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ
গেলেন কোন্‌খানে!
দেশের দুখে সতত দহি
মনের ব্যথা সবারে কহি,
এস তো করি নামটা সহি
লম্বা পিটিশানে।
আয় রে ভাই, সবাই মাতি
যতটা পারি ফুলাই ছাতি,

নহিলে গেল আর্যজাতি
রসাতলের পানে।

উৎসাহেতে জ্বলিয়া উঠি
দু হাতে দাও তালি!
আমরা বড়ো এ যে না বলে
তাহারে দাও গালি!
কাগজ ভ'রে লেখো রে লেখো,
এমনি করে যুদ্ধ শেখো,
হাতের কাছে রেখো রে রেখে
কলম আর কালী!
চারটি করে অন্ন খেয়ো,
দুপুরবেলা আপিস যেয়ো,
তাহার পরে সভায় ধেয়ো
বাক্যানল জ্বালি—
কাঁদিয়া লয়ে দেশের দুখে
সন্ধেবেলা বাসায় ঢুকে
শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে
করিয়ো চতুরালি।

দূর হউক এ বিড়ম্বনা,
বিদ্রূপের ভান।
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনা-ভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয়তলে
শরম-তাপ সতত জ্বলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান।
আয়-না ভাই, বিরোধ ভুলি,
কেন রে মিছে লাথিয়ে তুলি

পথের যত মতের ধূলি
আকাশপরিমাণ ?
পরের মাঝে, ঘরের মাঝে
মহৎ হব সকল কাজে,
নীরবে যেন মরে গো লাজে
মিথ্যা অভিমান।

ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে
বসায়ে আপনারে
আপন পায়ে না দিই যেন
অর্ঘ্য ভারে ভারে।
জগতে যত মহৎ আছে
হইব নত সবার কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে
তাঁদের দ্বারে দ্বারে।
যখন কাজ ভুলিয়া যাই
মর্মে যেন লজ্জা পাই,
নিজেরে নাহি ভুলাতে চাই
বাক্যের আঁধারে।
ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়
এ কথা মনে জাগিয়া রয়,
বৃহৎ ব'লে না মনে হয়
বৃহৎ কল্পনারে।

পরের কাছে হইব বড়ো
এ কথা গিয়ে ভুলে
বৃহৎ যেন হইতে পারি
নিজের প্রাণমূলে।
অনেক দূরে লক্ষ্য রাখি
চুপ করে না বসিয়া থাকি

স্বপ্নাতুর দুইটি আঁখি
শূন্যপানে তুলে।
ঘরের কাজ রয়েছে পড়ি,
তাহাই যেন সমাধা করি,
'কী করি' বলে ভেবে না মরি
সংশয়েতে দুলে।
করিব কাজ নীরবে থেকে,
মরণ যবে লইবে ডেকে
জীবনরাশি যাইব রেখে
ভবের উপকূলে।

সবাই বড়ো হইলে তবে
স্বদেশ বড়ো হবে,
যে কাজে মোরা লাগাব হাত
সিদ্ধ হবে তবে।
সত্যপথে আপন বলে
তুলিয়া শির সকলে চলে,
মরণভয় চরণতলে
দলিত হয়ে রবে।
নহিলে শুধু কথাই সার,
বিফল আশা লক্ষ বার,
দলাদলি ও অহংকার
উচ্চ কলরবে।
আমোদ করা কাজের ভানে—
পেখম তুলি গগন-পানে
সবাই মাতে আপন মানে
আপন গৌরবে।

বাহবা কবি! বলিছ ভালো,
শুনিতে লাগে বেশ—

এমনি ভাবে বলিলে হবে
উন্নতি বিশেষ।
'ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা'
ছুটাও ভাষা অগ্নিকণা,
আমরা করি সমালোচনা
জাগায়ে তুলি দেশ!
বীর্যবল বাঙ্গালার
কেমনে বলো টিঁকিবে আর,
প্রেমের গানে করেছে তার
দুর্দশার শেষ।
যাক-না দেখা দিন-কতক
যেখানে যত রয়েছে লোক
সকলে মিলে লিখুক শ্লোক
'জাতীয়' উপদেশ।
নয়ন বাহি অনর্গল
ফেলিব সবে অশ্রুজল,
উৎসাহেতে বীরের দল
লোমাঞ্চিতকেশ।

রক্ষা করো! উৎসাহের
যোগ্য আমি কই!
সভা-কাঁপানো করতালিতে
কাতর হয়ে রই।
দশ জনাতে যুক্তি ক'রে
দেশের যারা মুক্তি করে,
কাঁপায় ধরা বসিয়া ঘরে,
তাদের আমি নই।
'জাতীয়' শোকে সবাই জুটে
মরিছে যবে মাথাটা কুটে,

দশ দিকেতে উঠিছে ফুটে
বক্তৃতার খই—
হয়তো আমি শয্যা পেতে
মুগ্ধহিয়া আলস্যেতে
ছন্দ গেঁথে নেশায় মেতে
প্রেমের কথা কই।
শুনিয়া যত বীরশাবক
দেশের যাঁরা অভিভাবক
দেশের কানে হস্ত হানে,
ফুকারে হই-হই!

চাহি না আমি অনুগ্রহ-
বচন এত শত।
‘ওজস্বিতা’ ‘উদ্দীপনা’
থাকুক আপাতত।
স্পষ্ট তবে খুলিয়া বলি—
তুমিও চলো আমিও চলি,
পরস্পরে কেন এ ছলি
নির্বোধের মতো?

ঘরেতে ফিরে খেলো গে তাস,
লুটায়ে ভুঁয়ে মিটায়ে আশ
মরিয়া থাকো বারোটি মাস
আপন আঙিনায়।
পরের দোষে নাসিকা গুঁজে
গল্প খুঁজে গুজব খুঁজে
আরামে আঁখি আসিবে বুজে
মলিনপশুপ্রায়।
তরল হাসি-লহরী তুলি
রচিয়ো বসি বিবিধ বুলি,

সকল কিছু যাইয়ো ভুলি
ভুলো না আপনায়!

আমিও রব তোমারি দলে
পড়িয়া এক-ধার!
মাদুর পেতে ঘরের ছাতে
ডাবা হুঁকোটি ধরিয়া হাতে
করিব আমি সবার সাথে
দেশের উপকার।
বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির,
অসংশয়ে করিব স্থির
মোদের বড়ো এ পৃথিবীর
কেহই নহে আর!
নয়ন যদি মুদিয়া থাকো
সে ভুল কভু ভাঙিবে নাকো,
নিজেরে বড়ো করিয়া রাখো
মনেতে আপনার!
বাঙালি বড়ো চতুর, তাই
আপনি বড়ো হইয়া যাই,
অথচ কোনো কষ্ট নাই
চেষ্টা নাই তার।
হোথায় দেখো খাটিয়া মরে,
দেশে বিদেশে ছড়ায়ে পড়ে,
জীবন দেয় ধরার তরে
ম্লেচ্ছ সংসার!
ফুকারো তবে উচ্চরবে
বাঁধিয়া এক-সার—
মহৎ মোরা বঙ্গবাসী
আর্যপরিবার!

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

বঙ্গবীর

ভুলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে
নামতা পড়েন উচ্চস্বরেতে—
হিস্ট্রি কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান দিয়ে
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন,
মেজের উপরে জ্বলে কেরাসিন,
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন-
দাদা এমে, আমি বিএ।

যত পড়ি তত পুড়ে যায় তেল,
মগজে গজিয়ে উঠে আক্কেল,
কেমন করিয়া বীর ক্রমোয়েল
পাড়িল রাজার মাথা
বালক যেমন ঠেঙার বাড়িতে
পাকা আমগুলো রহে গো পাড়িতে—
কৌতুক ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে
উলটি ব'য়ের পাতা।

কেহ মাথা ফেলে ধর্মের তরে,
পরহিতে কারো মাথা খ'সে পড়ে,
রণভূমে কেহ মাথা রেখে মরে
কেতাবে রয়েছে লেখা।
আমি কেদারায় মাথাটি রাখিয়া
এই কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া
সুখে পাঠ করি থাকিয়া থাকিয়া,
পড়ে কত হয় শেখা!

পড়িয়াছি বসে জানালার কাছে
জ্ঞান খুঁজে কারা ধরা ভ্রমিয়াছে,
কবে মরে তারা মুখস্থ আছে
কোন্ মাসে কী তারিখে।
কর্তব্যের কঠিন শাসন
সাধ ক'রে কারা করে উপাসন,
গ্রহণ করেছে কণ্টকাসন,
খাতায় রেখেছি লিখে।

বড়ো কথা শুনি, বড়ো কথা কই,
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই,
এমনি করিয়া ক্রমে বড়ো হই—
কে পারে রাখিতে চেপে!
কেদারায় বসে সারাদিন ধ'রে
বই প'ড়ে প'ড়ে মুখস্থ ক'রে
কভু মাথা ধরে কভু মাথা ঘোরে,
বুঝি বা যাইব ক্ষেপে।

ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম!
আমরা যে ছোটো সেটা ভারি ভ্রম;
আকারপ্রকার রকম-সকম
এতেই যা কিছু ভেদ।
যাহা লেখে তারা তাই ফেলি শিখে,
তাহাই আবার বাংলায় লিখে
করি কতমতো গুরুমারা টীকে,
লেখনীর ঘুচে খেদ।

মোক্ষমুলর বলেছে 'আর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।

মনু না কি ছিল আধ্যাত্মিক,
আমরাও তাই— করিয়াছি ঠিক,
এ যে নাহি বলে ধিক্ তারে ধিক্,
শাপ দি' পইতে ছুঁয়ে।

কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর,
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর,
পূর্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর
সাক্ষী বেদব্যাস।
আর-কিছু তবে নাহি প্রয়োজন,
সভাতলে মিলে বারো-তেরো জন
শুধু তরজন আর গরজন
এই করো অভ্যাস।

আলো-চাল আর কাঁচকলা-ভাতে
মেখেচুখে নিয়ে কদলীর পাতে
ব্রহ্মচর্য পেত হাতে হাতে
ঋষিগণ তপ ক'রে।
আমরা যদিও পাতিয়াছি মেজ,
হোটেলে ঢুকেছি পালিয়ে কালেজ,
তবু আছে সেই ব্রাহ্মণ তেজ
মনু-তর্জমা প'ড়ে।

সংহিতা আর মুর্গি -জবাই
এই দুটো কাজে লেগেছি সবাই,
বিশেষত এই আমরা ক' ভাই
নিমাই নেপাল ভুতো।
দেশের লোকের কানের গোড়াতে
বিদ্যেটা নিয়ে লাটিম ঘোরাতে,
বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে
শিখেছি হাজার ছুতো।

ম্যারাথন আর থর্মপলিতে
কী যে হয়েছিল বলিতে বলিতে
শিরায় শোণিত রহে গো জ্বলিতে
পাটের পলিতে-সম।
মূর্খ যাহারা কিছু পড়ে নাই
তারা এত কথা কী বুঝিবে ছাই—
হাঁ করিয়া থাকে, কভু তোলে হাই—
বুক ফেটে যায় মম।

আগাগোড়া যদি তাহারা পড়িত
গারিবাল্‌ডির জীবনচরিত
না জানি তা হলে কী তারা করিত
কেদারায় দিয়ে ঠেস!
মিল ক'রে ক'রে কবিতা লিখিত,
দু-চারটে কথা বলিতে শিখিত,
কিছুদিন তবু কাগজ টিঁকিত
উন্নত হত দেশ।

না জানিল তারা সাহিত্যরস,
ইতিহাস নাহি করিল পরশ,
ওয়াশিংটনের জন্ম-বরষ
মুখস্থ হল নাকো।
ম্যাট্‌সিনি-লীলা এমন সরেস
এরা সে কথার না জানিল লেশ—
হা অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ,
লজ্জায় মুখ ঢাকো।

আমি দেখো ঘরে চৌকি টানিয়ে
লাইব্রেরি হতে হিস্ট্রি আনিয়ে
কত পড়ি, লিখি বানিয়ে বানিয়ে
শানিয়ে শানিয়ে ভাষা।

জলে ওঠে প্রাণ, মরি পাখা করে,
উদ্দীপনায় শুধু মাথা ঘোরে—
তবুও যা হোক স্বদেশের তরে
একটুকু হয় আশা।

যাক, পড়া যাক 'ন্যাস্‌বি' সমর—
আহা, ক্রমোয়েল, তুমিই অমর।
থাক্ এইখেনে, ব্যথিছে কোমর—
কাহিল হতেছে বোধ।
ঝি কোথায় গেল, নিয়ে আয় সাবু।
আরে, আরে এস! এস ননিবাবু,
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক গ্রাবু—
কালকের দেব শোধ!

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

সুরদাসের প্রার্থনা

ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন,
আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে,
পুরাতে হইবে আশ।
অতি অসহন বহ্নিদহন
মর্ম্মমাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্করাহু প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্রাস।
পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি,
তুমি দেবী, তুমি সতী—
কুৎসিত দীন অধম পামর
পঙ্কিল আমি অতি।

তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি—
পাপের তিমির পুড়ে যায় জ্বলে
কোথা সে পুণ্যজ্যোতি।
দেবের করুণা মানবী-আকারে,
আনন্দধারা বিশ্বমাঝারে,
পতিতপাবনী গঙ্গা যেমন
এলেন পাপীর কাজে—
তোমার চরিত রবে নির্মল,
তোমার ধর্ম রবে উজ্জ্বল,
আমার এ পাপ করি দাও লীন
তোমার পুণ্যমাঝে।

তোমারে কহিব লজ্জাকাহিনী
লজ্জা নাহিকো তায়।
তোমার আভায় মলিন লজ্জা
পলকে মিলায়ে যায়।
যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি আমা-পানে চাও,
খুলে দাও মুখ আনন্দময়ী—
আবরণে নাহি কাজ।
নিরখি তোমারে ভীষণ মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতি দূর—
উজ্জ্বল যেন দেবরোষানল,
উদ্যত যেন বাজ।

জান কি আমি এ পাপ-আঁখ মেলি
তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপানে ধেয়ে!

তুমি কি তখন পেরেছ জানিতে ?
বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে
নিশ্বাসরেখাছায়া ?
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা
আকাশ উষার কায়া !
লজ্জা সহসা আসি অকারণে
বসনের মতো রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায়
লুব্ধ নয়ন হতে ?
মোহচঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরন ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন-গুন কেঁদে
তোমার দৃষ্টিপথে ?

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মিসম—
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন
এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই,
ফুটেছে মর্মতলে—
নির্বাণহীন অঙ্গারসম
নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও
জ্বালাময় দুটো চোখ,
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার
সে আঁখি তোমারি হোক।

অপার ভুবন, উদার গগন,
শ্যামল কাননতল,

বসন্ত অতি মুগ্ধমুরতি,
স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরন সন্ধ্যানীরদ,
গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র
প্রসারিত দূরদিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল
অতি দূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয়
কনককিরণ-জ্বালা,
চকিততড়িৎ সঘন বরষা,
পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীমবিকাশ
জ্যোৎস্না শুভ্রতনু—
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও,
মাগিতেছি অকপটে,
তিমিরতূলিকা দাও বুলাইয়া
আকাশ-চিত্রপটে।

ইহারা আমারে ভুলায় সতত,
কোথা নিয়ে যায় টেনে!
মাধুরীমদিরা পান করে শেষে
প্রাণ পথ নাহি চেনে।
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায়
আমার বাঁশরি কাড়ি,
পাগলের মতো রচি নব গান,
নব নব তান ছাড়ি।
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া
আপনি অবশ মন—

ডুবাইতে থাকে কুসুমগন্ধ
বসন্তসমীরণ।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে,
ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ
সর্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে
ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবন-ভরা বাহুপাশে তার
বেষ্টন করে কায়া।
চারি দিকে ঘিরি করে আনাগোনা
কল্পমুরতি কত,
কুসুমকাননে বেড়াই ফিরিয়া
যেন বিভোরের মতো।
শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী,
বীণা খসে যায় পড়ি,
নাহি বাজে আর হরিনামগান
বরষ বরষ ধরি।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা
পিয়াসে জগতে ফিরে—
বাড়ে তৃষা, কোথা পিপাসার জল
অকূল লবণনীরে।
গিয়েছিল, দেবী, সেই ঘোর তৃষা
তোমার রূপের ধারে—
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা
লোপ করো একেবারে।

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি
পশেছে জীবনমূলে,

এই ছুরি দিয়ে সে মুরতিখানি
কেটে কেটে লও তুলে।
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে
নিখিলের শোভা যত—
লক্ষ্মী যাবেন, তারি সাথে যাবে
জগৎ ছায়ার মতো।

যাক, তাই যাক, পারি নে ভাসিতে
কেবলি মুরতিস্রোতে।
লহ মোরে তুলি আলোকমগন
মুরতিভুবন হতে।
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে—
একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন
মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে
আমার বিজন বাস,
প্রলয়-আসন জুড়িয়া বসিয়া
রব আমি বারো মাস।

থামো একটুকু, বুঝিতে পারি নে,
ভালো করে ভেবে দেখি—
বিশ্ববিলোপ বিমল আঁধার
চিরকাল রবে সে কি?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে
ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি,
স্নিগ্ধ আনত আঁখি?

এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে
দেবীর প্রতিমা-সম,
স্থিরগম্ভীর করুণ নয়নে
চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যাকিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড়তিমির কেশে,
শান্তিরূপিণী এ মুরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্তনিশি-মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যাশোভা তোমারে ঘিরিয়া
চিরকাল জেগে রবে।
এই বাতায়ন, ওই চাঁপা গাছ,
দূর সরযূর রেখা
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে
চিরদিন যাবে দেখা।
সে নব জগতে কালস্রোত নাই,
পরিবর্তন নাহি—
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন রবে চাহি।

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ,
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি—
হৃদয়-আকাশে থাক্-না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি

বাসনামলিন আঁখিকলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয়-নীল-উৎপল
চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা,
হেরিব আমার হরি--
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।

২২।২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন

হউক ধন্য তোমার যশ,
লেখনী ধন্য হোক,
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে
জাগাক সপ্তলোক।
যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি
আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই—
কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ,
বিদ্রূপ কেন ভাই ?
আমার এ লেখা কারো ভালো লাগে
তাহা কি আমার দোষ ?
কেহ কবি বলে (কেহ বা বলে না)-
কেন তাহে তব রোষ ?

কত প্রাণপণ, দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী,
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি ?

রাঙা ফুল হয়ে উঠিছে ফুটিয়া
হৃদয়শোণিতপাত,
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মতো
পোহাইয়ে দুখরাত।
উঠিতেছে কত কণ্টকলতা,
ফুলে পল্লবে ঢাকে—
গভীর গোপন বেদনা-মাঝারে
শিকড় আঁকড়ি থাকে।
জীবনে যে সাধ হয়েছে বিফল
সে সাধ ফুটিছে গানে—
মরীচিকা রচি মিছে সে তৃপ্তি,
তৃষ্ণা কাঁদিছে প্রাণে।
এনেছি তুলিয়া পথের প্রান্তে
মর্মকুসুম মম—
আসিছে পান্থ, যেতেছে লইয়া
স্মরণচিহ্নসম।
কোনো ফুল যাবে দু দিনে ঝরিয়া,
কোনো ফুল বেঁচে রবে—
কোনো ছোটো ফুল আজিকার কথা
কালিকার কানে কবে।

তুমি কেন, ভাই, বিমুখ এমন—
নয়নে কঠোর হাসি।
দূর হতে যেন ফুঁষিছ সবেগে
উপেক্ষা রাশি রাশি—
কঠিন বচন ঝরিছে অধরে
উপহাস হলাহলে,
লেখনীর মুখে করিতে দগ্ধ
ঘৃণার অনল জ্বলে।

ভালোবেসে যাহা ফুটেছে পরানে,
সবার লাগিবে ভালো,
যে জ্যোতি হরিছে আমার আঁধার
সবারে দিবে সে আলো—
অন্তরমাঝে সবাই সমান,
বাহিরে প্রভেদ ভবে,
একের বেদনা করুণাপ্রবাহে
সান্ত্বনা দিবে সবে।
এই মনে করে ভালোবেসে আমি
দিয়েছিনু উপহার—
ভালো নাহি লাগে ফেলে যাবে চলে,
কিসের ভাবনা তার!

তোমার দেবার যদি কিছু থাকে
তুমিও দাও-না এনে।
প্রেম দিলে সবে নিকটে আসিবে
তোমারে আপন জেনে।
কিন্তু জানিয়ো আলোক কখনো
থাকে না তো ছায়া বিনা,
ঘৃণার টানেও কেহ বা আসিবে,
তুমি করিয়ো না ঘৃণা!
এতই কোমল মানবের মন
এমনি পরের বশ,
নিষ্ঠুর বাণে সে প্রাণ ব্যথিতে
কিছুই নাহিক যশ।
তীক্ষ্ণ হাসিতে বাহিরে শোণিত,
বচনে অশ্রু উঠে,
নয়নকোণের চাহনি-ছুরিতে
মর্মতন্তু টুটে।

সান্ত্বনা দেওয়া নহে তো সহজ,
দিতে হয় সারা প্রাণ,
মানবমনের অনল নিভাতে
আপনারে বলিদান।
ঘৃণা জ্ব'লে মরে আপনার বিষে,
রহে না সে চিরদিন—
অমর হইতে চাহ যদি, জেনো
প্রেম সে মরণহীন।
তুমিও রবে না, আমিও রব না,
দু দিনের দেখা ভবে—
প্রাণ খুলে প্রেম দিতে পারো যদি
তাহা চিরদিন রবে।

দুর্বল মোরা, কত ভুল করি,
অপূর্ণ সব কাজ।
নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা
আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে যা পারি তাও করিব না?
নিষ্ফল হব ভবে?
প্রেমফুল ফোটে, ছোটো হল বলে
দিব না কি তাহা সবে?
হয়তো এ ফুল সুন্দর নয়,
ধরেছি সবার আগে—
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে
ভুলে কারো ভালো লাগে।
যদি ভুল হয় ক' দিনের ভুল!
দু দিনে ভাঙিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন
সেই কি অমর হবে?

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

কবির প্রতি নিবেদন

হেথা কেন দাঁড়ায়েছ, কবি,
যেন কাষ্ঠপুত্তলছবি ?
চারি দিকে লোকজন চলিতেছে সারাখন,
আকাশে উঠিছে খর রবি।

কোথা তব বিজন ভবন,
কোথা তব মানসভুবন ?
তোমারে ঘেরিয়া ফেলি কোথা সেই করে কেলি
কল্পনা, মুক্ত পবন ?

নিখিলের আনন্দধাম
কোথা সেই গভীর বিরাম ?
জগতের গীতধার কেমনে শুনিবে আর ?
শুনিতেছ আপনারি নাম।

আকাশের পাখি তুমি ছিলে,
ধরণীতে কেন ধরা দিলে ?
বলে সবে বাহা-বাহা, সকলে পড়ায় যাহা
তুমি তাই পড়িতে শিখিলে !

প্রভাতের আলোকের সনে
অনাবৃত প্রভাতগগনে
বহিয়া নূতন প্রাণ ঝরিয়া পড়ে না গান
ঊর্ধ্বনয়ন এ ভুবনে।

পথ হতে শত কলরবে
'গাও গাও' বলিতেছে সবে।
ভাবিতে সময় নাই— গান চাই, গান চাই,
থামিতে চাহিছে প্রাণ যবে।

থামিলে চলিয়া যাবে সবে,
দেখিতে কেমনতর হবে!
উচ্চ আসনে লীন প্রাণহীন গানহীন
পুতলির মতো বসে রবে।

শ্রান্তি লুকাতে চাও ত্রাসে,
কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে আসে।
শুনে যারা যায় চলে দু-চারিটা কথা ব'লে
তারা কি তোমায় ভালোবাসে?

কত মতো পরিয়া মুখোষ
মাগিছ সবার পরিতোষ।
মিছে হাসি আনো দাঁতে, মিছে জল আঁখিপাতে,
তবু তারা ধরে কত দোষ।

মন্দ কহিছে কেহ ব'সে,
কেহ বা নিন্দা তব ঘোষে।
তাই নিয়ে অবিরত তর্ক করিছ কত,
জ্বলিয়া মরিছ মিছে রোষে।

মূর্খ, দম্ভ-ভরা দেহ,
তোমারে করিয়া যায় স্নেহ।
হাত বুলাইয়া পিঠে কথা বলে মিঠে মিঠে,
শাবাশ-শাবাশ বলে কেহ।

হায় কবি, এত দেশ ঘুরে
আসিয়া পড়েছ কোন্ দূরে!
এ যে কোলাহলমরু— নাই ছায়া, নাই তরু,
যশের কিরণে মরো পুড়ে।

দেখো, হোথা নদী-পর্বত,
অবারিত অসীমের পথ।
প্রকৃতি শান্তমুখে ছুটায় গগন-বুকে
গ্রহতারাময় তার রথ।

সবাই আপন কাজে ধায়,
পাশে কেহ ফিরিয়া না চায়।
ফুটে চিররূপরাশি, চিরমধুময় হাসি,
আপনারে দেখিতে না পায়।

হোথা দেখো একেলা আপনি
আকাশের তারা গনি গনি
ঘোর নিশীথের মাঝে কে জাগে আপন কাজে,
সেথায় পশে না কলধ্বনি।

দেখো হোথা নূতন জগৎ—
ওই কারা আত্মহারাবৎ
যশ-অপযশ-বাণী কোনো কিছু নাহি মানি
রচিছে সুদূর ভবিষ্যৎ।

ওই দেখো না পূরিতে আশ
মরণ করিল কারে গ্রাস।
নিশি না হইতে সারা খসিয়া পড়িল তারা,
রাখিয়া গেল না ইতিহাস।

ওই কারা গিরির মতন
আপনাতে আপনি বিজন—
হৃদয়ের স্রোত উঠি গোপন আলয় টুটি
দূর দূর করিছে মগন।

ওই কারা বসে আছে দূরে
কল্পনা-উদয়াচল-পুরে—
অরুণপ্রকাশ-প্রায় আকাশ ভরিয়া যায়
প্রতিদিন নব নব সুরে।

হোথা উঠে নবীন তপন,
হোথা হতে বহিছে পবন।
হোথা চির ভালোবাসা— নব গান, নব আশা—
অসীম বিরামনিকেতন।
হোথা মানবের জয় উঠিছে জগৎময়,
ওইখানে মিলিয়াছে নরনারায়ণ।

হেথা, কবি, তোমারে কি সাজে
ধূলি আর কলরোল -মাঝে ?

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

(পরিত্যক্ত)

বন্ধু,
মনে আছে সেই প্রথম বয়স,
নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে
বহিয়া নূতন আশা।
নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি
অধিক জাগিয়া উঠে,
বঙ্গহৃদয় উন্মীলি যেন
রক্তকমল ফুটে।

প্রতিদিন যেন পূর্বগগনে
চাহি রহিতাম একা,
কখন ফুটিবে তোমাদের ওই
লেখনী-অরুণ-লেখা।
তোমাদের ওই প্রভাত-আলোক
প্রাচীন তিমির নাশি
নবজাগ্রত নয়নে আনিবে
নূতন জগৎরাশি।

একদা জাগিনু, সহসা দেখিনু
প্রাণমন আপনার—
হৃদয়ের মাঝে জীবন জাগিছে
পরশ লভিনু তার।
ধন্য হইল মানবজনম,
ধন্য তরুণ প্রাণ—
মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়,
জাগিল হর্ষগান।
দাঁড়ায়ে বিশাল ধরণীর তলে
ঘুচে গেল ভয় লাজ,
বুঝিতে পারিনু এ জগৎমাঝে
আমারো রয়েছে কাজ।
স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম জোড়করে,
"এই লহ, মাত, এ চিরজীবন
সঁপিনু তোমারি তরে।"

বন্ধু, এ দীন হয়েছে বাহির
তোমাদেরি কথা শুনে।
সেইদিন হতে কণ্টকপথে
চলিয়াছি দিন গুনে।

পদে পদে জাগে নিন্দা ও ঘৃণা
ক্ষুদ্র অত্যাচার,
একে একে সবে পর হয়ে যায়
ছিল যারা আপনার।
ধ্রুবতারা-পানে রাখিয়া নয়ন
চলিয়াছি পথ ধরি,
সত্য বলিয়া জানিয়াছি যাহা
তাহাই পালন করি।

কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,
কোথা গেল সেই আশা!
আজিকে বন্ধু, তোমাদের মুখে
এ কেমনতর ভাষা!
আজি বলিতেছ, "বসে থাকো, বাপু,
ছিল যাহা তাই ভালো।
যা হবার তাহা আপনি হইবে,
কাজ কী এতই আলো!"
কলম মুছিয়া তুলিয়া রেখেছ,
বন্ধ করেছ গান,
সহসা সবাই প্রাচীন হয়েছ
নিতান্ত সাবধান।
আনন্দে যারা চলিতে চাহিছে
ছিঁড়ি অসত্যপাশ,
ঘর হতে বসি করিছ তাদের
উপহাস পরিহাস।
এত দূরে এনে ফিরিয়া দাঁড়ায়ে
হাসিছ নিঠুর হাসি,
চিরজীবনের প্রিয়তম ব্রত
চাহিছ ফেলিতে নাশি।

তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশায়ে যাহারে
আপনি তুলেছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি!
তবে সেই ভালো, কাজ নেই তবে,
তবে ফিরে যাওয়া যাক—
গৃহকোণে এই জীবন-আবেগ
করি বসে পরিপাক!
সানাই বাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসি
আট বরষের বধূ,
শৈশবকুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির
করি যৌবনমধু!
ফুটন্ত নবজীবনের 'পরে
চাপায়ে শাস্ত্রভার
জীর্ণ যুগের ধূলিসাথে তারে
করে দিই একাকার!

বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতে পারি?
শিখরগুহায় আর ফিরে যায়
নদীর প্রবল বারি?
জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন,
চলেছি যখন কাজে.
কেমনে আবার করিব প্রবেশ
মৃত বরষের মাঝে?

সে নবীন আশা নাইকো যদিও
তবু যাব এই পথে,
পাব না শুনিতে আশিস্‌-বচন
তোমাদের মুখ হতে।
তোমাদের ওই হৃদয় হইতে
নূতন পরান আনি
প্রতি পলে পলে আসিবে না আর
সেই আশ্বাসবাণী।
শত হৃদয়ের উৎসাহ মিলি
টানিয়া লবে না মোরে,
আপনার বলে চলিতে হইবে
আপনার পথ ক'রে।
আকাশে চাহিব, হায়, কোথা সেই
পুরাতন শুকতারা!
তোমাদের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল,
নয়ন আলোকহারা।
মাঝে মাঝে শুধু শুনিতে পাইব
হা-হা-হা অট্টহাসি,
শ্রান্ত হৃদয়ে আঘাত করিবে
নিঠুর বচন আসি।
ভয় নাই যার কী করিবে তার
এই প্রতিকূল স্রোতে!
তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা
তোমারি বাক্য হতে।

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

ভৈরবী গান

ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি
বিষাদশান্ত শোভাতে!
ওই ভৈরবী আর গেয়ো নাকো এই
প্রভাতে—
মোর গৃহছাড়া এই পথিক-পরান
তরুণ হৃদয় লোভাতে।

ওই মন-উদাসীন ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল পরশে সকল জীবন
বিকলি।
দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেমবাহু-ঘেরা
অশ্রুকোমল শিকলি।
হায়, মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত
মিছে মনে হয় সকলি।

যারে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তারে
ফিরে দেখে আসি শেষ বার।
ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভার।
যারা গৃহছায়ে বসি সজলনয়ন
মুখ মনে পড়ে সে সবার।

এই সংকটময় কর্ম্মজীবন
মনে হয় মরু সাহারা,
দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য
পাহারা।

তবে ফিরে যাওয়া ভালো তাহাদের পাশে
পথ চেয়ে আছে যাহারা।

সেই ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান
তরুমর্ম্মর পবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুলকুঞ্জ-
ভবনে,
সেই কুহুকুহরিত বিরহরোদন
থেকে থেকে পশে শ্রবণে।

সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে,
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-
বালকে।
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্নপাখির পালকে।

হায়, অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা
গোপনমর্ম্মদাহিনী,
এই আপনা মাঝারে শুষ্ক জীবন-
বাহিনী!
ওই ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া
রচিব নিরাশাকাহিনী।

সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে,—
"হল না, কিছুই হবে না।
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
রবে না।

কেহ জীবনের যত গুরুভার ব্রত
ধূলি হ'তে তুলি লবে না।

"এই সংশয়মাঝে কোন্ পথে যাই,
কার তরে মরি খাটিয়া?
আমি কার মিছে দুখে মরিতেছি বুক
ফাটিয়া?
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,
কে রেখেছে মত আঁটিয়া?

"যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে!
কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে!
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে!

"শেষে দেখিব, পড়িল সুখযৌবন
ফুলের মতন খসিয়া,
হায় বসন্তবায়ু মিছে চলে গেল
শ্বসিয়া,
সেই যেখানে জগৎ ছিল এক কালে
সেইখানে আছে বসিয়া!

"শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া
চিরজীবনের তিয়াষে।
এই দগ্ধ হৃদয় এত দিন আছে
কী আশে!

সেই ডাগর নয়ন, সরস অধর
গেল চলি কোথা দিয়া সে !”

ওগো, থামো, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তারে আর ফিরে চেয়ো না।
ওই অশ্রুসজল ভৈরবী আর
গেয়ো না।
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়নবাষ্পে ছেয়ো না।

ওই কুহকরাগিণী এখনি কেন গো
পথিকের প্রাণ বিবশে !
পথে এখনো উঠিবে প্রখর তপন
দিবসে।
পথে রাক্ষসী সেই তিমিররজনী
না জানি কোথায় নিবসে !

থামো, শুধু এক বার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া—
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসারপথ
তরিয়া,
যত মানবের গুরু মহৎজনের
চরণচিহ্ন ধরিয়া।

যাও তাহাদের কাছে ঘরে যারা আছে
পাষাণে পরান বাঁধিয়া,
গাও তাদের জীবনে তাদের বেদনে
কাঁদিয়া।

তারা পʼড়ে ভূমিতলে ভাসে আঁখিজলে
নিজ সাধে বাদ সাধিয়া।

হায়, উঠিতে চাহিছে পরান, তবুও
পারে না তাহারা উঠিতে।
তারা পারে না ললিতলতার বাঁধন
টুটিতে।
তারা পথ জানিয়াছে, দিবানিশি তবু
পথপাশে রহে লুটিতে!

তারা অলস বেদন করিবে যাপন
অলস রাগিণী গাহিয়া,
রবে দূর আলো-পানে আবিষ্ট প্রাণে
চাহিয়া।
ওই মধুর রোদনে ভেসে যাবে তারা
দিবসরজনী বাহিয়া।

সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া
আপনারে তারা ভুলাবে,
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর
বুলাবে।
সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
ঘুমের দোলায় দোলাবে।

ওগো, এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে।

ধর্মপ্রচার

কলিকাতার এক বাসায়

ওই শোনো ভাই বিশু,
পথে শুনি 'জয় যিশু' !
কেমনে এ নাম করিব সহ্য
আমরা আর্যশিশু !

কূর্ম, কল্কি, স্কন্দ
এখন করো তো বন্ধ।
যদি যিশু ভজে রবে না ভারতে
পুরাণের নামগন্ধ।

ওই দেখো ভাই, শুনি --
যাজ্ঞবল্ক্য মুনি,
বিষ্ণু, হারীত, নারদ, অত্রি
কেঁদে হল খুনোখুনি !

কোথায় রহিল কর্ম,
কোথা সনাতন ধর্ম !
সম্প্রতি তবু কিছু শোনা যায়
বেদ-পুরাণের মর্ম !

ওঠো, ওঠো ভাই, জাগো,
মনে মনে খুব রাগো !
আর্যশাস্ত্র উদ্ধার করি,
কোমর বাঁধিয়া লাগো !

কাছাকোঁচা লও আঁটি,
হাতে তুলে লও লাঠি।
হিন্দুধর্ম করিব রক্ষা,
খৃস্টানি হবে মাটি।

কোথা গেল ভাই ভজা
হিন্দুধর্মধ্বজা ?
ষণ্ডা ছিল সে, সে যদি থাকিত
আজ হত দু-শো মজা !

এস মোনো, এস ভুতো,
প'রে লও বুট জুতো।
পাদ্রি বেটার পা মাড়িয়ে দিয়ো
পাও যদি কোনো ছুতো !

আগে দেব দুয়ো তালি,
তার পরে দেব গালি।
কিছু না বলিলে পড়িব তখন
বিশ-পঁচিশ বাঙালি।

তুমি আগে যেয়ো তেড়ে,
আমি নেব টুপি কেড়ে।
গোলেমালে শেষে পাঁচজনে প'ড়ে
মাটিতে ফেলিয়ো পেড়ে।

কাঁচি দিয়ে তার চুল
কেটে দেব বিলকুল।
কোটের বোতাম আগাগোড়া তার
করে দেব নির্মূল।

তবে উঠ, সবে উঠ—
বাঁধো কটি, আঁটো মুঠো!
দেখো, ভাই, যেন ভুলো না, অমনি
সাথে নিয়ো লাঠি দুটো!

দলপতির শিষ ও গান :

প্রাণসই রে,
মনোজ্বালা কারে কই রে!

কোমরে চাদর বাঁধিয়া, লাঠি হস্তে, মহোৎসাহে সকলের প্রস্থান। পথে বিশু হারু মোনো ভুতোর সমাগম। গেরুয়াবস্ত্রাচ্ছাদিত অনাবৃতপদ মুক্তিফৌজের প্রচারক :

ধন্য হউক তোমার প্রেম,
ধন্য তোমার নাম,
ভুবনমাঝারে হউক উদয়
নূতন জেরুজিলাম।
ধরণী হইতে যাক ঘৃণাদ্বেষ,
নিঠুরতা দূর হোক—
মুছে দাও, প্রভু, মানবের আঁখি,
ঘুচাও মরণশোক।
তৃষিত যাহারা, জীবনের বারি
করো তাহাদের দান।
দয়াময় যিশু, তোমার দয়ায়
পাপীজনে করো ত্রাণ।

'ওরে ভাই বিশু, এ কে,
জুতো কোথা এল রেখে!
গোরা বটে, তবু হতেছে ভরসা
গেরুয়া বসন দেখে।'

'হারু, তবে তুই এগো!
বল্— বাছা, তুমি কে গো?
কিচিমিচি রাখো, খিদে পেয়েছে কি?
দুটো কলা এনে দে গো!'

বধির নিদয় কঠিনহৃদয়
তারে প্রভু দাও কোল।
অক্ষম আমি কী করিতে পারি—
'হরিবোল হরিবোল!'

'আরে, রেখে দাও খৃস্ট!
এখনি দেখাও পৃষ্ঠ!
দাঁড়ে উঠে চড়ো, পড়ো বাবা পড়ো
হরে হরে হরে কৃষ্ট!'

তুমি যা সয়েছ তাহাই স্মরিয়া
সহিব সকল ক্লেশ,
ক্রুস গুরুভার করিব বহন—
'বেশ, বাবা, বেশ বেশ!'

দাও ব্যথা, যদি কারো মুছে পাপ
আমার নয়ননীরে।
প্রাণ দিব, যদি এ জীবন দিলে
পাপীর জীবন ফিরে।
আপনার জন- আপনার দেশ-
হয়েছি সর্ব- ত্যাগী।
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি।

সুখ, সভ্যতা, রমণীর প্রেম,
বন্ধুর কোলাকুলি—
ফেলি দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি।
এখনো তাদের ভুলিতে পারি নে,
মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে—
চিরজীবনের সুখবন্ধন
সেই গৃহমাঝে টানে।
তখন তোমার রক্তসিক্ত
ওই মুখপানে চাহি,
ও প্রেমের কাছে স্বদেশ বিদেশ
আপনা ও পর নাহি।
ওই প্রেম তুমি করো বিতরণ
আমার হৃদয় দিয়ে,
বিষ দিতে যারা এসেছে তাহারা
ঘরে যাক সুধা নিয়ে।
পাপ লয়ে প্রাণে এসেছিল যারা
তাহারা আসুক বুকে—
পড়ুক প্রেমের মধুর আলোক
ভ্রূকুটিকুটিল মুখে!

'আর প্রাণে নাহি সহে,
আর্যরক্ত দহে!'
'ওহে হারু, ওহে মাধু, লাঠি নিয়ে
ঘা-কতক দাও তো হে!'

'যদি চাস তুই ইষ্ট
বল্ মুখে বল্ কৃষ্ট।'

ধন্য হউক তোমার নাম
দয়াময় যিশুখৃস্ট!

'তবেরে ! লাগাও লাঠি
কোমরে কাপড় আঁটি ।'
'হিন্দুধর্ম হউক রক্ষা
খৃস্টানি হোক মাটি !'

প্রচারকের মাথায় লাঠি-প্রহার। মাথা ফাটিয়া রক্তপাত। রক্ত মুছিয়া :

প্রভু তোমাদের করুন কুশল,
দিন তিনি শুভমতি ।
আমি তাঁর দীন অধম ভৃত্য,
তিনি জগতের পতি ।

'ওরে শিবু, ওরে হারু,
ওরে ননি, ওরে চারু,
তামাশা দেখার এই কি সময়—
প্রাণে ভয় নেই কারু ?'

'পুলিস আসিছে গুঁতা উঁচাইয়া,
এইবেলা দাও দৌড় !'
'ধন্য হইল আর্য ধর্ম,
ধন্য হইল গৌড় ।'

উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন। বাসায় ফিরিয়া :

সাহেব মেরেছি ! বঙ্গবাসীর
কলঙ্ক গেছে ঘুচি ।
মেজবউ কোথা, ডেকে দাও তারে—
কোথা ছোকা, কোথা লুচি !
এখনো আমার তপ্ত রক্ত
উঠিতেছে উচ্ছ্বসি—
তাড়াতাড়ি আজ লুচি না পাইলে
কী জানি কী ক'রে বসি !

স্বামী ঘরে এল যুদ্ধ সারিয়া
ঘরে নেই লুচি ভাজা!
আর্যনারীর এ কেমন প্রথা,
সমুচিত দিব সাজা।
যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি হারীত
জলে গুলে খেলে সবে—
মার্‌ধোর করে হিন্দুধর্ম
রক্ষা করিতে হবে।
কোথা পুরাতন পাতিব্রত্য,
সনাতন লুচি ছোকা—
বৎসরে শুধু সংসারে আসে
একখানি করে খোকা।

৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮

এই কবিতায় বর্ণিত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়

নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ

বাসরশয়নে

বর। জীবনে জীবন প্রথম মিলন,
সে সুখের কোথা তুলা নাই।
এস, সব ভুলে আজি আঁখি তুলে
শুধু দুঁহু দোঁহা মুখ চাই।
মরমে মরমে শরমে ভরমে
জোড়া লাগিয়াছে এক ঠাঁই।
যেন এক মোহে ভুলে আছি দোঁহে,
যেন এক ফুলে মধু খাই।
জনম অবধি বিরহে দগধি
এ পরান হয়ে ছিল ছাই—

তোমার অপার প্রেমপারাবার,
জুড়াইতে আমি এনু তাই।
বলো একবার, "আমিও তোমার,
তোমা ছাড়া কারে নাহি চাই।"
ওঠ কেন, ওকি, কোথা যাও সখী?

সরোদনে

কনে। আইমার কাছে শুতে যাই!

দু-দিন পরে

বর। কেন সখী, কোণে কাঁদিছ বসিয়া
চোখে কেন জল পড়ে?
উষা কি তাহার শুকতারা-হারা,
তাই কি শিশির ঝরে?
বসন্ত কি নাই, বনলক্ষ্মী তাই
কাঁদিছে আকুল স্বরে?
উদাসিনী স্মৃতি কাঁদিছে কি বসি
আশার সমাধি-'পরে?
খ'সে-পড়া তারা করিছে কি শোক
নীল আকাশের তরে?
কী লাগি কাঁদিছ?
কনে। পুষি মেনিটিরে
ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

অন্দরের বাগানে

বর। কী করিছ বনে শ্যামল শয়নে
আলো করে বসে তরুমূল?
কোমল কপোলে যেন নানা ছলে
উড়ে এসে পড়ে এলোচুল।
পদতল দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বহে যায় নদী কুলুকুল্।

সারা দিনমান শুনি সেই গান
তাই বুঝি আঁখি ঢুলুঢুল্।
আঁচল ভরিয়া মরমে মরিয়া
পড়ে আছে বুঝি ঝুরো ফুল?
বুঝি মুখ কার মনে পড়ে, আর
মালা গাঁথিবারে হয় ভুল?
কার কথা বলি বায়ু পড়ে ঢলি,
কানে দুলাইয়া যায় দুল?
গুন্ গুন্ ছলে কার নাম বলে
চঞ্চল যত অলিকুল?
কানন নিরালা, আঁখি হাসি-ঢালা,
মন সুখস্মৃতি-সমাকুল—
কী করিছ বনে কুঞ্জভবনে?

কনে। খেতেছি বসিয়া টোপাকুল।

বর। আসিয়াছি কাছে মনে যাহা আছে
বলিবারে চাহি সমুদয়।
আপনার ভার বহিবারে আর
পারে না ব্যাকুল এ হৃদয়।
আজি মোর মন কী জানি কেমন,
বসন্ত আজি মধুময়,
আজি প্রাণ খুলে মালতীমুকুলে
বায়ু করে যায় অনুনয়।
যেন আঁখি দুটি মোর পানে ফুটি
আশা-ভরা দুটি কথা কয়,
ও হৃদয় টুটে যেন প্রেম উঠে
নিয়ে আধো-লাজ আধো-ভয়।
তোমার লাগিয়া পরান জাগিয়া
দিবসরজনী সারা হয়,
কোন্ কাজে তব দিবে তার সব
তারি লাগি যেন চেয়ে রয়।

জগৎ ছানিয়া কী দিব আনিয়া
জীবন যৌবন করি ক্ষয় ?
তোমা তরে, সখী, বলো করিব কী ?
কনে। আরো কুল পাড়ো গোটা ছয়।
বর। তবে যাই সখী, নিরাশাকাতর
শূন্য জীবন নিয়ে।
আমি চলে গেলে এক ফোঁটা জল
পড়িবে কি আঁখি দিয়ে ?
বসন্তবায়ু মায়ানিশ্বাসে
বিরহ জ্বালাবে হিয়ে ?
ঘুমন্তপ্রায় আকাঙ্ক্ষা যত
পরানে উঠিবে জিয়ে ?
বিষাদিনী বসি বিজন বিপিনে
কী করিবে তুমি প্রিয়ে ?
বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে ?
কনে। দেব পুতুলের বিয়ে।

গাজিপুর
২৩ আষাঢ় ১৮৮৮

প্রকাশবেদনা

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহি রে—
হৃদয়বেদনা হৃদয়েই থাকে,
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।

শুধু কথার উপরে কথা,
নিষ্ফল ব্যাকুলতা।
বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে যায়,
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।

মর্মবেদন আপন আবেগে
স্বর হয়ে কেন ফোটে না ?
দীর্ণ হৃদয় আপনি কেন রে
বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে না ?

আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে
ক্রন্দনহারা দুখে—
শিরায় শিরায় হাহাকার কেন
ধ্বনিয়া উঠে না বুকে ?

অরণ্য যথা চিরনিশিদিন
শুধু মর্মর স্বনিছে,
অনন্ত কালের বিজন বিরহ
সিন্ধুমাঝারে ধ্বনিছে—

যদি ব্যাকুল ব্যথিত প্রাণ
তেমনি গাহিত গান
চিরজীবনের বাসনা তাহার
হইত মূর্তিমান !

তীরের মতন পিপাসিত বেগে
ক্রন্দনধ্বনি ছুটিয়া
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিত,
মর্মে রহিত ফুটিয়া।

আজ মিছে এ কথার মালা,
মিছে এ অশ্রু ঢালা !
কিছু নেই পোড়া ধরণীমাঝারে
বোঝাতে মর্মজ্বালা !

সোলাপুর
৬ বৈশাখ ১৮৮৯

মায়া

বৃথা এ বিড়ম্বনা !
কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ,
কেন এত যন্ত্রণা !

ছায়ার মতন ভেসে চলে যায়
দরশন পরশন—
এই যদি পাই এই ভুলে যাই,
তৃপ্তি না মানে মন।
কত বার আসে, কত বার ভাসে,
মিশে যায় কত বার—
পেলেও যেমন না পেলে তেমন
শুধু থাকে হাহাকার।
সন্ধ্যাপবনে কুঞ্জভবনে
নির্জন নদীতীরে
ছায়ার মতন হৃদয়বেদন
ছায়ার লাগিয়া ফিরে।

কত দেখাশোনা কত আনাগোনা
চারি দিকে অবিরত,
শুধু তারি মাঝে একটি কে আছে
তারি তরে ব্যথা কত !
চিরদিন ধ'রে এমনি চলিছে,
যুগ-যুগ গেছে চ'লে !
মানবের মেলা করে গেছে খেলা
এই ধরণীর কোলে।
এই ছায়া লাগি কত নিশি জাগি
কাঁদায়েছে কাঁদিয়াছে—

মহাসুখ মানি প্রিয়তনুখানি
বাহুপাশে বাঁধিয়াছে !
নিশিদিন কত ভেবেছে সতত
নিয়ে কার হাসিকথা !
কোথা তারা আজ, সুখ দুখ লাজ,
কোথা তাহাদের ব্যথা ?
কোথা সেদিনের অতুলরূপসী
হৃদয়প্রেয়সীচয় ?
নিখিলের প্রাণে ছিল যে জাগিয়া,
আজ সে স্বপনও নয় !
ছিল সে নয়নে অধরের কোণে
জীবন মরণ কত—
বিকচ সরস তনুর পরশ
কোমল প্রেমের মতো।
এত সুখ দুখ তীব্র কামনা
জাগরণ হাহুতাশ
যে রূপজ্যোতিরে সদা ছিল ঘিরে
কোথা তার ইতিহাস ?
যমুনার ঢেউ সন্ধ্যারঙিন
মেঘখানি ভালোবাসে
এও চলে যায়, সেও চলে যায়,
অদৃষ্ট বসে হাসে।

রোজ্‌ব্যাঙ্ক্‌। খিরকি
১ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৯

বর্ষার দিনে

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায় !

এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারি ধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে।
সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার?
শ্রাবণবরিষনে একদা গৃহকোণে
দু কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার?

আছে তো তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস।

আসিবে কত লোক কত-না দুখশোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ।
জগৎ চলে যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

রোজ্‌ব্যাঙ্ক্‌। খিরকি
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৯

মেঘের খেলা

স্বপ্ন যদি হ'ত জাগরণ,
সত্য যদি হ'ত কল্পনা,
তবে এ ভালোবাসা হ'ত না হত-আশা
কেবল কবিতার জল্পনা।

মেঘের খেলা-সম হ'ত সব
মধুর মায়াময় ছায়াময়।
কেবল আনাগোনা, নীরবে জানাশোনা,
জগতে কিছু আর কিছু নয়।

কেবল মেলামেশা গগনে,
সুনীল সাগরের পরপারে
সুদূরে ছায়াগিরি তাহারে ঘিরি ঘিরি
শ্যামল ধরণীর ধারে ধারে।

কখনো ধীরে ধীরে ভেসে যায়,
কখনো মিশে যায় ভাঙিয়া—

কখনো ঘননীল বিজুলি-ঝিলিমিল,
কখনো উষারাগে রাঙিয়া।

যেমন প্রাণপণ বাসনা
তেমনি বাধা তার সুকঠিন
সকলি লঘু হয়ে কোথায় যেত বয়ে,
ছায়ার মতো হত কায়াহীন।

চাঁদের আলো হত সুখহাস,
অশ্রু শরতের বরষণ।
সাক্ষী করি বিধু মিলন হত মৃদু
কেবল প্রাণে প্রাণে পরশন।

শান্তি পেত এই চিরতৃষা
চিত্ত চঞ্চল সকাতর,
প্রেমের থরে থরে বিরাম জাগিত রে—
দুখের ছায়া মাঝে রবিকর।

রোজ্‌ব্যাঙ্ক্‌। খিরকি
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৯

ধ্যান

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ
হরণ করি।

তোমার পাই নে কূল—

আপনা-মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাই নে তুল।
উদয়শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত
একটি নয়ন-সম—
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি,
নাহিকো তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন ওই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দপূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার—
যত দূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

জোড়াসাঁকো
২৬ শ্রাবণ ১৮৮৯

পূর্বকালে

প্রাণমন দিয়ে ভালোবাসিয়াছে
এত দিন এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক,
তবু তুমি ভবে চিরগৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার!
তোমা ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারি নে ভালো কি বাসিতে পারে!

1887 Aug. 10
জোড়াসাঁকো

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
~~[illegible]~~ বরণ করি।
তুমি আছ মোর ~~জীবনে মরণে~~ জীবন মরণ
~~[illegible]~~ হরণ করি॥ —
তোমার পাইনে কূল,
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল।
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ নিহত
একটি নয়ন সম,
অগাধ, অপার, উদাস দৃষ্টি
নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন,
চঞ্চল অনিবার, —

সুপ্রশান্ত, নাহি উচ্ছ্বসিত অসীম ক্রন্দন তান,
[illegible] পান।

"মানসী"র পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

গিয়েছে এসেছে কেঁদেছে হেসেছে
ভালো তো বেসেছে তারা,
আমি তত দিন কোথা ছিনু দলছাড়া ?
ছিনু বুঝি বসে কোন্ এক পাশে
পথপাদপের ছায়,
সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হতে
তোমারি প্রতীক্ষায় —
চেয়ে দেখি কত পথিক চলিয়া যায়

অনাদি বিরহবেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ।
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই তো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে।

জোড়াসাঁকো
২ ভাদ্র ১৮৮৯

অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,
কত রূপ ধরে পরেছ গলায়,
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতিপুরাতন বিরহমিলনকথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমিররজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে,
মিলনমধুর লাজে—
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ,
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি।

জোড়াসাঁকো
২ ভাদ্র ১৮৮৯

আশঙ্কা

কে জানে এ কি ভালো ?
আকাশ-ভরা কিরণধারা
আছিল মোর তপন-তারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি-আলো—
কে জানে এ কি ভালো ?

কত-না শোভা, কত-না সুখ,
কত-না ছিল অমিয়-মুখ,
নিত্য-নব পুষ্পরাশি
ফুটিত মোর দ্বারে –
ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র স্নেহ.
মনের ছিল শতেক গেহ,
আকাশ ছিল, ধরণী ছিল
আমার চারি ধারে –
কোথায় তারা, সকলে আজি
তোমাতেই লুকালো।
কে জানে এ কি ভালো ?

কম্পিত এ হৃদয়খানি
তোমার কাছে তাই।
দিবসনিশি জাগিয়া আছি,
নয়নে ঘুম নাই।
সকল গান, সকল প্রাণ
তোমারে আমি করেছি দান—
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি ঠাঁই।

সকল পেয়ে তবুও যদি
তৃপ্তি নাহি মেলে,
তবুও যদি চলিয়া যাও
আমারে পাছে ফেলে,
নিমেষে সব শূন্য হবে
তোমারি এই আসন ভবে,
চিহ্নসম কেবল রবে
মৃত্যুরেখা কালো।
কে জানে এ কি ভালো?

জোড়াসাঁকো
১৪ ভাদ্র ১৮৮৯

ভালো করে বলে যাও

ওগো, ভালো করে বলে যাও।
বাঁশরি বাজায়ে যে কথা জানাতে
সে-কথা বুঝায়ে দাও।
যদি না বলিবে কিছু, তবে কেন এসে
মুখপানে শুধু চাও!

আজি অন্ধতামসী নিশি।
মেঘের আড়ালে গগনের তারা
সবগুলি গেছে মিশি।
শুধু বাদলের বায় করি হায়-হায়
আকুলিছে দশ দিশি।

আমি কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চলমাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথনিবিড় চুলে।

দুটি বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে।

সেথা নিভৃতনিলয়সুখে
আপনার মনে বলে যেয়ো কথা
মিলনমুদিত বুকে,
আমি নয়ন মুদিয়া শুনিব কেবল
চাহিব না মুখে মুখে।

যবে ফুরাবে তোমার কথা
যে যেমন আছি রহিব বসিয়া
চিত্রপুতলি যথা।
শুধু শিয়রে দাঁড়ায়ে করে কানাকানি
মর্মর তরুলতা।

শেষে রজনীর অবসানে
অরুণ উদিলে, ক্ষণেকের তরে
চাব দুঁহু দোঁহা-পানে।
ধীরে ঘরে যাব ফিরে দোঁহে দুই পথে
জলভরা দু'নয়ানে।

তবে ভালো করে বলে যাও।
আঁখিতে বাঁশিতে যে কথা ভাষিতে
সে কথা বুঝায়ে দাও।
শুধু কম্পিত স্বরে আধো ভাষা পূরে
কেন এসে গান গাও!

শান্তিনিকেতন
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০

মেঘদূত

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘনসংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত করে।

সেদিন সে উজ্জয়িনীপ্রাসাদশিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দামপবনবেগ, গুরুগুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘসংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি।

সেদিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি প্রিয়গৃহপানে? বন্ধনবিহীন
নবমেঘপক্ষ-'পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্প-ভরা— দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতলশয়নে
মুক্তকেশে, ম্লান বেশে, সজল নয়নে?
তাদের সবার গান তোমার সংগীতে

পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে দেশান্তরে, খুঁজি' বিরহিণী প্রিয়া ?
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি লয়ে দিশ-দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা।
পাষাণশৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি মেঘদল
স্বাধীন-গগনচারী, কাতরে নিশ্বাসি
সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন-পানে ; ধায় তারা ছুটি
উধাও কামনা-সম ; শিখরেতে উঠি
সকলে মিলিয়া শেষে হয় একাকার,
সমস্ত গগনতল করে অধিকার।
সেদিনের পরে গেছে কত শত বার
প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নববরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে করি বরিষন
নববৃষ্টিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,
স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষাতরঙ্গিণীসম।

কত কাল ধরে
কত সঙ্গীহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততারাশশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন !
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম

সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হতে।

ভারতের পূর্বশেষে
আমি বসে আজি ; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর্,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।
অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত ; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট ; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি ; বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথতরুশাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে
বনস্পতি ; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি হতেছে বিকল ;

ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী
জনপদবধূজন, গগনে নেহারি
ঘনঘটা, ঊর্ধ্বনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে;
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হয়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি বসন ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি,
বলে, "মা গো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি!"
কোথায় অবন্তিপুরী; নির্বিন্ধ্যা তটিনী;
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া— সেথা নিশিদ্বিপ্রহরে
প্রণয়চাঞ্চল্য ভুলি ভবনশিখরে
সুপ্ত পারাবত, শুধু বিরহবিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথমাঝে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র; কোথা কন্‌খল,
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল,
গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গী করি অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।

এইমতো মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি। সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে, তুমি ছাড়া, করি অবারিত

লক্ষ্মীর বিলাসপুরী— অমর ভুবনে!
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীলশৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা
পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্তসৌন্দর্যমাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায়— হেরি চারি ধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জননিশা; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল-উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।

শান্তিনিকেতন। ৭।৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০
অপরাহ্নে। ঘনবর্ষায়

অহল্যার প্রতি

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,
নির্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপসবিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বীর সাথে হয়ে এক-দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখদুঃখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্মা-মাঝে? দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরানীর মিলন, কলহ,
আনন্দবিষাদক্ষুব্ধ ক্রন্দন গর্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ—
পশিত কি অভিশাপ-নিদ্রা ভেদ করে
কর্ণে তোর? জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধজাগরণে?
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্যনিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর?
যে দিন বহিত নব বসন্তসমীর,
ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে? জীবন-উৎসাহ
ছুটিত সহস্র পথে মরুদিগ্বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে
তোমার পাষাণ ঘেরি করিতে নিপাত
অনুর্বর-অভিশাপ তব, সে আঘাত
জাগাত কি জীবনের কম্প তব দেহে?
যামিনী আসিত যবে মানবের গেহে

ধরণী লইত টানি শ্রান্ত তনুগুলি
আপনার বক্ষ-'পরে ; দুঃখশ্রম ভুলি
ঘুমাত অসংখ্য জীব— জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক—
মাতৃ-অঙ্গে সেই কোটি জীবস্পর্শসুখ
কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে ?
যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা, তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যম্পশ্য নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে, সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে ;
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায় ;
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।

সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপরেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা ; দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর, সরল, শুভ্র ; হয়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে।
যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়

ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ সরস ঘন, এখনো তাহারা
লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার।
তুমি চেয়ে নির্নিমেষ ; হৃদয় তোমার
কোন্ দূর কালক্ষেত্রে চলে গেছে একা
আপনার ধূলিলিপ্ত পদচিহ্নরেখা
পদে পদে চিনে চিনে। দেখিতে দেখিতে
চারি দিক হতে সব এল চারি ভিতে
জগতের পূর্ব পরিচয় ; কৌতূহলে
সমস্ত সংসার ওই এল দলে দলে
সম্মুখে তোমার ; থেমে গেল কাছে এসে
চমকিয়া। বিস্ময়ে রহিল অনিমেষে।

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে। বিস্মৃতিসাগরনীলনীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।
তুমি বিশ্ব-পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয় ;
দোঁহে মুখোমুখি। অপাররহস্যতীরে
চিরপরিচয়-মাঝে নব পরিচয়।

শান্তিনিকেতন
১১।১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০

গোধূলি

অন্ধকার তরুশাখা দিয়ে
সন্ধ্যার বাতাস বহে যায়।
আয়, নিদ্রা, আয় ঘনাইয়ে
শ্রান্ত এই আঁখির পাতায়।
কিছু আর নাহি যায় দেখা,
কেহ নাই, আমি শুধু একা—
মিশে যাক জীবনের রেখা
বিস্মৃতির পশ্চিমসীমায়।
নিষ্ফল দিবস অবসান—
কোথা আশা, কোথা গীতগান!
শুয়ে আছে সঙ্গীহীন প্রাণ
জীবনের তটবালুকায়।
দূরে শুধু ধ্বনিছে সতত
অবিশ্রাম মর্মরের মতো,
হৃদয়ের হত আশা যত
অন্ধকারে কাঁদিয়া বেড়ায়।

আয় শান্তি, আয় রে নির্বাণ,
আয় নিদ্রা, শ্রান্ত প্রাণে আয়!
মূর্ছাহত হৃদয়ের 'পরে
চিরাগত প্রেয়সীর প্রায়
আয়, নিদ্রা আয়!

সোলাপুর
১ ভাদ্র ১৮৯০

উচ্ছৃঙ্খল

এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ
কেন গো অমন করে ?
তুমি চিনিতে নারিবে, বুঝিতে নারিবে মোরে।
আমি কেঁদেছি হেসেছি, ভালো যে বেসেছি
এসেছি যেতেছি সরে
কী জানি কিসের ঘোরে।

কোথা হতে এত বেদনা বহিয়া
এসেছে পরান মম
বিধাতার এক অর্থবিহীন
প্রলাপবচন সম।
প্রতিদিন যারা আছে সুখে দুখে
আমি তাহাদের নই—
আমি এসেছি নিমেষে, যাইব নিমেষ বই।
আমি আমারে চিনি নে, তোমারে জানি নে,
আমার আলয় কই !

জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ,
অনিয়ম শুধু আমি।
বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে,
কত কাজ করে কত কলরবে,
চিরকাল ধরে দিবস চলিছে
দিবসের অনুগামী—
শুধু আমি নিজবেগ সামালিতে নারি
ছুটেছি দিবসযামী।

প্রতিদিন বহে মৃদু সমীরণ,
প্রতিদিন ফুটে ফুল।

ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে
সৃজনের এক ভুল—
দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
ফুকারিয়া উভরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়।

এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব,
নিতে কে পারিবে মোরে!
কে আমারে পারে আঁকড়ি রাখিতে
দুখানি বাহুর ডোরে!

আমি কেবল কাতর গীত!
কেহ বা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে,
কেহ জাগে চমকিত।
কত-যে বেদনা সে কেহ বোঝে না,
কত-যে আকুল আশা,
কত-যে তীব্র পিপাসাকাতর ভাষা।

ওগো, তোমরা জগৎবাসী,
তোমাদের আছে বরষ বরষ
দরশ-পরশ-রাশি—
আমার কেবল একটি নিমেষ,
তারি তরে ধেয়ে আসি।

মহাসুন্দর একটি নিমেষ
ফুটেছে কাননশেষে,
আমি তারি পানে ধাই, ছিঁড়ে নিতে চাই,
ব্যাকুলবাসনাসংগীত গাই
অসীমকালের আঁধার হইতে
বাহির হইয়া এসে।

শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মধুর কথা,
তারি তরে বহি চিরদিবসের
চিরমনোব্যাকুলতা।
কালের কাননে নিমেষ লুটিয়া
কে জানে চলেছি কোথা!
ওগো, মিটে না তাহাতে মিটে না প্রাণের ব্যথা।

অধিক সময় নাই।
ঝড়ের জীবন ছুটে চলে যায়
শুধু কেঁদে "চাই চাই"—
যার কাছে আসি তার কাছে শুধু
হাহাকার রেখে যাই।

ওগো, তবে থাক্, যে যায় সে যাক—
তোমরা দিয়ো না ধরা।
আমি চলে যাব ত্বরা।
মোরে কেহ কোরো ভয়, কেহ কোরো ঘৃণা,
ক্ষমা কোরো যদি পারো!
বিস্মিত চোখে ক্ষণেক চাহিয়া
তার পরে পথ ছাড়ো!

তার পরদিনে উঠিবে প্রভাত,
ফুটিবে কুসুম কত,
নিয়মে চলিবে নিখিল জগৎ
প্রতিদিবসের মতো।
কোথাকার এই শৃঙ্খল-ছেঁড়া
সৃষ্টি-ছাড়া এ ব্যথা

কাঁদিয়া কাঁদিয়া, গাহিয়া গাহিয়া,
অজানা আঁধার-সাগর বাহিয়া,
মিশায়ে যাইবে কোথা!
এক রজনীর প্রহরের মাঝে
ফুরাবে সকল কথা।

সোলাপুর
৫ ভাদ্র ১৮৯০

আগন্তুক

ওগো সুখী প্রাণ, তোমাদের এই
ভব-উৎসব-ঘরে
অচেনা অজানা পাগল অতিথি
এসেছিল ক্ষণতরে।
ক্ষণেকের তরে বিস্ময়ভরে
চেয়েছিল চারি দিকে
বেদনা-বাসনা-ব্যাকুলতা-ভরা
তৃষাতুর অনিমিখে।
উৎসববেশ ছিল না তাহার,
কণ্ঠে ছিল না মালা,
কেশপাশ দিয়ে বাহিরিতেছিল
দীপ্ত অনলজ্বালা।
তোমাদের হাসি তোমাদের গান
থেমে গেল তারে দেখে,
শুধালে না কেহ পরিচয় তার,
বসালে না কেহ ডেকে।
কী বলিতে গিয়ে বলিল না আর,
দাঁড়ায়ে রহিল দ্বারে—
দীপালোক হতে বাহিরিয়া গেল
বাহির-অন্ধকারে।

তার পরে কেহ জান কি তোমরা
কী হইল তার শেষে ?
কোন্ দেশ হতে এসে চলে গেল
কোন্ গৃহহীন দেশে !

সোলাপুর
৫ ভাদ্র ১৮৯০

বিদায়

অকূল সাগর-মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবনতরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি আনি কোন্ দূর
পরিচিত তীর হতে কত সুমধুর
পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার-মাঝে অস্তাচল-কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম ; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ-মাঝে ! এমনি করিয়া
চিহ্নহীন পথহীন অকূল ধরিয়া
দূর হতে দূরে ভেসে যাব— অবশেষে
দাঁড়াইব দিবসের সর্বপ্রান্তদেশে
এক মুহূর্তের তরে ; সারাদিন ভেসে
মেঘখণ্ড যথা, রজনীর তীরে এসে
দাঁড়ায় থমকি। ওগো, বারেক তখন
জীবনের খেলা রেখে করুণ নয়ন
পাঠায়ো পশ্চিম-পানে, দাঁড়ায়ো একাকী
ওই দূর তীরদেশে অনিমেষ আঁখি।

মুহূর্তে আঁধার নামি দিবে সব ঢাকি
বিদায়ের পথ ; তোমার অজ্ঞাত দেশে
আমি চলে যাব ; তুমি ফিরে যেয়ো হেসে
সংসারের খেলাঘরে, তোমার নবীন
দিবালোকে। অবশেষে যবে একদিন—
বহুদিন পরে— তোমার জগৎ-মাঝে
সন্ধ্যা দেখা দিবে, দীর্ঘ জীবনের কাজে
প্রমোদের কোলাহলে শ্রান্ত হবে প্রাণ,
মিলায়ে আসিবে ধীরে স্বপন-সমান
চিররৌদ্রদগ্ধ এই কঠিন সংসার,
সেইদিন এইখানে আসিয়ো আবার ;
এই তটপ্রান্তে বসে শ্রান্ত দু'নয়ানে
চেয়ে দেখো ওই অস্ত-অচলের পানে
সন্ধ্যার তিমিরে, যেথা সাগরের কোলে
আকাশ মিশায়ে গেছে। দেখিবে তা হলে
আমার সে বিদায়ের শেষ চেয়ে-দেখা
এইখানে রেখে গেছে জ্যোতির্ময় রেখা।
সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যাতারকার
বিষণ্ন আকার ধরি উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি-'পরে ; সারা রাত্রি ধরে
তোমার সে জনহীন বিশ্রাম-শিয়রে
একাকী জাগিয়া রবে। হয়তো স্বপনে
ধীরে ধীরে এনে দেবে তোমার স্মরণে
জীবনের প্রভাতের দু-একটি কথা।
এক ধারে সাগরের চিরচঞ্চলতা
তুলিবে অস্ফুট ধ্বনি, রহস্য অপার ;
অন্য ধারে ঘুমাইবে সমস্ত সংসার।

কোল্‌ভিল টেরেস। লণ্ডন
আশ্বিন ১৮৯০। রাত্রি

সন্ধ্যায়

ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মতো হও।
সুদূর পশ্চিমাচলে কনক-আকাশতলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও।
অমনি সুন্দর শান্ত অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওইমতো ধীরে ধীরে আমার জীবনতীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।
জগতের পরপারে নিয়ে যাও আপনারে
দিবসনিশার প্রান্তদেশে।
থাক্ হাস্য-উৎসব, না আসুক কলরব
সংসারের জনহীন শেষে।
এস তুমি চুপে চুপে শ্রান্তিরূপে নিদ্রারূপে,
এস তুমি নয়ন-আনত।
এস তুমি ম্লান হেসে দিবাদগ্ধ আয়ুশেষে
মরণের আশ্বাসের মতো।
আমি শুধু চেয়ে থাকি অশ্রুহীন শ্রান্ত-আঁখি,
পড়ে থাকি পৃথিবীর 'পরে—
খুলে দাও কেশভার, ঘনস্নিগ্ধ অন্ধকার
মোরে ঢেকে দিক স্তরে স্তরে।
রাখো এ কপালে মম নিদ্রার আবেশ-সম
হিমস্নিগ্ধ করতলখানি।
বাক্যহীন স্নেহভরে অবশ দেহের 'পরে
অঞ্চলের প্রান্ত দাও টানি।
তার পরে পলে পলে করুণার অশ্রুজলে
ভরে যাক নয়নপল্লব।
সেই স্তব্ধ আকুলতা গভীর বিদায়ব্যথা
কায়মনে করি অনুভব।

রেড সী
৭ কার্তিক ১৮৯০

শেষ উপহার

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে।
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল, ফুরালো আমার কাল ;
আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।
এখন বিশ্বের তুমি ; গুন্ গুন্ মধুকর
চারি দিকে তুলিয়াছে বিস্ময়ব্যাকুল স্বর ;
গাহে পাখি, বহে বায়ু ; প্রমোদহিল্লোলধারা
নবস্ফুট জীবনেরে করিতেছে দিশাহারা।
এত আলো, এত সুখ, এত গান, এত প্রাণ
ছিল না আমার কাছে, আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি, সযতন নীরবতা,
শুধু চেয়ে-থাকা আঁখি, শুধু মনে মনে কথা।

আর কি দিই নি কিছু ? প্রলুব্ধ প্রভাত যবে
চাহিল তোমার পানে, শত পাখি শত রবে
ডাকিল তোমার নাম, তখন পড়িল ঝ'রে
আমার নয়ন হতে তোমার নয়ন-'পরে
একটি শিশিরকণা : চলে গেনু পরপার।
সেই বিষাদের বিন্দু, বিদায়ের উপহার
প্রখর প্রমোদ হতে রাখিবে শীতল ক'রে
তোমার তরুণ মুখ ; রজনীর অশ্রু-'পরে
পড়ি প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অনুপম,
বিকচ সৌন্দর্য তব করিবে সুন্দরতম।

রেড সী
৯ কার্তিক ১৮৯০

মৌন ভাষা

থাক্ থাক্, কাজ নাই, বলিয়ো না কোনো কথা।
চেয়ে দেখি, চলে যাই,   মনে মনে গান গাই,
মনে মনে রচি বসে কত সুখ কত ব্যথা।
বিরহী পাখির প্রায়   অজানা কানন ছায়
উড়িয়া বেড়াক সদা হৃদয়ের কাতরতা—
তারে বাঁধিয়ো না ধরে, বলিয়ো না কোনো কথা।

আঁখি দিয়ে যাহা বল সহসা আসিয়া কাছে
সেই ভালো, থাক্ তাই,   তার বেশি কাজ নাই,
কথা দিয়ে বল যদি মোহ ভেঙে যায় পাছে।
এত মৃদু, এত আধো,   অশ্রুজলে বাধো-বাধো
শরমে সভয়ে ম্লান এমন কি ভাষা আছে ?
কথায় বোলো না তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে।

তুমি হয়তো বা পারো আপনারে বুঝাইতে—
মনের সকল ভাষা   প্রাণের সকল আশা
পারো তুমি গেঁথে গেঁথে রচিতে মধুর গীতে।
আমি তো জানি নে মোরে,   দেখি নাই ভালো করে
মনের সকল কথা পশিয়া আপন চিতে—
কী বুঝিতে কী বুঝেছি, কী বলিব কী বলিতে।

তবে থাক্। ওই শোনো, অন্ধকারে শোনা যায়
জলের কল্লোলস্বর   পল্লবের মরমর—
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনিয়া শিহরে কায়।
আরো ঊর্ধ্বে দেখো চেয়ে   অনন্ত আকাশ ছেয়ে
কোটি কোটি মৌন দৃষ্টি তারকায় তারকায়।
প্রাণপণ দীপ্ত ভাষা জ্বলিয়া ফুটিতে চায়।

এস চুপ করে শুনি এই বাণী স্তব্ধতার—
এই অরণ্যের তলে   কানাকানি জলে স্থলে,
মনে করি হল বলা ছিল যাহা বলিবার।
হয়তো তোমার ভাবে   তুমি এক বুঝে যাবে,
আমার মনের মতো আমি বুঝে যাব আর—
নিশীথের কণ্ঠ দিয়ে কথা হবে দুজনার।

মনে করি দুটি তারা জগতের এক ধারে
পাশাপাশি কাছাকাছি   তৃষাতুর চেয়ে আছি,
চিনিতেছি চিরযুগ, চিনি নাকো কেহ কারে।
দিবসের কোলাহলে   প্রতিদিন যাই চলে,
ফিরে আসি রজনীর ভাষাহীন অন্ধকারে—
বুঝিবার নহে যাহা চাই তাহা বুঝিবারে।

তোমার সাহস আছে, আমার সাহস নাই।
এই-যে শঙ্কিত আলো   অন্ধকারে জ্বলে ভালো,
কে বলিতে পারে বলো যাহা চাও এ কি তাই।
তবে ইহা থাক্ দূরে   কল্পনার স্বপ্নপুরে,
যার যাহা মনে লয় তাই মনে করে যাই—
এই চির-আবরণ খুলে ফেলে কাজ নাই।

এস তবে বসি হেথা, বলিয়ো না কোনো কথা।
নিশীথের অন্ধকারে   ঘিরে দিক দুজনারে,
আমাদের দুজনের জীবনের নীরবতা।
দুজনের কোলে বুকে   আঁধারে বাড়ুক সুখে
দুজনের এক শিশু জনমের মনোব্যথা।
তবে আর কাজ নাই, বলিয়ো না কোনো কথা।

রেড সী
১০ কার্তিক ১৮৯০

আমার সুখ

ভালোবাসা-ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে তুমি
যে সুখেই থাকো,
যে মাধুরী এ জীবনে আমি পাইয়াছি তাহা
তুমি পেলে নাকো।
এই-যে অলস বেলা, অলস মেঘের মেলা,
জলেতে আলোতে খেলা সারা দিনমান,
এরি মাঝে চারি পাশে কোথা হতে ভেসে আসে
ওই মুখ, ওই হাসি, ওই দু'নয়ান।
সদা শুনি কাছে দূরে মধুর কোমল সুরে
তুমি মোরে ডাকো—
তাই ভাবি, এ জীবনে আমি যাহা পাইয়াছি
তুমি পেলে নাকো।

কোনোদিন একদিন আপনার মনে শুধু
এক সন্ধ্যাবেলা
আমারে এমনি করে ভাবিতে পারিতে যদি
বসিয়া একেলা—
এমনি সুদূর বাঁশি শ্রবণে পশিত আসি,
বিষাদকোমল হাসি ভাসিত অধরে,
নয়নে জলের রেখা এক বিন্দু দিত দেখা,
তারি 'পরে সন্ধ্যালোক কাঁপিত কাতরে—
ভেসে যেত মনখানি কনকতরণীসম
গৃহহীন স্রোতে—
শুধু একদিন-তরে আমি ধন্য হইতাম
তুমি ধন্য হতে।

তুমি কি করেছ মনে দেখেছ, পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ করে
পড়া পুঁথি-সম ?
নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পারো ভরে।
আমাতেও স্থান পেত অবাধে সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখো এ পরানে ধরিয়াছে
কত ভালোবাসা।

সহসা কী শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে।
দেখিতে পাও নি যদি, দেখিতে পাবে না আর,
মিছে মরি বকে।
আমি যা পেয়েছি তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোনোখানে সীমা নাই ও মধু মুখের—
শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি,
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই,
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা কই।

রেড সী
১১ কার্তিক ১৮৯০

নাটক ও প্রহসন

বিসর্জন

উৎসর্গ

শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণাধিকেষু

তোরি হাতে বাঁধা খাতা, তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ককোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ করে
লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।

বর্ণনাটা করি শোন্— একা আমি, গৃহকোণ,
কাগজ-পত্তর ছড়াছড়ি।
দশ দিকে বইগুলি সঞ্চয় করিছে ধূলি,
আলস্যে যেতেছে গড়াগড়ি।
শয্যাহীন খাটখানা এক পাশে দেয় থানা,
প্রকাশিয়া কাঠের পাঁজর।
তারি 'পরে অবিচারে যাহা-তাহা ভারে ভারে
স্তূপাকারে সহে অনাদর।

চেয়ে দেখি জানালায় খালখানা শুষ্কপ্রায়,
মাঝে মাঝে বেধে আছে জল,
এক ধারে রাশ রাশ অর্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ,
তারি 'পরে বালকের দল।
ধরে মাছ, মারে ঢেলা— সারাদিন করে খেলা
উভচর মানবশাবক।

মেয়েরা মাজিছে গাত্র অথবা কাঁসার পাত্র
সোনার মতন ঝক্ ঝক্।

উত্তরে যেতেছে দেখা পড়েছে পথের রেখা
শুষ্ক সেই জলপথ-মাঝে
বহু কষ্টে ডাক ছাড়ি চলেছে গোরুর গাড়ি,
ঝিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে।
কেহ দ্রুত কেহ ধীরে কেহ যায় নতশিরে,
কেহ যায় বুক ফুলাইয়া,
কেহ জীর্ণ টাট্টু চড়ি চলিয়াছে তড়বড়ি
দুই ধারে দু-পা দুলাইয়া।

পরপারে গায়ে গায় অভ্রভেদী মহাকায়
স্তব্ধচ্ছায় বট-অশথেরা,
স্নিগ্ধ বন-অঙ্কে তারি সুপ্তপ্রায় সারি সারি
কুঁড়েগুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা—
বিহঙ্গে মানবে মিলি আছে হোথা নিরিবিলি,
ঘনশ্যাম পল্লবের ঘর—
সন্ধ্যাবেলা হোথা হতে ভেসে আসে বায়ুস্রোতে
গ্রামের বিচিত্র গীতস্বর।

পূর্বপ্রান্তে বনশিরে সূর্যোদয় ধীরে ধীরে,
চারি দিকে পাখির কূজন।
শঙ্খঘণ্টা ক্ষণপরে দূর মন্দিরের ঘরে
প্রচারিছে শিবের পূজন।
যে প্রত্যুষে মধুমাছি বাহিরায় মধু যাচি
কুসুমকুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
সেই ভোরবেলা আমি মানসকুহরে নামি
আয়োজন করি লিখিবারে।

লিখিতে লিখিতে মাঝে পাখি-গান কানে বাজে,
মনে আনে কাল পুরাতন—
ওই গান, ওই ছবি, তরুশিরে রাঙা রবি
ওরা প্রকৃতির নিত্যধন।
আদিকবি বাল্মীকিরে এই সমীরণ ধীরে
ভক্তিভরে করেছে বীজন,
ওই মায়াচিত্রবৎ তরুলতা ছায়াপথ
ছিল তাঁর পুণ্য তপোবন।

রাজধানী কলিকাতা তুলেছে স্পর্ধিত মাথা,
পুরাতন নাহি ঘেঁষে কাছে।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র চারি দিক, বর্তমান-আধুনিক
আড়ষ্ট হইয়া যেন আছে।
'আজ' 'কাল' দুটি ভাই মরিতেছে জন্মিয়াই,
কলরব করিতেছে কত।
নিশিদিন ধূলি পড়ে দিতেছে আচ্ছন্ন করে
চিরসত্য আছে যেথা যত।

জীবনের হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
মত নিয়ে বাক্য-বরিষন,
বিদ্যা নিয়ে রাতারাতি পুঁথির প্রাচীর গাঁথি
প্রকৃতির গণ্ডি-বিরচন,
কেবলি নূতনে আশ, সৌন্দর্যেতে অবিশ্বাস,
উন্মাদনা চাহি দিনরাত—
সে-সকল ভুলে গিয়ে কোণে বসে খাতা নিয়ে
মহানন্দে কাটিছে প্রভাত।

দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াই মুগ্ধের প্রায়,
অপরাহ্ণে পড়ে তরুচ্ছায়া—

কল্পনার ধনগুলি হৃদয়দোলায় তুলি
প্রতিক্ষণে লভিতেছে কায়া।
সেবি বাহিরের বায়ু বাড়ে তাহাদের আয়ু,
ভোগ করে চাঁদের অমিয়—
ভেদ করি মোর প্রাণ জীবন করিয়া পান
হইতেছে জীবনের প্রিয়।

এত তারা জেগে আছে নিশিদিন কাছে কাছে,
এত কথা কয় শত স্বরে,
তাহাদের তুলনায় আর-সবে ছায়াপ্রায়
আসে যায় নয়নের 'পরে।
আজ সব হল সারা, বিদায় লয়েছে তারা,
নূতন বেঁধেছে ঘরবাড়ি—
এখন স্বাধীন বলে বাহিরে এসেছে চলে
অন্তরের পিতৃগৃহ ছাড়ি।

তাই এতদিন পরে আজি নিজমূর্তি ধরে
প্রবাসের বিরহবেদনা,
তোদের কাছেতে যেতে তোদিকে নিকটে পেতে
জাগিতেছে একান্ত বাসনা।
সম্মুখে দাঁড়াব যবে 'কী এনেছ' বলি সবে
যদ্যপি শুধাস হাসিমুখ,
খাতাখানি বের করে বলিব 'এ পাতা ভরে
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ'।

সেই ছবি মনে আসে টেবিলের চারি পাশে
গুটিকত চৌকি টেনে আনি,
শুধু জন দুই-তিন ঊর্ধ্বে জ্বলে কেরোসিন,
কেদারায় বসি ঠাকুরানী।

দক্ষিণের দ্বার দিয়ে বায়ু আসে গান নিয়ে,
কেঁপে কেঁপে উঠে দীপশিখা।
খাতা হাতে সুর ক'রে অবাধে যেতেছি প'ড়ে,
কেহ নাই করিবারে টীকা।

ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত, ফুরায় ব'য়ের পাত,
বাহিরে নিস্তব্ধ চারি ধার—
তোদের নয়নে জল করে আসে ছলছল্
শুনিয়া কাহিনী করুণার।
তাই দেখে শুতে যাই, আনন্দের শেষ নাই,
কাটে রাত্রি স্বপ্ন-রচনায়—
মনে মনে প্রাণ ভরি অমরতা লাভ করি
নীরব সে সমালোচনায়।

তার পরে দিনকত কেটে যায় এইমতো,
তার পরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তার পরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারি দিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে, "ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।"

শির নাড়ি কেহ কহে, "সব-সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভালো হ'ত আরো ভালো হলে।"
কেহ বলে, "আয়ুহীন বাঁচিবে দু-চারি দিন,
চিরদিন রবে না তা ব'লে।"

কেহ বলে, "এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হ'ত যদি অন্য কোনোরূপ।"
যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়,
আমি শুধু বসে আছি চুপ।

ল'য়ে নাম, ল'য়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি,
ও-সকল আনিস নে কানে।
আইনের লৌহ-ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে,
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।
হাসিমুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে,
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে,
ভালো যার লাগে তার লাগে।

—রবিকাকা

নাটকের পাত্রগণ

গোবিন্দমাণিক্য	ত্রিপুরার রাজা
নক্ষত্ররায়	গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
রঘুপতি	রাজপুরোহিত
জয়সিংহ	রঘুপতির পালিত রাজপুত যুবক, রাজমন্দিরের সেবক
চাঁদপাল	দেওয়ান
নয়নরায়	সেনাপতি
ধ্রুব	রাজপালিত বালক
মন্ত্রী	
পৌরগণ	

গুণবতী	মহিষী
অপর্ণা	ভিখারিনী

বিসর্জন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

গুণবতী

গুণবতী। মার কাছে কী করেছি দোষ! ভিখারি যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে,
তারে দাও শিশু— পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া অসহায় জীব। আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারানী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা ল'য়ে, বসে আছি
তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব— এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে। হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি!

কুমারজননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে ?

রঘুপতির প্রবেশ

প্রভু,
চিরদিন মা'র পূজা করি। জেনে শুনে
কিছু তো করি নি দোষ। পুণ্যের শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম— তবে কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী ?

রঘুপতি। মা'র খেলা
কে বুঝিতে পারে বলো ? পাষাণতনয়া
ইচ্ছাময়ী, সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা। ধৈর্য
ধরো ! এবার তোমার নামে মা'র পূজা
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা।

গুণবতী। এ বৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে এক-শো মহিষ,
তিন শত ছাগ।

রঘুপতি। পূজার সময় হল।

[উভয়ের প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। কী আদেশ মহারাজ ?

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষুদ্র ছাগশিশু
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তারে নাকি কেড়ে আনিয়াছ মা'র কাছে
বলি দিতে ? এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে ?

জয়সিংহ। কেমনে জানিব,
মহারাজ, কোথা হতে অনুচরগণ
আনে পশু দেবীর পূজার তরে।— হাঁ গা,
কেন তুমি কাঁদিতেছ? আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়?

অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে— কোলে করে
নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ
করে খাই। আমি তার মাতা।

জয়সিংহ। মহারাজ,
আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে, যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম, দিতাম বাঁচায়ে।
মা তাহারে নিয়েছেন— আমি তারে আর
ফিরাব কেমনে?

অপর্ণা। মা তাহারে নিয়েছেন?
মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!

জয়সিংহ। ছি ছি,
ও কথা এনো না মুখে।

অপর্ণা। মা, তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন! রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের
রাজা— তুমি যদি চুরি করো, কে তোমার
করিবে বিচার! মহারাজ, বলো তুমি—

গোবিন্দমাণিক্য। বৎসে, আমি বাক্যহীন— এত ব্যথা কেন,
এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে?

অপর্ণা। এই-যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি

এ কি তারি রক্ত ? ওরে বাছনি আমার !
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিল কত,
চেয়েছিল চারি দিকে ব্যাকুল নয়নে,
কম্পিত কাতর বক্ষে, মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হতে ছুটিয়া এল না ?

প্রতিমার প্রতি

জয়সিংহ। আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারি নে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর !

জয়সিংহের প্রতি

অপর্ণা। তুমি তো নিষ্ঠুর নহ— আঁখি-প্রান্তে তব
অশ্রু ঝরে মোর দুখে। তবে এস তুমি,
এ মন্দির ছেড়ে এস। তবে ক্ষম মোরে,
মিথ্যা আমি অপরাধী করেছি তোমায়।

প্রতিমার প্রতি

জয়সিংহ। তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সংগীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরিনন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে ! ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।—
হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে ?
কোথায় আশ্রয় আছে ?

জনান্তিক হইতে

গোবিন্দমাণিক্য। যেথা আছে প্রেম। [প্রস্থান

জয়সিংহ। কোথা আছে প্রেম !
অয়ি ভদ্রে, এস তুমি
আমার কুটিরে। অতিথিরে দেবীরূপে
আজিকে করিব পূজা করিয়াছি পণ।

[জয়সিংহ ও অপর্ণার প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা

রাজা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

সভাসদ্‌গণ উঠিয়া

সকলে। জয় হোক মহারাজ!

রঘুপতি। রাজার ভাণ্ডারে
এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।

গোবিন্দমাণিক্য। মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।

নয়নরায়। বলি নিষেধ!

মন্ত্রী। নিষেধ!

নক্ষত্ররায়। তাই তো! বলি নিষেধ!

রঘুপতি। এ কি স্বপ্নে শুনি?

গোবিন্দমাণিক্য। স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধ'রে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি। এতদিন
সহিল কী করে? সহস্র বৎসর ধ'রে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি!

গোবিন্দমাণিক্য। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘুপতি। মহারাজ, কী করিছ ভালো করে ভেবে
দেখো। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দমাণিক্য। সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।

রঘুপতি। একে ভ্রান্তি, তাহে অহংকার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

নক্ষত্ররায়। তাই তো, কী বলো মন্ত্রী,—

এ বড়ো আশ্চর্য ! ঠাকুর শোনেন নাই ?

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।
সেই তো বধিরতম যেজন সে বাণী
শুনেও শুনে না।

রঘুপতি। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি !

গোবিন্দমাণিক্য। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুররাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসন-দণ্ড।

রঘুপতি। এই কি হইল স্থির ?

গোবিন্দমাণিক্য। স্থির এই।

উঠিয়া

রঘুপতি। তবে
উচ্ছন্ন ! উচ্ছন্ন যাও !

ছুটিয়া আসিয়া

চাঁদপাল। হাঁ হাঁ ! থামো ! থামো !

গোবিন্দমাণিক্য। বোসো চাঁদপাল। ঠাকুর, বলিয়া যাও।
মনোব্যথা লঘু করে যাও নিজ কাজে।

রঘুপতি। তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা ? প্রচারিবে তাঁর 'পরে
তোমার নিয়ম ? হরণ করিবে তাঁর
বলি ? হেন সাধ্য নাই তব। আমি আছি
মায়ের সেবক।

[প্রস্থান

নয়নরায়। ক্ষমা করো অধীনের
স্পর্ধা মহারাজ। কোন্ অধিকারে, প্রভু,
জননীর বলি—

চাঁদপাল। শান্ত হও সেনাপতি।

মন্ত্রী। মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির ?

আজ্ঞা আর ফিরিবে না ?

গোবিন্দমাণিক্য। আর নহে মন্ত্রী,
বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ।

মন্ত্রী। পাপের কি এত পরমায়ু হবে ?
কত শত বর্ষ ধরে যে প্রাচীন প্রথা
দেবতাচরণতলে বৃদ্ধ হয়ে এল,
সে কি পাপ হতে পারে ?

রাজার নিরুত্তরে চিন্তা

নক্ষত্ররায়। তাই তো হে মন্ত্রী,
সে কি পাপ হতে পারে ?

মন্ত্রী। পিতামহগণ
এসেছে পালন করে যত্নে ভক্তিভরে
সনাতন রীতি। তাঁহাদের অপমান
তার অপমানে।

রাজার চিন্তা

নক্ষত্ররায়। ভেবে দেখো মহারাজ,
যুগে যুগে যে পেয়েছে শতসহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কী আছে অধিকার।

সনিশ্বাসে

গোবিন্দমাণিক্য। থাক্‌ তর্ক !
যাও মন্ত্রী, আদেশ প্রচার করো গিয়ে—
আজ হতে বন্ধ বলিদান। [প্রস্থান

মন্ত্রী। একি হল !

নক্ষত্ররায়। তাই তো হে মন্ত্রী, এ কী হল ! শুনেছিনু
মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে
মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু।
কী বল হে চাঁদপাল, তুমি কেন চুপ ?

চাঁদপাল। ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

জয়সিংহ

জয়সিংহ। মা গো, শুধু তুই আর আমি! এ মন্দিরে
সারাদিন আর কেহ নাই— সারা দীর্ঘ
দিন! মাঝে মাঝে কে আমারে ডাকে যেন।
তোর কাছে থেকে তবু একা মনে হয়!

নেপথ্যে গান

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?

জয়সিংহ। মা গো, এ কী মায়া! দেবতারে প্রাণ দেয়
মানবের প্রাণ! এইমাত্র ছিলে তুমি
নির্বাক্‌ নিশ্চল— উঠিলে জীবন্ত হয়ে
সন্তানের কণ্ঠস্বরে সজাগ জননী!

গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণার প্রবেশ

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?
ভয় নেই, ভয় নেই, যাও আপন মনেই
যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে।

জয়সিংহ। কেবলি একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশ দিক জেগে ওঠে যদি
দশটি সন্দেহ-সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ? জান কি একেলা কারে
বলে?

জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩০

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ গৃহীত ফটোগ্রাফ

অপর্ণা। জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে—
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই!

জয়সিংহ। স্বজনের
আগে দেবতা যেমন একা! তাই বটে!
তাই বটে! মনে হয় এ জীবন বড়ো
বেশি আছে— যত বড়ো তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন।

অপর্ণা। জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা! তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে জন
তাহারো কাঙাল তুমি। যে তোমার সব
নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন।
ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে।
এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছি— কত
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে
ভাবে শুধু বুঝি ভিক্ষাতরে— দূর হতে
দেয় তাই মুষ্টিভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে।
এত দয়া পাই নে কোথাও— যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।

জয়সিংহ। যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে, ভূমিতলে।
যেমন আকাশ হতে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে— দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসি তার
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়।—
ওই আসিছেন
মোর গুরুদেব।

অপর্ণা। আমি তবে সরে যাই
অন্তরালে। ব্রাহ্মণেরে বড়ো ভয় করি।

কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি ! কঠিন ললাট
পাষাণসোপান যেন দেবীমন্দিরের।

[প্রস্থান

জয়সিংহ। কঠিন ? কঠিন বটে। বিধাতার মতো।
কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর।

রঘুপতির প্রবেশ

পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া

জয়সিংহ। গুরুদেব !
রঘুপতি। যাও, যাও !
জয়সিংহ। আনিয়াছি জল।
রঘুপতি। থাক্, রেখে দাও জল।
জয়সিংহ। বসন।
রঘুপতি। কে চাহে
বসন !
জয়সিংহ। অপরাধ করেছি কি ?
রঘুপতি। আবার !
কে নিয়েছে অপরাধ তব ?—
ঘোর কলি
এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়— সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী-'পরে। হায় হায়,
কলির দেবতা, তোমরাও চাটুকর
সভাসদ্‌সম, নতশিরে রাজ-আজ্ঞা
বহিতেছ ? চতুর্ভুজা, চারি হস্ত আছ
জোড় করি ! বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ ? গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে ? শুধু, দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ ?
দেবতা না যদি থাকে, ব্রাহ্মণ রয়েছে।

ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন
হবিকাষ্ঠ হবে।

জয়সিংহের নিকট গিয়া সস্নেহে

বৎস, আজ করিয়াছি
রুক্ষ আচরণ তোমা-'পরে, চিত্ত বড়ো
ক্ষুব্ধ মোর।

জয়সিংহ। কী হয়েছে প্রভু!

রঘুপতি। কী হয়েছে!
শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে।
এই মুখে কেমনে বলিব কী হয়েছে!

জয়সিংহ। কে করেছে অপমান?

রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য! প্রভু, কারে অপমান?

রঘুপতি। কারে! তুমি, আমি, সর্বশাস্ত্র, সর্বদেশ,
সর্বকাল, সর্বদেশকাল-অধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি। মা'র পূজা-বলি
নিষেধিল স্পর্ধাভরে।

জয়সিংহ। গোবিন্দমাণিক্য!

রঘুপতি। হাঁ গো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য!
তোমার সকল-শ্রেষ্ঠ— তোমার প্রাণের
অধীশ্বর! অকৃতজ্ঞ! পালন করিনু
এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হতে,
আমা-চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য?

জয়সিংহ। প্রভু, পিতৃকোলে বসি
আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্র-পানে— দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।
কিন্তু এ কী বকিতেছি! কী কথা শুনিনু!

মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা ? এ আদেশ কে মানিবে ?

রঘুপতি। না মানিলে
নির্বাসন।

জয়সিংহ। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হতে
নির্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর

গুণবতী ও পরিচারিকা

গুণবতী। কী বলিস ? মন্দিরের দুয়ার হইতে
রানীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে ?
এক দেহে কত মুণ্ড আছে তার ? কে সে
দুরদৃষ্ট ?

পরিচারিকা। বলিতে সাহস নাহি মানি—

গুণবতী। বলিতে সাহস নাহি ? এ কথা বলিলি
কী সাহসে ? আমা-চেয়ে কারে তোর ভয় ?

পরিচারিকা। ক্ষমা করো।

গুণবতী। কাল সন্ধেবেলা ছিনু রানী ;
কাল সন্ধেবেলা বন্দীগণ করে গেছে
স্তব, বিপ্রগণ করে গেছে আশীর্বাদ,
ভৃত্যগণ করজোড়ে আজ্ঞা লয়ে গেছে—
একরাত্রে উলটিল সকল নিয়ম ?
দেবী পাইল না পূজা, রানীর মহিমা
অবনত ? ত্রিপুরা কি স্বপ্নরাজ্য ছিল ?
ত্বরা করে ডেকে আন্ ব্রাহ্মণ-ঠাকুরে।

[পরিচারিকার প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গুণবতী। মহারাজ, শুনিতেছ ? মার দ্বার হতে
আমার পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে।

গোবিন্দমাণিক্য। জানি তাহা।

গুণবতী। জান তুমি ? নিষেধ কর নি
তবু ? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান ?

গোবিন্দমাণিক্য। তারে ক্ষমা করো প্রিয়ে!

গুণবতী। দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ তো দয়া নয়—
এ শুধু কাপুরুষতা! দয়ায় দুর্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পারো
যদি, আমি দণ্ড দিব। বলো মোরে কে সে
অপরাধী।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী, আমি। অপরাধ আর
কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই
অপরাধ।

গুণবতী। কী বলিছ মহারাজ!

গোবিন্দমাণিক্য। আজ
হতে, দেবতার নামে জীবরক্তপাত
আমার ত্রিপুররাজ্যে হয়েছে নিষেধ।

গুণবতী। কাহার নিষেধ ?

গোবিন্দমাণিক্য। জননীর।

গুণবতী। কে শুনেছে ?

গোবিন্দমাণিক্য। আমি।

গুণবতী। তুমি ? মহারাজ, শুনে হাসি আসে।
রাজদ্বারে এসেছেন ভুবন-ঈশ্বরী
জানাইতে আবেদন!

গোবিন্দমাণিক্য। হেসো না মহিষী!
জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে।

মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা ? এ আদেশ কে মানিবে ?

রঘুপতি। না মানিলে
নির্বাসন।

জয়সিংহ। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হতে
নির্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর

গুণবতী ও পরিচারিকা

গুণবতী। কী বলিস ? মন্দিরের দুয়ার হইতে
রানীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে ?
এক দেহে কত মুণ্ড আছে তার ? কে সে
দুরদৃষ্ট ?

পরিচারিকা। বলিতে সাহস নাহি মানি—

গুণবতী। বলিতে সাহস নাহি ? এ কথা বলিলি
কী সাহসে ? আমা-চেয়ে কারে তোর ভয় ?

পরিচারিকা। ক্ষমা করো।

গুণবতী। কাল সন্ধেবেলা ছিনু রানী ;
কাল সন্ধেবেলা বন্দীগণ করে গেছে
স্তব, বিপ্রগণ করে গেছে আশীর্বাদ,
ভৃত্যগণ করজোড়ে আজ্ঞা লয়ে গেছে—
একরাত্রে উলটিল সকল নিয়ম ?
দেবী পাইল না পূজা, রানীর মহিমা
অবনত ? ত্রিপুরা কি স্বপ্নরাজ্য ছিল ?
ত্বরা করে ডেকে আন্ ব্রাহ্মণ-ঠাকুরে।

[পরিচারিকার প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গুণবতী। মহারাজ, শুনিতেছ ? মার দ্বার হতে
আমার পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে।

গোবিন্দমাণিক্য। জানি তাহা।

গুণবতী। জান তুমি ? নিষেধ কর নি
তবু ? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান ?

গোবিন্দমাণিক্য। তারে ক্ষমা করো প্রিয়ে !

গুণবতী। দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ তো দয়া নয়—
এ শুধু কাপুরুষতা ! দয়ায় দুর্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পারো
যদি, আমি দণ্ড দিব। বলো মোরে কে সে
অপরাধী।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী, আমি। অপরাধ আর
কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই
অপরাধ।

গুণবতী। কী বলিছ মহারাজ !

গোবিন্দমাণিক্য। আজ
হতে, দেবতার নামে জীবরক্তপাত
আমার ত্রিপুররাজ্যে হয়েছে নিষেধ।

গুণবতী। কাহার নিষেধ ?

গোবিন্দমাণিক্য। জননীর।

গুণবতী। কে শুনেছে ?

গোবিন্দমাণিক্য। আমি।

গুণবতী। তুমি ? মহারাজ, শুনে হাসি আসে।
রাজদ্বারে এসেছেন ভুবন-ঈশ্বরী
জানাইতে আবেদন !

গোবিন্দমাণিক্য। হেসো না মহিষী !
জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে।

মায়ের পূজার বলি নিষেধ ক'রেছে
রাজা ? এ আদেশ কে মানিবে ?

রঘুপতি। না মানিলে
নির্বাসন।

জয়সিংহ। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হতে
নির্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর

গুণবতী ও পরিচারিকা

গুণবতী। কী বলিস ? মন্দিরের দুয়ার হইতে
রানীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে ?
এক দেহে কত মুণ্ড আছে তার ? কে সে
দুরদৃষ্ট ?

পরিচারিকা। বলিতে সাহস নাহি মানি—

গুণবতী। বলিতে সাহস নাহি ? এ কথা বলিলি
কী সাহসে ? আমা-চেয়ে কারে তোর ভয় ?

পরিচারিকা। ক্ষমা করো।

গুণবতী। কাল সন্ধেবেলা ছিনু রানী ;
কাল সন্ধেবেলা বন্দীগণ করে গেছে
স্তব, বিপ্রগণ করে গেছে আশীর্বাদ,
ভৃত্যগণ করজোড়ে আজ্ঞা লয়ে গেছে—
একরাত্রে উলটিল সকল নিয়ম ?
দেবী পাইল না পূজা, রানীর মহিমা
অবনত ? ত্রিপুরা কি স্বপ্নরাজ্য ছিল ?
ত্বরা করে ডেকে আন্ ব্রাহ্মণ-ঠাকুরে।

[পরিচারিকার প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গুণবতী। মহারাজ, শুনিতেছ ? মার দ্বার হতে
আমার পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে।

গোবিন্দমাণিক্য। জানি তাহা।

গুণবতী। জান তুমি ? নিষেধ কর নি
তবু ? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান ?

গোবিন্দমাণিক্য। তারে ক্ষমা করো প্রিয়ে !

গুণবতী। দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ তো দয়া নয়—
এ শুধু কাপুরুষতা ! দয়ায় দুর্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পারো
যদি, আমি দণ্ড দিব। বলো মোরে কে সে
অপরাধী।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী, আমি। অপরাধ আর
কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই
অপরাধ।

গুণবতী। কী বলিছ মহারাজ !

গোবিন্দমাণিক্য। আজ
হতে, দেবতার নামে জীবরক্তপাত
আমার ত্রিপুররাজ্যে হয়েছে নিষেধ।

গুণবতী। কাহার নিষেধ ?

গোবিন্দমাণিক্য। জননীর।

গুণবতী। কে শুনেছে ?

গোবিন্দমাণিক্য। আমি।

গুণবতী। তুমি ? মহারাজ, শুনে হাসি আসে।
রাজদ্বারে এসেছেন ভুবন-ঈশ্বরী
জানাইতে আবেদন !

গোবিন্দমাণিক্য। হেসো না মহিষী !
জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে।

গুণবতী। কথা রেখে দাও মহারাজ! মন্দিরের
বাহিরে তোমার রাজ্য। যেথা তব আজ্ঞা
নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো।

গোবিন্দমাণিক্য। মা'র
আজ্ঞা, মোর আজ্ঞা নহে।

গুণবতী। কেমনে জানিলে?

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষীণ দীপালোকে গৃহকোণে থেকে যায়
অন্ধকার; সব পারে, আপনার ছায়া
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান
তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া। স্বর্গ
হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই
নাই।

গুণবতী। শুনিয়াছি, আপনার পাপপুণ্য
আপনার কাছে। তুমি থাকো আপনার
অসংশয় নিয়ে— আমারে দুয়ার ছাড়ো,
আমার পূজার বলি আমি নিয়ে যাই
আমার মায়ের কাছে।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী, জননীর
আজ্ঞা পারি না লঙ্ঘিতে।

গুণবতী। আমিও পারি না।
মা'র কাছে আছি প্রতিশ্রুত। সেইমত
যথাশাস্ত্র যথাবিধি পূজিব তাঁহারে।
যাও, তুমি যাও!

গোবিন্দমাণিক্য। যে আদেশ মহারানী! [প্রস্থান

রঘুপতির প্রবেশ

গুণবতী। ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে
মাতৃদ্বার হতে!

রঘুপতি। মহারানী, মা'র পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার। উঞ্ছবৃত্ত
দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা, রাজেন্দ্রাণী,
তোমার পূজার চেয়ে ন্যূন নহে। কিন্তু,
এই বড়ো সর্বনাশ, মা'র পূজা ফিরে
গেছে। এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে, করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা— বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি, জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া।

গুণবতী। কী হবে ঠাকুর!

রঘুপতি। জানেন তা মহামায়া।
এই শুধু জানি— যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে, ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্বসম।
যুগে যুগে রাজপিতাপিতামহ মিলে
ঊর্ধ্ব-পানে তুলিয়াছে যে রাজমহিমা
অভ্রভেদী ক'রে, মুহূর্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ, বজ্রদীর্ণ, দগ্ধ, ঝঞ্ঝাহত।

গুণবতী রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু!

রঘুপতি। হা হা! আমি
রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা
স্বর্গে মর্তে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রানী! দেব-ব্রাহ্মণেরে যিনি—
ধিক্, ধিক্ শতবার! ধিক্ লক্ষবার!
কলির ব্রাহ্মণে ধিক্। ব্রহ্মশাপ কোথা!
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহত বৃশ্চিক-সম আপনি দংশিছে!
মিথ্যা ব্রহ্ম-আড়ম্বর!

পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত

গুণবতী। কী কর ! কী কর
দেব ! রাখো, রাখো, দয়া করো নির্দোষীরে !
রঘুপতি। ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।
গুণবতী। দিব।
যাও প্রভু, পূজা করো মন্দিরেতে গিয়ে,
হবে নাকো পূজার ব্যাঘাত।
রঘুপতি। যে আদেশ
রাজ-অধীশ্বরী ! দেবতা কৃতার্থ হল
তোমারি আদেশ বলে, ফিরে পেল পুন
ব্রাহ্মণ আপন তেজ ! ধন্য তোমরাই,
যতদিন নাহি জাগে কল্কি-অবতার ! [প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্যের পুনঃপ্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ, বিশ্বমাঝে
সব আলো সব সুখ লুপ্ত করে রাখে।
উন্মনা-উৎসুক-চিত্তে ফিরে ফিরে আসি।
গুণবতী। যাও, যাও, এস না এ গৃহে। অভিশাপ
আনিয়ো না হেথা।
গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়তমে, প্রেমে করে
অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ
দূর। সতীর হৃদয় হতে প্রেম গেলে
পতিগৃহে লাগে অভিশাপ।— যাই তবে
দেবী !
গুণবতী। যাও ! ফিরে আর দেখায়ো না মুখ।
গোবিন্দমাণিক্য। স্মরণ করিবে যবে, আবার আসিব। [প্রস্থানোন্মুখ

পায়ে পড়িয়া

গুণবতী। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো নাথ ! এতই কি
হয়েছ নিষ্ঠুর, রমণীর অভিমান
ঠেলে চলে যাবে ? জান না কি প্রিয়তম,
ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া

ছদ্মবেশ? ভালো, আপনার অভিমানে
আপনি করিনু অপমান ক্ষমা করো!

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়তমে, তোমা-'পরে টুটিলে বিশ্বাস
সেই দণ্ডে টুটিত জীবনবন্ধ। জানি
প্রিয়ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের
সূর্য।

গুণবতী। মেঘ ক্ষণিকের। এ মেঘ কাটিয়া
যাবে, বিধির উদ্যত বজ্র ফিরে যাবে,
চিরদিবসের সূর্য উঠিবে আবার
চিরদিবসের প্রথা জাগায়ে জগতে,
অভয় পাইবে সর্বলোক— ভুলে যাবে
দু দণ্ডের দুঃস্বপন। সেই আজ্ঞা করো।
ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক নিজ অধিকার,
দেবী নিজ পূজা, রাজদণ্ড ফিরে যাক
নিজ অপ্রমত্ত মর্ত-অধিকার-মাঝে।

গোবিন্দমাণিক্য। ধর্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার।
অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর
পূজা। দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে
রাজা বিপ্র সকলেরই আছে অধিকার।

গুণবতী। ভিক্ষা, ভিক্ষা চাই! একান্ত মিনতি করি
চরণে তোমার প্রভু! চিরাগত প্রথা
চিরপ্রবাহিত মুক্ত সমীরণ-সম,
নহে তা রাজার ধন— তাও জোড়করে
সমস্ত প্রজার নামে ভিক্ষা মাগিতেছে
মহিষী তোমার। প্রেমের দোহাই মানো
প্রিয়তম! বিধাতাও করিবেন ক্ষমা
প্রেম-আকর্ষণ-বশে কর্তব্যের ত্রুটি।

গোবিন্দমাণিক্য। এই কি উচিত মহারানী? নীচ স্বার্থ,
নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ অজ্ঞানতা,
চির রক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা—

সহস্র শত্রুর সাথে একা যুদ্ধ করি ;
শ্রান্তদেহে আসি গৃহে নারীচিত্ত হতে
অমৃত করিতে পান ; সেথাও কি নাই
দয়াসুধা ? গৃহমাঝে পুণ্যপ্রেম বহে,
তারো সাথে মিশিয়াছে রক্তধারা ? এত
রক্তস্রোত কোন্ দৈত্য দিয়েছে খুলিয়া—
ভক্তিতে প্রেমেতে রক্ত মাখামাখি হয়,
ক্রূর হিংসা দয়াময়ী রমণীর প্রাণে
দিয়ে যায় শোণিতের ছাপ ! এ শোণিতে
তবু করিব না রোধ ?

মুখ ঢাকিয়া

গুণবতী। যাও, যাও তুমি !

গোবিন্দমাণিক্য। হায় মহারানী, কর্তব্য কঠিন হয়
তোমরা ফিরালে মুখ। [প্রস্থান

কাঁদিয়া উঠিয়া

গুণবতী। ওরে অভাগিনী,
এতদিন এ কী ভ্রান্তি পুষেছিলি মনে !
ছিল না সংশয়মাত্র, ব্যর্থ হবে আজ
এত অনুরোধ, এত অনুনয়, এত
অভিমান। ধিক্, কী সোহাগে পুত্রহীনা
পতিরে জানায় অভিমান ! ছাই হোক
অভিমান তোর ! ছাই এ কপাল ! ছাই
মহিষীগরব ! আর নহে প্রেমখেলা,
সোহাগক্রন্দন। বুঝিয়াছি আপনার
স্থান— হয় ধূলিতলে নতশির, নয়
ঊর্ধ্বফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

একদল লোকের প্রবেশ

নেপাল। কোথায় হে, তোমাদের তিন-শো পাঁঠা, এক-শো-এক মোষ। একটা টিকটিকির ছেঁড়া নেজটুকু পর্যন্ত দেখবার জো নেই। বাজনাবাদ্যি গেল কোথায়, সব যে হাঁ-হাঁ করছে। খরচপত্র করে পুজো দেখতে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে!

গণেশ। দেখ্, মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে অমন করে বলিস নে। মা পাঁঠা পায় নি, এবার জেগে উঠে তোদের এক-একটাকে ধরে ধরে মুখে পুরবে।

হারু। কেন! গেল বছরে বাছারা সব ছিলে কোথায়? আর, সেই ও-বছর, যখন ব্রত সাঙ্গ করে রানীমা পুজো দিয়েছিল, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল? তখন একবার দেখে যেতে পার নি? রক্তে যে গোমতী রাঙা হয়ে গিয়েছিল। আর অলুক্ষুনে বেটারা এসেছিস, আর মায়ের খোরাক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তোদের এক-একটাকে ধরে মা'র কাছে নিবেদন করে দিলে মনের খেদ মেটে

কানু। আর ভাই, মিছে রাগ করিস। আমাদের কি আর বলবার মুখ আছে! তা হলে কি আর দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনি!

হারু। তা যা বলিস ভাই, অল্পেতেই আমার রাগ হয় সে কথা সত্যি। সেদিন ও ব্যক্তি শালা পর্যন্ত উঠেছিল, তার বেশি যদি একটা কথা বলত, কিম্বা আমার গায়ে হাত দিত, মাইরি বলছি, তা হলে আমি—

নেপাল। তা, চল্-না দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি আছে।

হারু। তা, আয়-না। জানিস? এখানকার দফাদার আমার মামাতো ভাই হয়!

নেপাল। তা, নিয়ে আয় তোর মামাকে সুদ্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ করে দিই।

হারু। তোমরা সকলেই শুনলে!

গণেশ ও কানু। আর দূর কর্ ভাই, ঘরে চল্। আজ আর কিছুতে গা লাগছে না। এখন তোদের তামাশা তুলে রাখ্।

হারু। এ কি তামাশা হল? আমার মামাকে নিয়ে তামাশা! আমাদের দফাদারের আপনার বাবাকে নিয়ে—

গণেশ ও কানু। আর রেখে দে! তোর আপনার বাবা নিয়ে তুই আপনি মর্। [সকলের প্রস্থান

রঘুপতি নয়নরায় ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি। মা'র 'পরে ভক্তি নাই তব?

নয়নরায়। হেন কথা
কার সাধ্য বলে? ভক্তবংশে জন্ম মোর।

রঘুপতি। সাধু, সাধু! তবে তুমি মায়ের সেবক,
আমাদেরই লোক।

নয়নরায়। প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা
আমি তাঁহাদেরই দাস।

রঘুপতি। সাধু! ভক্তি তব
হউক অক্ষয়। ভক্তি তব বাহুমাঝে
করুক সঞ্চার অতি দুর্জয় শকতি।
ভক্তি তব তরবারি করুক শাণিত,
বজ্রসম দিক তাহে তেজ। ভক্তি তব
হৃদয়েতে করুক বসতি, পদমান
সকলের উচ্চে।

নয়নরায়। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ
ব্যর্থ হইবে না।

রঘুপতি। শুন তবে সেনাপতি,
তোমার সকল বল করো একত্রিত
মা'র কাজে। নাশ করো মাতৃবিদ্রোহীরে।

নয়নরায়। যে আদেশ প্রভু! কে আছে মায়ের শত্রু?

রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।

নয়নরায়। আমাদের মহারাজ!

রঘুপতি। লয়ে তব সৈন্যদল, আক্রমণ করো
তারে।

নয়নরায়। ধিক্ পাপ-পরামর্শ! প্রভু, এ কি
পরীক্ষা আমারে?

রঘুপতি। পরীক্ষাই বটে। কার
ভৃত্য তুমি, এবার পরীক্ষা হবে তার।
ছাড়ো চিন্তা, ছাড়ো দ্বিধা, কাল নাহি আর—
ত্রিপুরেশ্বরীর আজ্ঞা হতেছে ধ্বনিত
প্রলয়ের শৃঙ্গসম— ছিন্ন হয়ে গেছে
আজি সকল বন্ধন।

নয়নরায়। নাই চিন্তা, নাই
কোনো দ্বিধা। যে পদে রেখেছে দেবী, আমি
তাহে রয়েছি অটল।

রঘুপতি। সাধু!

নয়নরায়। এত আমি
নরাধম জননীর সেবকের মাঝে
মোর 'পরে হেন আজ্ঞা! আমি হব
বিশ্বাসঘাতক! আপনি দাঁড়ায়ে আছে
বিশ্বমাতা হৃদয়ের বিশ্বাসের 'পরে,
সেই তাঁর অটল আসন— আপনি তা
ভাঙিতে বলিবে দেবী আপনার মুখে?
তাহা হলে আজ যাবে রাজা, কাল দেবী—
মনুষ্যত্ব ভেঙে পড়ে যাবে জীর্ণভিত্তি
অট্টালিকা-সম।

জয়সিংহ। ধন্য, সেনাপতি ধন্য!

রঘুপতি। ধন্য বটে তুমি। কিন্তু এ কী ভ্রান্তি তব!
যে রাজা বিশ্বাসঘাতী জননীর কাছে,
তার সাথে বিশ্বাসের বন্ধন কোথায়?

নয়নরায়। কী হইবে মিছে তর্কে? বুদ্ধির বিপাকে
চাহি না পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে— সেই পথ বিশ্বাসের পথ। সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চলে যাবে
অবোধ অধম ভৃত্য এ নয়নরায়। [প্রস্থান

জয়সিংহ। চিন্তা কেন দেব? এমনি বিশ্বাসবলে

মোরাও করিব কাজ। কারে ভয় প্রভু!
সৈন্যবলে কোন্ কাজ! অস্ত্র কোন্ ছার!
যার 'পরে রয়েছে যে ভার, বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মা'র পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা।
চলো প্রভু, বাজাই মায়ের ডঙ্কা, ডেকে
আনি পুরবাসীগণে. মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই!— ওরে, আয় তোরা, আয়, আয়,
অভয়ার পূজা হবে— নির্ভয়ে আয় রে
তোরা মায়ের সন্তান! আয় পুরবাসী!

[জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রস্থান

পুরবাসীগণের প্রবেশ

অক্রূর। ওরে, আয় রে আয়!

সকলে। জয় মা!

হারু। আয় রে, মায়ের সামনে বাহু তুলে নৃত্য করি।

গান

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশ দিক আঁধার ক'রে মাতিল দিক্‌বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা-রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে।
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকালো তরাসে।
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।

সকলে। জয় মা!

গণেশ। আর ভয় নেই।

কানু। ওরে, সেই দক্ষিণদ'র মানুষগুলো এখন গেল কোথায়?

গণেশ মায়ের ঐশ্বর্য বেটাদের সইল না। তারা ভেগেছে।

হারু। কেবল মায়ের ঐশ্বর্য নয়, আমি তাদের এমনি শাসিয়ে দিয়েছি, তারা আর এমুখো হবে না। বুঝলে অক্রূরদা, আমার মামাতো ভাই দফাদারের নাম করবা-মাত্র তাদের মুখ চুন হয়ে গেল।

অক্রূর। আমাদের নিতাই সেদিন তাদের খুব কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। ওই যার সেই ছুঁচ-পারা মুখ সেই বেটা তেড়ে উত্তর দিতে এসেছিল; আমাদের নিতাই বললে, "ওরে, তোরা দক্ষিণদেশে থাকিস, তোরা উত্তরের কী জানিস? উত্তর দিতে এসেছিস, উত্তরের জানিস কী?" শুনে আমরা হেসে কে কার গায়ে পড়ি।

গণেশ। ইদিকে ঐ ভালোমানুষটি, কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে কথায় আঁটবার জো নেই।

হারু। নিতাই আমার পিসে হয়।

কানু। শোনো একবার কথা শোনো। নিতাই আবার তোর পিসে হল কবে?

হারু। তোমরা আমার সকল কথাই ধরতে আরম্ভ করেছ। আচ্ছা, পিসে নয় তো পিসে নয়। তাতে তোমার সুখটা কী হল? আমার হল না বলে কি তোমারই পিসে হল?

রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি। শুনলুম সৈন্য আসছে। জয়সিংহ অস্ত্র নিয়ে তুমি এইখানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া! মন্দিরের দ্বার আগলাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি।

গণেশ। অস্ত্র কেন ঠাকুর?

রঘুপতি। মায়ের পুজো বন্ধ করবার জন্য রাজার সৈন্য আসছে।

হারু। সৈন্য আসছে! প্রভু, তবে আমরা প্রণাম হই।

কানু। আমরা ক'জনা, সৈন্য এলে কী করতে পারব?

হারু। করতে সবই পারি—কিন্তু সৈন্য এলে এখেনে জায়গা হবে কোথায়? লড়াই তো পরের কথা, এখানে দাঁড়াব কোন্‌খানে?

অক্রূর। তোর কথা রেখে দে। দেখছিস নে প্রভু রাগে কাঁপছেন? তা ঠাকুর, অনুমতি করেন তো আমাদের দলবল সমস্ত ডেকে নিয়ে আসি।

হারু। সেই ভালো। অমনি আমার মামাতো ভাইকে ডেকে আনি। কিন্তু, আর একটুও বিলম্ব করা উচিত নয়। [সকলের প্রস্থানোদ্যম

সরোষে

রঘুপতি। দাঁড়া তোরা!

করজোড়ে

জয়সিংহ। যেতে দাও প্রভু · প্রাণভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন, আগে হতে রয়েছে মরিয়া।
আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে
সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে।
ভীরুদের যেতে দাও।

স্বগত

রঘুপতি। সে-কাল গিয়েছে।
অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই— শুধু ভক্তি নয়।

প্রকাশ্যে

জয়সিংহ, তবে বলি আনো, করি পূজা।

বাহিরে বাদ্যোদ্যম

জয়সিংহ। সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রানীর পূজা।

রানীর অনুচর ও পুরবাসীগণের প্রবেশ

সকলে ওরে, ভয় নেই— সৈন্য কোথায়? মা'র পূজা আসছে।
হারু। আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যেরা শীঘ্র এ দিকে আসছে না।
কানু। ঠাকুর, রানীমা, পুজো পাঠিয়েছেন।
রঘুপতি। জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন করো। [জয়সিংহের প্রস্থান

পুরবাসীগণের নৃত্যগীত। গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। চলে যাও হেথা হতে— নিয়ে যাও বলি।
রঘুপতি, শোন নাই আদেশ আমার?
রঘুপতি। শুনি নাই।
গোবিন্দমাণিক্য। তবে তুমি এ রাজ্যের নহ।
রঘুপতি। নহি আমি। আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে,
মুকুট ধুলায় পড়ে লুটে। কে আছিস,
আন্ মার পূজা।

বাদ্যোদ্যম

গোবিন্দমাণিক্য। চুপ কর্‌!

অনুচরের প্রতি

কোথা আছে
সেনাপতি, ডেকে আন্‌! হায় রঘুপতি,
অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল
ধর্ম! লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিকদল,
বাহুবল দুর্বলতা করায় স্মরণ।

রঘুপতি। অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে— তাই এত
দুঃসাহস? যায় নাই। যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে। নতুবা এ মনানলে
ছাই করে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব, সমস্ত তেত্রিশ কোটি মিথ্যা।
আজ নহে মহারাজ, রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর-এক দিন।

নয়নরায় ও চাঁদপালের প্রবেশ

নয়নের প্রতি

গোবিন্দমাণিক্য। সৈন্য লয়ে থাকো হেথা নিষেধ করিতে
জীববলি।

নয়নরায়। ক্ষমা করো অধম কিংকরে।
অক্ষম রাজার ভৃত্য দেবতামন্দিরে।
যতদূর যেতে পারে রাজার প্রতাপ
মোরা ছায়া সঙ্গে যাই।

চাঁদপাল। থামো সেনাপতি,
দীপশিখা থাকে এক ঠাঁই, দীপালোক
যায় বহুদূরে। রাজ-ইচ্ছা যেথা যাবে
সেথা যাব মোরা।

গোবিন্দমাণিক্য। সেনাপতি, মোর আজ্ঞা
তোমার বিচারাধীন নহে। ধর্মাধর্ম

লাভক্ষতি রহিল আমার, কার্য শুধু
তব হাতে।

নয়নরায়। এ কথা হৃদয় নাহি মানে।
মহারাজ, ভৃত্য বটে, তবুও মানুষ
আমি। আছে বুদ্ধি, আছে ধর্ম, আছ প্রভু,
আছেন দেবতা।

গোবিন্দমাণিক্য। তবে ফেলো অস্ত্র তব!
চাঁদপাল, তুমি হলে সেনাপতি, তুই
পদ রহিল তোমার। সাবধানে সৈন্য
লয়ে মন্দির করিবে রক্ষা।

চাঁদপাল। যে আদেশ
মহারাজ!

গোবিন্দমাণিক্য। নয়ন, তোমার অস্ত্র দাও
চাঁদপালে।

নয়নরায়। চাঁদপালে? কেন মহারাজ!
এ অস্ত্র তোমার পূর্ব রাজপিতামহ
দিয়েছেন আমাদের পিতামহে। ফিরে
নিতে চাও যদি, তুমি লও। স্বর্গে আছ
তোমরা হে পিতৃপিতামহ, সাক্ষী থাকো।
এতদিন যে রাজবিশ্বাস পালিয়াছ
বহু যত্নে, সাগ্নিকের পুণ্য অগ্নি-সম,
যার ধন তারি হাতে ফিরে দিনু আজ
কলঙ্কবিহীন।

চাঁদপাল। কথা আছে ভাই!

নয়নরায়। ধিক্!
চুপ করো! মহারাজ, বিদায় হলেম।

[প্রণামপূর্বক প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে। দেবতার
কার্যভার তুচ্ছ মানবের 'পরে, হায়
কী কঠিন!

রঘুপতি। এমনি করিয়া ব্রহ্মশাপ
ফলে, বিশ্বাসী হৃদয় ক্রমে দূরে যায়,
ভেঙে যায় দাঁড়াবার স্থান।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। আয়োজন
হয়েছে পূজার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।
গোবিন্দমাণিক্য। বলি কার তরে?
জয়সিংহ। মহারাজ, তুমি হেথা!
তবে শোনো নিবেদন— একান্ত মিনতি
যুগল চরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্বিত আদেশ। মানব হইয়া
দাঁড়ায়ো না দেবীরে আচ্ছন্ন করি—
রঘুপতি। ধিক্!
জয়সিংহ, ওঠো, ওঠো! চরণে পতিত
কার কাছে? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান।
মূঢ়, ফিরে দেখ্— গুরুর চরণ ধরে
ক্ষমা ভিক্ষা কর্। রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পূজা, করালকালিকা,
এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত! থাক্
পূজা, থাক্ বলি— দেখিব রাজার দর্প
কতদিন থাকে। চলে এস জয়সিংহ!

[রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য। এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তারাও শেখে নি হায় কত ক্ষুদ্র তারা!
হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে, এত অহংকার!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায়

নক্ষত্ররায়। কী জন্য ডেকেছ গুরুদেব ?

রঘুপতি। কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।

নক্ষত্ররায়। আমি হব রাজা ! হা হা ! বল কী ঠাকুর
রাজা হব ? এ কথা নূতন শোনা গেল !

রঘুপতি। তুমি রাজা হবে।

নক্ষত্ররায়। বিশ্বাস না হয় মোর।

রঘুপতি। দেবীর স্বপন সত্য। রাজটিকা পাবে
তুমি, নাহিকো সন্দেহ।

নক্ষত্ররায়। নাহিকো সন্দেহ !
কিন্তু, যদি নাই পাই ?

রঘুপতি। আমার কথায়
অবিশ্বাস ?

নক্ষত্ররায়। অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই,
কিন্তু দৈবাতের কথা— যদি নাই হয় !

রঘুপতি। অন্যথা হবে না কভু।

নক্ষত্ররায়। অন্যথা হবে না ?
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে।
রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে দেব দূর করে,
সর্বদাই দৃষ্টি তার রয়েছে পড়িয়া
আমা-'পরে, যেন সে বাপের পিতামহ।
বড়ো ভয় করি তারে— বুঝেছ ঠাকুর ?
তোমারে করিব মন্ত্রী।

রঘুপতি। মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি।

নক্ষত্ররায়। আচ্ছা, জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু, হে ঠাকুর, সবই যদি
জানো তুমি, বলো দেখি কবে রাজা হব।

রঘুপতি। রাজরক্ত চান দেবী।

নক্ষত্ররায়। রাজরক্ত চান!

রঘুপতি। রাজরক্ত আগে আনো, পরে রাজা হবে।

নক্ষত্ররায়। পাব কোথা!

রঘুপতি। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য।
তাঁরি রক্ত চাই।

নক্ষত্ররায়। তাঁরি রক্ত চাই!

রঘুপতি। স্থির
হয়ে থাকো জয়সিংহ, হোয়ো না চঞ্চল!—
বুঝেছ কি? শোনো তবে— গোপনে তাঁহারে
বধ ক'রে, আনিবে সে তপ্ত রাজরক্ত
দেবীর চরণে।—
জয়সিংহ, স্থির যদি
না থাকিতে পারো, চলে যাও অন্য ঠাঁই।—
বুঝেছ নক্ষত্ররায়? দেবীর আদেশ,
রাজরক্ত চাই— শ্রাবণের শেষ রাত্রে।
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা— জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়, তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।

নক্ষত্ররায়। সর্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কী রাজত্বে!
রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভালো।

রঘুপতি। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই
কিছুতেই! রাজরক্ত আনিতেই হবে!

নক্ষত্ররায়। বলে দাও, হে ঠাকুর, কী করিতে হবে।

রঘুপতি। প্রস্তুত হইয়া থাকো। যখন যা বলি
অবিলম্বে করিবে সাধন ; কার্যসিদ্ধি
যতদিন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ।
এখন বিদায় হও।

নক্ষত্ররায়। হে মা কাত্যায়নী !

[প্রস্থান

জয়সিংহ। একি শুনিলাম ! দয়াময়ী মাতঃ, একি
কথা ! তোর আজ্ঞা ! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা !
বিশ্বের জননী !— গুরুদেব ! হেন আজ্ঞা
মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার !

রঘুপতি। আর
কী উপায় আছে বলো।

জয়সিংহ। উপায় ! কিসের
উপায় প্রভু ! হা ধিক্ ! জননী, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই ? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডী ? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ চোরের মতন
রসাতলগামী ? একি পাপ !

রঘুপতি। পাপপুণ্য
তুমি কিবা জানো !

জয়সিংহ। শিখেছি তোমারি কাছে।

রঘুপতি। তবে এস বৎস, আর-এক শিক্ষা দিই।
পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
আত্মপর ! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ !
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে ! সে কাহার খেলা ?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট—

তাহারা কী জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর-জলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর—

জয়সিংহ। থামো, থামো, থামো!—
মায়াবিনী, পিশাচিনী,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস তুই
মা'র ছদ্মবেশ ধরে রক্তপানলোভে?
ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে
চেয়ে থাকে মা'র প্রত্যাশায়, কাছে আসে
লুব্ধ কাক, ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধ শাবকেরা
মা মনে করিয়া তারে করে ডাকাডাকি,
হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচঞ্চুঘাতে—
তেমনি কি তোর ব্যবসায়? প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর-সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা! তবে
কেন মেঘ হতে, ঝরে আশীর্বাদসম
বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ-'পরে—

গ'লে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে— কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে, কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া ?
ছলনা করেছ মোরে প্রভু ! দেখিতেছ
মাতৃভক্তি রক্তসম হৃদয় টুটিয়া
ফেটে পড়ে কিনা আমারি হৃদয় বলি
দিলে মাতৃপদে। ওই দেখো হাসিতেছে
মা আমার স্নেহপরিহাসবশে। বটে,
তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্ত-পিয়াসিনী ! নিবি মা আমার রক্ত,
ঘুচাবি সন্তানজন্ম এ জন্মের তরে—
দিব ছুরি বুকে ? এই শিরা-ছেঁড়া রক্ত
বড়ো কি লাগিবে ভালো ? ওরে, মা আমার
রাক্ষসী পাষাণী বটে ! ডাকিছ কি মোরে
গুরুদেব ? ছলনা বুঝেছি আমি তব।
ভক্তহিয়া-বিদারিত এই রক্ত চাও !
দিয়েছিলে এই-যে বেদনা, তারি পরে
জননীর স্নেহহস্ত পড়িয়াছে। দুঃখ
চেয়ে সুখ শত গুণ। কিন্তু, রাজরক্ত !
ছিছি ! ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বলো
রক্তপিপাসিনী !

রঘুপতি। বন্ধ হোক বলিদান
তবে

জয়সিংহ। হোক বন্ধ।— না না, গুরুদেব, তুমি
জানো ভালোমন্দ। সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে। প্রভু, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো দাসে।
ক্ষমা করো স্পর্ধা মূঢ়তার। ক্ষমা করো
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ।

বলো প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান
মহাদেবী ?

রঘুপতি। হায় বৎস, হায় ! অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি ?

জয়সিংহ। অবিশ্বাস ? কভু
নহে। তোমারে ছাড়িলে, বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায় ? বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মতো, শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ। রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা।

রঘুপতি। দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়সিংহ। পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জন।

রঘুপতি। সত্য করে বলি, বৎস, তবে। তোরে আমি
ভালোবাসি প্রাণের অধিক— পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে— তোরে আমি নারিব হারাতে।

জয়সিংহ। মোর
স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না এ স্নেহের ’পরে।

রঘুপতি। ভালো ভালো,
সে কথা হইবে পরে— কল্য হবে স্থির।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির

অপর্ণা

গান

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

জয়সিংহ, কোথা জয়সিংহ! কেহ নাই
এ মন্দিরে। তুমি কে দাঁড়ায়ে আছ হোথা
অচল মুরতি— কোনো কথা না বলিয়া
হরিতেছ জগতের সার-ধন যত!
আমরা যাহার লাগি কাতর কাঙাল
ফিরে মরি পথে পথে, সে আপনি এসে
তব পদতলে করে আত্মসমর্পণ!
তাহে তোর কোন্ প্রয়োজন! কেন তারে
কৃপণের ধন-সম রেখে দিস পুঁতে
মন্দিরের তলে— দরিদ্র এ সংসারের
সর্ব ব্যবহার হতে করিয়া গোপন!
জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন্ সুখ দেয়,
কোন্ কথা বলে তোমা-কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা-তরে— প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্ সান্ত্বনার সুধা চিররাত্রিদিন
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত!— ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধ দ্বারে আছ বসে?

গান

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। কে রে তুই এ মন্দিরে!
অপর্ণা। আমি ভিখারিনী।
জয়সিংহ কোথা?
রঘুপতি। দূর হ এখান হতে
মায়াবিনী! জয়সিংহে চাহিস কাড়িতে
দেবীর নিকট হতে, ওরে উপদেবী!
অপর্ণা। আমা হতে দেবীর কী ভয়? আমি ভয়
করি তারে, পাছে মোর সব করে গ্রাস!

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

চাহি না অনেক ধন, রব না অধিক ক্ষণ,
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি—
তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির-সম্মুখে পথ

জয়সিংহ

দূর হোক চিন্তাজাল! দ্বিধা দূর হোক!
চিন্তার নরক চেয়ে কার্য ভালো, যত
ক্রূর, যতই কঠোর হোক। কার্যের তো
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা-
ধরে সে সহস্র মূর্তি পলকে পলকে

বাষ্পের মতন ; চারি দিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে
যায়। এক ভালো অনেকের চেয়ে। তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা !— সেই সত্য, সেই সত্য !
পাপপুণ্য নাই, সেই সত্য ! থাক্ চিন্তা,
থাক্ আত্মদাহ, থাক্ বিচার বিবেক !—
কোথা যাও ভাই-সব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে ? কুকী রমণীর নৃত্য হবে ?
আমিও যেতেছি।— এ ধরায় কত সুখ
আছে— নিশ্চিন্ত আনন্দসুখে নৃত্য করে
নারীদল, মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারি দিকে, তটপ্লাবী
তরঙ্গিণী সম। নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায় চারি দিক হতে— উঠে গীতগান,
বহে হাস্যপরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মুরতি ধরে। আমিও চলিনু।

গান

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে।
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস ভবের বাটে
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে।
তোদের ঐ হাসিখুশি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে।
আমার এই বাধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে।
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে॥

এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা—
কে আছে নাম ধরে মোর ডাকতে পারে
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিনতে পারি দেখে তারে॥

দূরে অপর্ণার প্রবেশ

ওকিও অপর্ণা, দূরে দাঁড়াইয়া কেন!
শুনিতেছ অবাক হইয়া, জয়সিংহ
গান গাহে? সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি— তাই গাহিতেছি গান।
ওই দেখো পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোটো কথা নিয়ে
এতই কৌতুকহাসি, এত কুতূহল,
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী।
সত্য যদি হ'ত, তবে হ'ত কি এমন?
সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা?
তাহা হলে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায়,
বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে
মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি।
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়,
ফেটে গিয়ে সংগীত নীরব হত তার।
মিথ্যা বলে তাই এত হাসি— শ্মশানের
কোলে বসে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান, হিংসা-ব্যাঘ্রিণীর খরনখতলে
চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্মকাজ!
সত্য হলে এমন কি হত? হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই, তাই জেনে
সুখী হও— বিষণ্ন বিস্ময়ে, মুগ্ধ আঁখি
তুলে কেন রয়েছিস চেয়ে! আয় সখী,
চিরদিন চলে যাই দুই জনে মিলে

সংসারের 'পর দিয়ে, শূন্য নভস্তলে
তুই লঘু মেঘখণ্ড-সম।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। জয়সিংহ!
জয়সিংহ। তোমারে চিনি নে আমি। আমি চলিয়াছি
আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,
পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে।
তুমি কে বলিছ মোরে দাঁড়াইতে? তুমি
চলে যাও— আমি চলে যাই।
রঘুপতি। জয়সিংহ!
জয়সিংহ। ওই তো সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
চলে যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে লয়ে
ভিখারিনী সখী মোর। কে বলিল, এই
সংসারের রাজপথ তুরূহ জটিল!
যেমন ক'রেই যাই, দিবা-অবসানে
পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে,
আচার বিচার তর্ক বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে—
দু-চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দু-চারিটা ভুলভ্রান্তি ভয় দুঃখসুখ,
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্বলতাবশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে, গভীর বিশ্রাম।
এই তো সংসার! কী কাজ শাস্ত্রের বিধি,
কী কাজ গুরুতে!
প্রভু! পিতা! গুরুদেব!
কী বলিতেছিনু! স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ।
এই সে মন্দির— ওই সেই মহাবট

দাঁড়ায়ে রয়েছে, অটল কঠিন দৃঢ়
নিষ্ঠুর সত্যের মতো। কী আদেশ দেব!
ভুলি নাই কী করিতে হবে। এই দেখো—

ছুরি দেখাইয়া

তোমার আদেশ-স্মৃতি অন্তরে বাহিরে
হতেছে শাণিত। আরো কী আদেশ আছে
প্রভু!

রঘুপতি। দূর করে দাও ওই বালিকারে
মন্দির হইতে।— মায়াবিনী, জানি আমি
তোদের কুহক।— দূর করে দাও ওরে!

জয়সিংহ। দূর করে দিব? দরিদ্র আমারি মতো
মন্দির-আশ্রিত, আমারি মতন হায়
সঙ্গীহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দোষ নিষ্পাপ শুভ্র সুন্দর সরল
সুকোমল বেদনাকাতর, দূর করে
দিতে হবে ওরে? তাই দিব গুরুদেব!
চলে যা অপর্ণা! দয়ামায়া স্নেহপ্রেম
সব মিছে! মরে যা অপর্ণা! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু। চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। তুমি চলে এস জয়সিংহ, এ মন্দির
ছেড়ে, দুইজনে চলে যাই।

জয়সিংহ। দুইজনে
চলে যাই! এ তো স্বপ্ন নয়। একবার
স্বপ্নে মনে করেছিনু স্বপ্ন এ জগৎ।
তাই হেসেছিনু সুখে, গান গেয়েছিনু।
কিন্তু সত্য এ যে। বোলো না সুখের কথা
আর, দেখায়ো না স্বাধীনতা-প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য-কারাগারে।

রঘুপতি। জয়সিংহ,

কাল নাই মিষ্ট আলাপের। দূর করে
দাও ওই বালিকারে।

জয়সিংহ। চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। কেন যাব!

জয়সিংহ। এই নারী-অভিমান তোর?

অপর্ণা। অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই
অভিমান।

জয়সিংহ। তবে আমি যাই। মুখ তোর
দেখিব না, যতক্ষণ রহিবি হেথায়।—
চলে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ, ধিক্
থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব। আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে। [প্রস্থান

রঘুপতি। বৎস, তোলো মুখ, কথা কও একবার!
প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই! আরো
চাস? আমি আজন্মের বন্ধু, দু দণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ?

জয়সিংহ। থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর। কর্তব্য রহিল শুধু মনে।
স্নেহপ্রেম তরুলতাপত্রপুষ্পসম
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে যায়
শুকায় মিলায় নব নব স্বপ্নবৎ।
নিম্নে থাকে শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ
রাত্রিদিন, অনন্ত হৃদয়ভারসম। [প্রস্থান

রঘুপতি। জয়সিংহ, কিছুতে পাই নে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে-বলে। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরপ্রাঙ্গণ

জনতা

গণেশ। এবারে মেলায় তেমন লোক হল না!

অক্রুর। এবারে আর লোক হবে কী করে? এ তো আর হিঁদুর রাজত্ব রইল না। এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে উঠল। ঠাকরুনের বলিই বন্ধ হয়ে গেল, তো মেলায় লোক আসবে কী!

কানু। ভাই, রাজার তো এ বুদ্ধি ছিল না, বোধ হয় কিসে তাকে পেয়েছে।

অক্রুর। যদি পেয়ে থাকে তো কোন্ মুসলমানের ভূতে পেয়েছে, নইলে বলি উঠিয়ে দেবে কেন?

গণেশ। কিন্তু যাই বলো, এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।

কানু। পুরুত-ঠাকুর তো স্বয়ং বলে দিয়েছেন, তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

হারু। তিন মাস কেন, যেরকম দেখছি তাতে তিন দিনের ভর সইবে না। এই দেখো-না কেন, আমাদের মোধো এই আড়াই বছর ধরে ব্যামোয় ভুগে ভুগে বরাবরই তো বেঁচে এসেছে, ঐ, যেমন বলি বন্ধ হল অমনি মারা গেল।

অক্রুর। না রে, সে তো আজ তিন মাস হল মরেছে।

হারু। নাহয় তিন মাসই হল, কিন্তু এই বছরেই তো মরেছে বটে।

ক্ষান্তমণি। ওগো, তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে মরবে কে জানত। তিন দিনের জ্বর— ঐ, যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উল্‌টে গেল।

গণেশ। সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগল, একখানি চালা বাকি রইল না!

চিন্তামণি। অত কথায় কাজ কী! দেখো-না কেন, এ বছর ধান যেমন সস্তা হয়েছে এমন আর কোনোবার হয় নি। এ বছর চাষার কপালে কী আছে কে জানে!

হারু। ঐ রে, রাজা আসছে। সকালবেলাতেই আমাদের এমন রাজার মুখ দেখলুম, দিন কেমন যাবে কে জানে। চল্, এখান থেকে সরে পড়ি।

[সকলের প্রস্থান

চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

চাঁদপাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো। চারি দিকে
চক্ষুকর্ণ পেতে আছি, রাজ-ইষ্টানিষ্ট
কিছু না এড়ায় মোর কাছে। মহারাজ,
তব প্রাণহত্যা-তরে গুপ্ত আলোচনা
স্বকর্ণে শুনেছি।

গোবিন্দমাণিক্য। প্রাণহত্যা!' কে করিবে?

চাঁদপাল। বলিতে সংকোচ মানি। ভয় হয়, পাছে
সত্যকার ছুরি চেয়ে নিষ্ঠুর সংবাদ
অধিক আঘাত করে রাজার হৃদয়ে।

গোবিন্দমাণিক্য। অসংকোচে বলে যাও। রাজার হৃদয়
সতত প্রস্তুত থাকে আঘাত সহিতে।
কে করেছে হেন পরামর্শ?

চাঁদপাল। যুবরাজ
নক্ষত্ররায়।

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র!

চাঁদপাল। স্বকর্ণে শুনেছি
মহারাজ, রঘুপতি যুবরাজে মিলে
গোপনে মন্দিরে বসে স্থির হয়ে গেছে
সব কথা।

গোবিন্দমাণিক্য। দুই দণ্ডে স্থির হয়ে গেল
আজন্মের বন্ধন টুটিতে! হায় বিধি!

চাঁদপাল। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে—

গোবিন্দমাণিক্য। দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের
নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ। ভয় নাই,
যাও তুমি কাজে। সাবধানে রব আমি।

[চাঁদপালের প্রস্থান

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি মহাদেবী!

ভক্তি শুধু— হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে।
এ জগতে দুর্বলেরা বড়ো অসহায়
মা জননী, বাহুবল বড়োই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড়ো ক্রূর, লোভ বড়ো নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ— গর্ব চলে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে।
হেথা স্নেহ-প্রেম অতি ক্ষীণ বৃন্তে থাকে,
পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পবশে।
তুমিও, জননী, যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার!
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি প্রতি
সতী বাম, বন্ধু শত্রু, শোণিতে পঙ্কিল
মানবের বাসগৃহ, হিংসা পুণ্য দয়া
নির্বাসিত। আর নহে, আর নহে, ছাড়ো
ছদ্মবেশ। এখনো কি হয়নি সময়?
এখনো কি রহিবে প্রলয়রূপ তব?
এই-যে উঠিছে খড়্গ চারি দিক হতে
মোর শির লক্ষ্য করি, মাতঃ, একি তোরি
চারি ভুজ হতে? তাই হবে! তবে তাই
হোক। বুঝি মোর রক্তপাতে হিংসানল
নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা। রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভায়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া।
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ,
প্রকাশিবে রাক্ষসী-আকার। এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক!

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। বল্ চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
এই বেলা বল্, বল্ নিজ মুখে, বল্

মানবভাষায়, বল্ শীঘ্র— সত্যই কি
রাজরক্ত চাই ?

নেপথ্যে। চাই।

জয়সিংহ। তবে মহারাজ,
নাম লহ ইষ্টদেবতার। কাল তব
নিকটে এসেছে।

গোবিন্দমাণিক্য। কী হয়েছে জয়সিংহ ?

জয়সিংহ। শুনিলে না নিজকর্ণে ? দেবীরে শুধানু
সত্যই কি রাজরক্ত চাই— দেবী নিজে
কহিলেন 'চাই'।

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী নহে জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হতে,
পরিচিত স্বর।

জয়সিংহ। কহিলেন রঘুপতি ?
অন্তরাল হতে ?— নহে নহে, আর নহে !
কেবলি সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারি নে আর ! যখনি কূলের
কাছে আসি, কে মোরে ঠেলিয়া দেয় যেন
অতলের মাঝে ! সে যে অবিশ্বাস-দৈত্য !
আর নহে ! গুরু হোক কিম্বা দেবী হোক,
একই কথা !—

ছুরিকা-উন্মোচন।... ছুরি ফেলিয়া

ফুল নে মা ! নে মা ! ফুল নে মা !
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর
পরিতোষ ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয় ! এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি
জবাফুল ! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহ-বেদনার মতো।
নিতে হবে ! এই নিতে হবে ! আমি

নাহি ডরি তোর রোষ। রক্ত নাহি দিব!
রাঙা' তোর আঁখি! তোল্ তোর খড়্গ! আন্
তোর শ্মশানের দল! আমি নাহি ডরি।

[গোবিন্দমাণিক্যের প্রস্থান

এ কী হল হায়! দেবী গুরু যাহা ছিল
এক দণ্ডে বিসর্জন দিনু— বিশ্বমাঝে
কিছু রহিল না আর!

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি। সকল শুনেছি
আমি। সব পণ্ড হল। কী করিলি, ওরে
অকৃতজ্ঞ!

জয়সিংহ। দণ্ড দাও প্রভু!

রঘুপতি। সব ভেঙে
দিলি! ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্ধপথ
হতে! লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য! ব্যর্থ করে
দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হতে বড়ো! আজন্মের
স্নেহঋণ শুধিলি এমনি করে!

জয়সিংহ। দণ্ড
দাও পিতা!

রঘুপতি। কোন্ দণ্ড দিব?

জয়সিংহ। প্রাণদণ্ড।

রঘুপতি। নহে। তার চেয়ে গুরুদণ্ড চাই। স্পর্শ
কর্ দেবীর চরণ।

জয়সিংহ। করিনু পরশ।

রঘুপতি। বল্ তবে, 'আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।'

জয়সিংহ। আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘুপতি। চলে যাও।

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

জনতা। রঘুপতি ও জয়সিংহ

রঘুপতি। তোরা এখানে সব কী করতে এলি?

সকলে। আমরা ঠাকরুন দর্শন করতে এসেছি।

রঘুপতি। বটে! দর্শন করতে এসেছ? এখনো তোমাদের চোখ দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণ্যে। ঠাকরুন কোথায়! ঠাকরুন এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুনকে রাখতে পারলি কই? তিনি চলে গেছেন।

সকলে। কী সর্বনাশ! সে কী কথা ঠাকুর! আমরা কী অপরাধ করেছি?

নিস্তারিণী। আমার বোনপো'র ব্যামো ছিল বলেই যা আমি ক'দিন পুজো দিতে আসতে পারি নি।

গোবর্ধন। আমার পাঠা দুটো ঠাকরুনকেই দেব বলে অনেক দিন থেকে মনে করে রেখেছিলুম, এরই মধ্যে রাজা বলি বন্ধ করে দিলে তো আমি কী করব!

হারু। এই আমাদের গন্ধমাদন যা মানত করেছিল তা মাকে দেয় নি বটে, কিন্তু মাও তো তেমনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়ে উঠেছে— আজ ছ'টি মাস বিছানায় প'ড়ে। তা বেশ হয়েছে, আমাদেরই যেন সে মহাজন, তাই বলে কি মাকে ফাঁকি দিতে পারবে!

অক্রূর। চুপ কর্ তোরা। মিছে গোল করিস নে। আচ্ছা ঠাকুর, মা কেন চলে গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হয়েছিল?

রঘুপতি। মার জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস নে, এই তো তোদের ভক্তি?

অনেকে। রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কী করব?

রঘুপতি। রাজা কে? মার সিংহাসন তবে কি রাজার সিংহাসনের নীচে? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক্, দেখি তোদের রাজা কী করে রক্ষা করে।

সকলের সভয়ে গুন্‌গুন্ স্বরে কথা

অক্রূর। চুপ কর্।— সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে মা তাকে দণ্ড দিক, কিন্তু

একেবারে ছেড়ে চলে যাবে এ কি মা'র মতো কাজ ? বলে দাও কী করলে মা ফিরবে।

রঘুপতি। তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে, মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে।

নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন

রঘুপতি। তবে তোরা দেখবি ? এইখানে আয়। অনেক দূর থেকে অনেক আশা করে ঠাকরুনকে দেখতে এসেছিস, তবে একবার চেয়ে দেখ্।

মন্দিরের দ্বার-উদ্‌ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান

সকলে। ও কী! মার মুখ কোন্ দিকে ?

অক্রূর। ওরে, মা বিমুখ হয়েছেন!

সকলে। ও মা, ফিরে দাঁড়া মা! ফিরে দাঁড়া মা! ফিরে দাঁড়া মা! একবার ফিরে দাঁড়া! মা কোথায়! মা কোথায়! আমরা তোকে ফিরিয়ে আনব মা! আমরা তোকে ছাড়ব না। চাই নে আমাদের রাজা। যাক রাজা! মরুক রাজা!

রঘুপতির নিকট আসিয়া

জয়সিংহ। প্রভু, আমি কি একটি কথাও কব না ?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সন্দেহের কি কোনো কারণ নেই ?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। সমস্তই কি বিশ্বাস করব ?

রঘুপতি। হাঁ।

অপর্ণার প্রবেশ

পার্শ্বে আসিয়া

অপর্ণা। জয়সিংহ! এস জয়সিংহ, শীঘ্র এস
এ মন্দির ছেড়ে।

জয়সিংহ। বিদীর্ণ হইল বক্ষ।

[রঘুপতি অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রস্থান

রাজার প্রবেশ

প্রজাগণ। রক্ষা করো মহারাজ, আমাদের রক্ষা
করো— মাকে ফিরে দাও!

গোবিন্দমাণিক্য। বৎসগণ, করো
অবধান। সেই মোর প্রাণপণ সাধ
জননীরে ফিরে এনে দেব।

প্রজাগণ। জয় হোক
মহারাজ, জয় হোক তব।

গোবিন্দমাণিক্য। একবার
শুধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গর্ভে
নিস নি জনম? মাতৃগণ, তোমরা তো
অনুভব করিয়াছ কোমল হৃদয়ে
মাতৃস্নেহসুধা— বলো দেখি মা কি নেই?
মাতৃস্নেহ সব হতে পবিত্র প্রাচীন;
সৃষ্টির প্রথম দণ্ডে মাতৃস্নেহ শুধু
একেলা জাগিয়া বসে ছিল, নতনেত্রে
তরুণ বিশ্বেরে কোলে লয়ে। আজিও সে
পুরাতন মাতৃস্নেহ রয়েছে বসিয়া
ধৈর্যের প্রতিমা হয়ে। সহিয়াছে কত
উপদ্রব, কত শোক, কত ব্যথা, কত
অনাদর— চোখের সম্মুখে ভায়ে ভায়ে
কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুরতা, কত
অবিশ্বাস— বাক্যহীন বেদনা বহিয়া
তবু সে জননী আছে বসে, দুর্বলের
তরে কোল পাতি, একান্ত যে নিরুপায়
তারি তরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আজ
কী এমন অপরাধ করিয়াছি মোরা
যার লাগি সে অসীম স্নেহ চলে গেল
চিরমাতৃহীন করে অনাথ সংসার!

বৎসগণ, মাতৃগণ, বলো, খুলে বলো—
কী এমন করিয়াছি অপরাধ?

কেহ কেহ। মা'র
বলি নিষেধ করেছ! বন্ধ মা'র পূজা!

গোবিন্দমাণিক্য। নিষেধ করেছি বলি, সেই অভিমানে
বিমুখ হয়েছে মাতা! আসিছে মড়ক,
উপবাস, অনাবৃষ্টি, অগ্নি, রক্তপাত—
মা তোদের এমনি মা বটে! দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্তপানলোভে?
হেন মাতৃ-অপমান মনে স্থান দিলি
যবে, আজন্মের মাতৃস্নেহস্মৃতিমাঝে
ব্যথা বাজিল না? মনে পড়িল না মা'র
মুখ?— 'রক্ত চাই' 'রক্ত চাই' গরজন
করিছে জননী, অবোলা দুর্বল জীব
প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর— নৃত্য করে
দয়াহীন নরনারী রক্তমত্ততায়—
এই কি মায়ের পরিবার? পুত্রগণ,
এই কি মায়ের স্নেহছবি?

প্রজাগণ। মূর্খ মোরা
বুঝিতে পারি নে।

গোবিন্দমাণিক্য। বুঝিতে পার না! শিশু
দু দিনের, কিছু যে বোঝে না আর, সেও
তার জননীরে বোঝে। সেও বোঝে, ভয়
পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে; সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে; সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মার মুখ চেয়ে।— তোরা
এমনি কি ভুলে ভ্রান্ত হলি, মাকে গেলি
ভুলে? বুঝিতে পারো না মাতা দয়াময়ী!
বুঝিতে পার না জীবজননীর পূজা

জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে!
বুঝিতে পারো না— ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল! ওরে বৎস,
কী করিয়া দেখাব তোদের, কী বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কী কাতর দয়া,
কী ভর্ৎসনা অভিমান-ভরা ছলছল
নেত্রে তাঁর। দেখাইতে পারিতাম যদি,
সেই দণ্ডে চিনিতিস আপনার মাকে।
দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে,
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মা'র সিংহাসন হতে— সেই অপরাধে
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার?

অপর্ণার প্রবেশ

প্রজাগণ। আপনি চাহিয়া দেখো,
বিমুখ হয়েছে মাতা সন্তানের 'পরে।

মন্দিরের দ্বারে উঠিয়া

অপর্ণা। বিমুখ হয়েছে মাতা! আয় তো মা, দেখি,
আয় তো সমুখে একবার!

প্রতিমা ফিরাইয়া

এই দেখো
মুখ ফিরায়েছে মাতা।

সকলে। ফিরেছে জননী!
জয় হোক! জয় হোক! মাতঃ, জয় হোক

সকলে মিলিয়া গান

থাকতে আর তো পারলি নে মা, পারলি কই?
কোলের সন্তানেরে ছাড়লি কই?

দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,
মুখ তো ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়লি কই ?

[সকলের প্রস্থান

জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রবেশ

জয়সিংহ। সত্য বলো, প্রভু, তোমারি এ কাজ ?

রঘুপতি। সত্য
কেন না বলিব ? আমি কি ডরাই সত্য
বলিবারে ? আমারি এ কাজ। প্রতিমার
মুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি। কী বলিতে
চাও বলো। হয়েছ গুরুর গুরু তুমি,
কী ভর্ৎসনা করিবে আমারে ? দিবে কোন্
উপদেশ ?

জয়সিংহ। বলিবার কিছু নাই মোর।

রঘুপতি। কিছু নাই ? কোনো প্রশ্ন নাই মোর কাছে ?
সন্দেহ জন্মিলে মনে মীমাংসার তরে
চাহিবে না গুরু-উপদেশ ? এত দূরে
গেছ ? মনে এতই কি ঘটেছে বিচ্ছেদ ?
মূঢ়, শোনো। সত্যই তো বিমুখ হয়েছে
দেবী, কিন্তু তাই ব'লে প্রতিমার মুখ
নাহি ফিরে। মন্দিরে যে রক্তপাত করি
দেবী তাহা করে পান, প্রতিমার মুখে
সে রক্ত উঠে না। দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
মূর্খদের কেমনে বুঝাব ! চোখে চাহে
দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ, তোমার আমার হাতে সত্য নাই।
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্তি সত্য নহে—

চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে— কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে।
সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারি দিকে
ফাটিয়া পড়েছে। সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার 'মহামিথ্যা'। সত্য
মহারাজ বসে থাকে রাজ-অন্তঃপুরে—
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দিকে
মরে খেটে খেটে।—

শিরে হাত দিয়ে, ব'সে
ব'সে ভাবো— আমার অনেক কাজ আছে।
আবার গিয়েছে ফিরে প্রজাদের মন।

জয়সিংহ। যে তরঙ্গ তীরে নিয়ে আসে, সেই ফিরে
অকূলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়।
সত্য নহে, সত্য নহে, সত্য নহে— সবই
মিথ্যা! মিথ্যা! মিথ্যা! দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই!
দেবী নাই! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদকক্ষ

গোবিন্দমাণিক্য ও চাঁদপাল

চাঁদপাল। প্রজারা করিছে কুমন্ত্রণা। মোগলের
সেনাপতি চলিয়াছে আসামের দিকে
যুদ্ধ-লাগি, নিকটেই আছে, দুই-চারি
দিবসের পথে— প্রজারা তাহারি কাছে
পাঠাবে প্রস্তাব তোমারে করিতে দূর
সিংহাসন হতে।

গোবিন্দমাণিক্য। আমারে করিবে দূর?
মোর 'পরে এত অসন্তোষ?

চাঁদপাল। মহারাজ,
সেবকের অনুনয় রাখো— পশুরক্ত
এত যদি ভালো লাগে নিষ্ঠুর প্রজার
দাও তাহাদের পশু, রাক্ষসী প্রবৃত্তি
পশুর উপর দিয়া যাক। সর্বদাই
ভয়ে ভয়ে আছি কখন কী হয়ে পড়ে।

গোবিন্দমাণিক্য। আছে ভয় জানি চাঁদপাল, রাজকার্য
সেও আছে। পাথার ভীষণ, তবু তরী
তীরে নিয়ে যেতে হবে। গেছে কি প্রজার
দূত মোগলের কাছে?

চাঁদপাল। এতক্ষণে গেছে।

গোবিন্দমাণিক্য। চাঁদপাল, তুমি তবে যাও এই বেলা,
মোগলের শিবিরের কাছাকাছি থেকো—
যখন যা ঘটে সেথা পাঠায়ো সংবাদ।

চাঁদপাল। মহারাজ, সাবধানে থেকো হেথা প্রভু,
অন্তরে বাহিরে শত্রু। [প্রস্থান

গুণবতীর প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়ে, বড়ো শুষ্ক,
বড়ো শূন্য এ সংসার। অন্তরে বাহিরে
শত্রু। তুমি এসে ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে,
ভালোবেসে চাও মুখপানে। প্রেমহীন
অন্ধকার ষড়যন্ত্র বিপদ বিদ্বেষ
সবার উপরে, হোক তব সুধাময়
আবির্ভাব, ঘোর নিশীথের শিরোদেশে
নির্নিমেষ চন্দ্রের মতন। প্রিয়তমে,
নিরুত্তর কেন? অপরাধ-বিচারের
এই কি সময়? তৃষার্ত হৃদয় যবে

মুমূর্ষুর মতো চাহে মরুভূমি-মাঝে
সুধাপাত্র হাতে নিয়ে ফিরে চলে যাবে?

[গুণবতীর প্রস্থান

চলে গেলে! হায়, দুর্বহজীবন!

নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

স্বগত

নক্ষত্ররায়। যেথা যাই সকলেই বলে, 'রাজা হবে?'—
'রাজা হবে?'— এ বড়ো আশ্চর্য কাণ্ড। একা
বসে থাকি, তবু শুনি কে যেন বলিছে—
রাজা হবে? রাজা হবে? দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখি, এক
বুলি জানে শুধু— রাজা হবে? রাজা হবে?
ভালো বাপু, তাই হব, কিন্তু রাজরক্ত
সে কি তোরা এনে দিবি?

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র!

নক্ষত্র সচকিত

নক্ষত্র!
আমারে মারিবে তুমি? বলো, সত্য বলো,
আমারে মারিবে? এই কথা জাগিতেছে
হৃদয়ে তোমার নিশিদিন? এই কথা
মনে নিয়ে মোর সাথে হাসিয়া বলেছ
কথা, প্রণাম করেছ পায়ে, আশীর্বাদ
করেছ গ্রহণ, মধ্যাহ্নে আহারকালে
এক অন্ন ভাগ করে করেছ ভোজন
এই কথা নিয়ে? বুকে ছুরি দেবে? ওরে
ভাই, এই বুকে টেনে নিয়েছিনু তোরে
এ কঠিন মর্তভূমি প্রথম চরণে
তোর বেজেছিল যবে— এই বুকে টেনে
নিয়েছিনু তোরে, যেদিন জননী, তোর

শিরে শেষ স্নেহহস্ত রেখে, চলে গেল
ধরাধাম শূন্য করি— আজ সেই তুই
সেই বুকে ছুরি দিবি ? এক রক্তধারা
বহিতেছে দোঁহার শরীরে, যেই রক্ত
পিতৃপিতামহ হতে বহিয়া এসেছে
চিরদিন ভাইদের শিরায় শিরায়—
সেই শিরা ছিন্ন করে দিয়ে সেই রক্ত
ফেলিবি ভূতলে ? এই বন্ধ করে দিনু
দ্বার, এই নে আমার তরবারি, মার্
অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক মনস্কাম !

নক্ষত্ররায়। ক্ষমা করো ! ক্ষমা করো ভাই ! ক্ষমা করো !

গোবিন্দমাণিক্য। এস বৎস, ফিরে এস ! সেই বক্ষে ফিরে
এস ! ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ ? এ সংবাদ
শুনেছি যখন, তখনি করেছি ক্ষমা।
তোরে ক্ষমা না করিতে অক্ষম যে আমি।

নক্ষত্ররায় রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা। রক্ষ মোরে
তার কাছ হতে।

গোবিন্দমাণিক্য। কোনো ভয় নেই ভাই !

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরকক্ষ

গুণবতী

গুণবতী। তবু তো হল না। আশা ছিল মনে মনে
কঠিন হইয়া থাকি কিছুদিন যদি
তাহা হলে আপনি আসিবে ধরা দিতে
প্রেমের তৃষায়। এত অহংকার ছিল
মনে। মুখ ফিরে থাকি, কথা নাহি কই,
অশ্রুও ফেলি নে, শুধু শুষ্ক রোষ, শুধু

অবহেলা— এমন তো কতদিন গেল !
শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভা আভাময়, তাপ নাহি তাহে—
হীরকের দীপ্তিসম ! ধিক্ থাক্ শোভা !
এ রোষ বজ্রের মতো হত যদি, তবে
পড়িত প্রাসাদ-'পরে, ভাঙিত রাজার
নিদ্রা, চূর্ণ হত রাজ-অহংকার, পূর্ণ
হত রানীর মহিমা ! আমি রানী, কেন
জন্মাইলে এ মিথ্যা বিশ্বাস ! হৃদয়ের
অধীশ্বরী তব— এই মন্ত্র প্রতিদিন
কেন দিলে কানে ? কেন না জানালে মোরে
আমি ক্রীতদাসী, রাজার কিংকরী শুধু,
রানী নহি— তাহা হলে আজিকে সহসা
এ আঘাত, এ পতন সহিতে হত না !

ধ্রুবের প্রবেশ

কোথা যাস তুই ?

ধ্রুব। আমারে ডেকেছে রাজা। [প্রস্থান

গুণবতী। রাজার হৃদয়রত্ন এই সে বালক !
ওরে শিশু, চুরি করে নিয়েছিস তুই
আমার সন্তানতরে যে আসন ছিল।
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহ-'পরে তুই বসাইলি ভাগ !
রাজহৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তুই
নিলি প্রথম অঞ্জলি— রাজপুত্র এসে
তোরি কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী !—
মা গো মহামায়া, এ কী তোর অবিচার !
এত সৃষ্টি, এত খেলা তোর— খেলাচ্ছলে
দে আমারে একটি সন্তান— দে জননী,
শুধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভ'রে

যায় যাহে। তুই যা বাসিস ভালো, তাই
দিব তোরে।

নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

নক্ষত্র, কোথায় যাও? ফিরে
যাও কেন? এত ভয় কারে তব? আমি
নারী, অস্ত্রহীন, বলহীন, নিরুপায়,
অসহায়— আমি কি ভীষণ এত?

নক্ষত্ররায়। না, না,
মোরে ডাকিয়ো না।

গুণবতী। কেন, কী হয়েছে?

নক্ষত্ররায়। আমি
রাজা নাহি হব।

গুণবতী। নাই হলে। তাই বলে
এত আস্ফালন কেন?

নক্ষত্ররায়। চিরকাল বেঁচে
থাক্ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে
মরি।

গুণবতী। তাই মরো। শীঘ্র মরো। পূর্ণ হোক
মনোরথ। আমি কি তোমার পায়ে ধ'রে
রেখেছি বাঁচিয়ে?

নক্ষত্ররায়। তবে কী বলিবে বলো।

গুণবতী। যে চোর করিছে চুরি তোমারি মুকুট
তাহারে সরায়ে দাও। বুঝেছ কি?

নক্ষত্ররায়। সব
বুঝিয়াছি, শুধু কে সে চোর বুঝি নাই।

গুণবতী। ওই-যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।

নক্ষত্ররায়। তাই বটে! এতক্ষণে

বুঝিলাম সব মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায়। আমি বলি শুধু খেলা।

গুণবতী। মুকুট লইয়া খেলা? বড়ো কাল-খেলা।
এই বেলা ভেঙে দাও খেলা— নহে তুমি
সে খেলার হইবে খেলেনা।

নক্ষত্ররায়। তাই বটে!
এ তো ভালো খেলা নয়।

গুণবতী। অর্ধরাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে কোরো নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেবরোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে— পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি?

নক্ষত্ররায়। বুঝিয়াছি।

গুণবতী। তবে যাও। যা বলিনু করো।
মনে রেখো, মোর নামে কোরো নিবেদন।

নক্ষত্ররায়। তাই হবে। মুকুট লইয়া খেলা! এ কী
সর্বনাশ! দেবীর সন্তোষ, রাজ্যরক্ষা,
পিতৃলোক— বুঝিতে কিছুই বাকি নেই।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরসোপান

জয়সিংহ

জয়সিংহ দেবী, আছ, আছ তুমি। দেবী, থাকো তুমি
এ অসীম রজনীর সর্বপ্রান্তশেষে
যদি থাকো কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে

ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বলো মোরে
'বৎস, আছি'-- নাই, নাই, নাই, দেবী নাই !
নাই ? দয়া করে থাকো ! অয়ি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর্, দয়া কর্ জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ্। আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে ?
এত মিথ্যা তুই ?— এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ ! সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য,
দয়াশূন্য, মাতৃশূন্য সর্বশূন্য-মাঝে !

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা, আবার এসেছিস ? তাড়ালেম
মন্দিরবাহিরে, তবু তুই অনুক্ষণ
আশে-পাশে চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াস
সুখের দুরাশা-সম দরিদ্রের মনে ?
সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই !—
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না।
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দিরবাহিরে
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।
অপর্ণা, যাস নে তুই— তোরে আমি, আর
ফিরাব না। আয়, এইখানে বসি দোঁহে।
অনেক হয়েছে রাত। কৃষ্ণপক্ষশশী
উঠিতেছে তরু-অন্তরালে। চরাচর
সুপ্তিমগ্ন, শুধু মোরা দোঁহে নিদ্রাহীন।
অপর্ণা, বিষাদময়ী, তোরেও কি গেছে
ফাকি দিয়ে মায়ার দেবতা ? দেবতায়
কোন্ আবশ্যক ! কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোটোখাটো সুখের সংসারে ?
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে ? পাষাণের

মতো, শুধু চেয়ে থাকে ! আপন ভায়েরে
প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তারে— সে কি তার কোনো কাজে লাগে ?
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে
মুখ ফিরাইয়া, তার দিকে চেয়ে থাকি—
সে কোথায় চায় ? তার কাছে ক্ষুদ্র বটে,
তুচ্ছ বটে, তবু তো আমার মাতৃধরা ;
তার কাছে কীটবৎ, তবু তো আমার
ভাই ; অবহেলে অন্ধরথচক্রতলে
দলিয়া চলিয়া যায়, তবু সে দলিত,
উপেক্ষিত, তারা তো আমার আপনার।
আয় ভাই, নির্ভয়ে দেবতাহীন হয়ে
আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি।
রক্ত চাই ? স্বরগের ঐশ্বর্য ত্যজিয়া
এ দরিদ্র ধরাতলে তাই কি এসেছ ?
সেথায় মানব নেই, জীব নেই কেহ,
রক্ত নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই—
তাই স্বর্গে হয়েছে অরুচি ? আসিয়াছ
মৃগয়া করিতে, নির্ভয়বিশ্বাসসুখে
যেথা বাসা বেঁধে আছে মানবের ক্ষুদ্র
পরিবার ? অপর্ণা, বালিকা, দেবী নাই !

অপর্ণা। জয়সিংহ, তবে চলে এস, এ মন্দির
ছেড়ে।

জয়সিংহ। যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব। হায় রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে।
তবু, যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ ক'রে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব। থাক্ ও-সকল কথা।
দেখ্ চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত— কলধ্বনি তার

এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।
আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ— বহু রাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে। সুন্দর জগৎ! হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই। থাক্
দেবী। অপর্ণা, জানিস কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোনো কথা? শুধু তাই বল্।
যা শুনিলে মুহূর্তে অতলে মগ্ন হয়ে
ভুলে যাব জীবনের তাপ, মরণ যে
কত মধুরতাময় আগে হতে পাব
তার স্বাদ। অপর্ণা, এমন কিছু বল্
ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধু-আঁখি
রেখে মোর মুখপানে, এই জনহীন
স্তব্ধ রজনীতে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রামাঝে, বল্ রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারি দিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালোবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম।

অপর্ণা হায় জয়সিংহ, বলিতে পারি নে কিছু
বুঝি মনে আছে কত কথা।

জয়সিংহ তবে আরো
কাছে আয়, মন হতে মনে যাক কথা।
—এ কী করিতেছি আমি! অপর্ণা, অপর্ণা,
চলে যা মন্দির ছেড়ে। গুরুর আদেশ!

অপর্ণা জয়সিংহ, হোয়ো না নিষ্ঠুর! বার বার
ফিরায়ো না! কী সহেছি অন্তর্যামী জানে!

জয়সিংহ তবে আমি যাই। এক দণ্ড হেথা নহে।

কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া

অপর্ণা, নিষ্ঠুর আমি? এই কি রহিবে

তোর মনে, জয়সিংহ নিষ্ঠুর, কঠিন!
কখনো কি হাসিমুখে কহি নাই কথা?
কখনো কি ডাকি নাই কাছে? কখনো কি
ফেলি নাই অশ্রুজল তোর অশ্রু দেখে?
অপর্ণা, সে সব কথা পড়িবে না মনে,
শুধু মনে রহিবে জাগিয়া জয়সিংহ
নিষ্ঠুর পাষাণ? যেমন পাষাণ ওই
পাষাণের ছবি, দেবী বলিতাম যারে?—
হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস,
তুই যদি বুঝিতিস এই অন্তর্দাহ!

অপর্ণা। বুদ্ধিহীন ব্যথিত এ ক্ষুদ্র নারী-হিয়া,
ক্ষমা করো এরে। এই বেলা চলে এস,
জয়সিংহ, এস মোরা এ মন্দির ছেড়ে
যাই।

জয়সিংহ। রক্ষা করো! অপর্ণা, করুণা করো!
দয়া ক'রে, মোরে ফেলে চলে যাও। এক
কাজ বাকি আছে এ জীবনে, সেই হোক
প্রাণেশ্বর— তার স্থান তুমি কাড়িয়ো না। [দ্রুত প্রস্থান

অপর্ণা। শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে! আজ কেন ভেঙে পড়ে প্রাণ!

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

নক্ষত্ররায় রঘুপতি ও নিদ্রিত ধ্রুব

রঘুপতি। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সেদিন অমনি করে
কেঁদেছিল নূতন দেখিয়া চারি দিক,
হতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে
তার সেই শিশু-মুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

নক্ষত্ররায়। ঠাকুর কোরো না দেরি আর—
ভয় হয় কখন সংবাদ পাবে রাজা।

রঘুপতি। সংবাদ কেমন করে পাবে? চারি দিক
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা।

নক্ষত্ররায়। একবার
মনে হল যেন দেখিলাম কার ছায়া!

রঘুপতি। আপন ভয়ের।

নক্ষত্ররায়। শুনিলাম যেন কার
ক্রন্দনের স্বর!

রঘুপতি। আপনার হৃদয়ের।
দূর হোক নিরানন্দ। এস পান করি
কারণসলিল।

মদ্যপান

মনোভাব যতক্ষণ
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ—
কার্যকালে ছোটো হয়ে আসে, বহু বাষ্প
গলে গিয়ে একবিন্দু জল। কিছুই না,

শুধু মুহূর্তের কাজ। শুধু শীর্ণশিখা
প্রদীপ নিবাতে যতক্ষণ। ঘুম হতে
চকিতে মিলায়ে যাবে গাঢ়তর ঘুমে
ওই প্রাণরেখাটুকু— শ্রাবণনিশীথে
বিজুলিঝলক-সম, শুধু বজ্র তার
চিরদিন বিঁধে রবে রাজদণ্ড-মাঝে।
এস এস যুবরাজ, ম্লান হয়ে কেন
বসে আছ এক পাশে— মুখে কথা নেই,
হাসি নেই, নির্বাপিতপ্রায়! এস, পান
করি আনন্দসলিল।

নক্ষত্ররায়। অনেক বিলম্ব
হয়ে গেছে। আমি বলি, আজ থাক্। কাল
পূজা হবে।

রঘুপতি। বিলম্ব হয়েছে বটে। রাত্রি
শেষ হয়ে আসে।

নক্ষত্ররায়। ওই শোনো পদধ্বনি।

রঘুপতি। কই? নাহি শুনি।

নক্ষত্ররায়। ওই শোনো, ওই দেখো
আলো।

রঘুপতি। সংবাদ পেয়েছে রাজা! আর তবে
এক পল দেরি নয়। জয় মহাকালী!

খড়্গ-উত্তোলন

গোবিন্দমাণিক্য ও প্রহরীগণের প্রবেশ

রাজার নির্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ধৃত হইল

গোবিন্দমাণিক্য। নিয়ে যাও কারাগারে, বিচার হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিচারসভা

গোবিন্দমাণিক্য রঘুপতি নক্ষত্ররায়
সভাসদ্‌গণ ও প্রহরীগণ

রঘুপতিকে

গোবিন্দমাণিক্য। আর কিছু বলিবার আছে ?
রঘুপতি। কিছু নাই।
গোবিন্দমাণিক্য। অপরাধ করিছ স্বীকার ?
রঘুপতি। অপরাধ ?
অপরাধ করিয়াছি বটে। দেবীপূজা
করিতে পারি নি শেষ— মোহে মূঢ় হয়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে। তার শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি উপলক্ষ শুধু।
গোবিন্দমাণিক্য। শুন সর্বলোক, আমার নিয়ম এই—
পবিত্র পূজার ছলে দেবতার কাছে
যে মোহান্ধ দিবে জীববলি, কিম্বা তারি
করিবে উদ্যোগ রাজ আজ্ঞা তুচ্ছ করি,
নির্বাসনদণ্ড তার প্রতি। রঘুপতি,
অষ্ট বর্ষ নির্বাসনে করিবে যাপন ;
তোমারে আসিবে রেখে সৈন্য চারিজন
রাজ্যের বাহিরে।
রঘুপতি। দেবী ছাড়া এ জগতে
এ জানু হয় নি নত আর কারো কাছে।
আমি বিপ্র, তুমি শূদ্র, তবু জোড়করে
নতজানু আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে— দুই দিন দাও অবসর
শ্রাবণের শেষ দুই দিন। তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যুষে— চলে যাব

তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাব না মুখ।

গোবিন্দমাণিক্য। দুই দিন দিনু
অবসর।

রঘুপতি। মহারাজ রাজ-অধিরাজ!
মহিমাসাগর তুমি কৃপা-অবতার!
ধূলির অধম আমি, দীন, অভাজন! [প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র, স্বীকার করো অপরাধ তব।

নক্ষত্ররায়। মহারাজ, দোষী আমি। সাহস না হয়
মার্জনা করিতে ভিক্ষা। [পদতলে পতন

গোবিন্দমাণিক্য। বলো তুমি কার
মন্ত্রণায় ভুলে এ কাজে দিয়েছ হাত?
স্বভাবকোমল তুমি, নিদারুণ বুদ্ধি
এ তোমার নহে।

নক্ষত্ররায়। আর কারে দিব দোষ!
লব না এ পাপমুখে আর কারো নাম।
আমি শুধু একা অপরাধী। আপনার
পাপমন্ত্রণায় আপনি ভুলেছি। শত
দোষ ক্ষমা করিয়াছ নির্বোধ ভ্রাতার,
আরবার ক্ষমা করো।

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্র, চরণ
ছেড়ে ওঠো, শোনো কথা। ক্ষমা কি আমার
কাজ? বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ,
বন্দী হতে বেশি বন্দী। এক অপরাধে
দণ্ড পাবে এক জনে, মুক্তি পাবে আর,
এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার— আমি
কোথা আছি!

সকলে। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু!
নক্ষত্র তোমার ভাই।

গোবিন্দমাণিক্য। স্থির হও সবে।

ভাই বন্ধু কেহ নাহি মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি। প্রমাণ হইয়া গেছে
অপরাধ। ছাড়ায়ে ত্রিপুররাজ্যসীমা
ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে আছে রাজগৃহ
তীর্থস্নানতরে, সেথায় নক্ষত্ররায়
অষ্ট বর্ষ নির্বাসন করিবে যাপন।

প্রহরীগণ নক্ষত্রকে লইয়া যাইতে উদ্যত। রাজার সিংহাসন হইতে অবরোহণ

দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন। ভাই,
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,
এ দণ্ড আমার। আজ হতে রাজগৃহ
সূচিকণ্টকিত হয়ে বিঁধিবে আমায়।
রহিল তোমার সাথে আশীর্বাদ মোর;
যত দিন দূরে র'বি রাখিবেন তোরে
দেবগণ। [নক্ষত্রের প্রস্থান

সভাসদগণের প্রতি

সভাগৃহ ছেড়ে যাও সবে,
ক্ষণেক একেলা রব আমি। [সকলের প্রস্থান

দ্রুত নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায়। মহারাজ,
সমূহ বিপদ।

গোবিন্দমাণিক্য। রাজা কি মানুষ নহে?
হায় বিধি, হৃদয় তাহার গড় নি কি
অতি দীনদরিদ্রের সমান করিয়া?
দুঃখ দিবে সবার মতন, অশ্রুজল
ফেলিবারে অবসর দিবে না কি শুধু?
কিসের বিপদ, ব'লে যাও শীঘ্র করি।

নয়নরায়। মোগলের সৈন্য সাথে আসে চাঁদপাল,
নাশিতে ত্রিপুরা।

গোবিন্দমাণিক্য। এ নহে নয়নরায়

তোমার উচিত। শত্রু বটে চাঁদপাল,
তাই বলে তার নামে হেন অপবাদ!

নয়নরায়। অনেক দিয়েছ দণ্ড হীন অধীনেরে,
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি।
শ্রীচরণচ্যুত হয়ে আছি, তাই বলে
গিয়েছি কি এত অধঃপাতে!

গোবিন্দমাণিক্য। ভালো করে
বলো আরবার, বুঝে দেখি সব।

নয়নরায়। যোগ
দিয়ে মোগলের সাথে চাহে চাঁদপাল
তোমারে করিতে রাজ্যচ্যুত।

গোবিন্দমাণিক্য। তুমি কোথা
পেলে এ সংবাদ?

নয়নরায়। যেদিন আমারে প্রভু
নিরস্ত্র করিলে, অস্ত্রহীন লাজে চলে
গেনু দেশান্তরে; শুনিলাম আসামের
সাথে মোগলের বাধিছে বিবাদ; তাই
চলেছিনু সেথাকার রাজসন্নিধানে
মাগিতে সৈনিকপদ। পথে দেখিলাম
আসিছে মোগল সৈন্য ত্রিপুরার পানে
সঙ্গে চাঁদপাল। সন্ধানে জেনেছি তার
অভিসন্ধি। ছুটিয়া এসেছি রাজপদে।

গোবিন্দমাণিক্য। সহসা এ কী হল সংসারে হে বিধাতঃ!
শুধু দুই-চারিদিন হল, ধরণীর
কোন্‌খানে ছিদ্রপথ হয়েছে বাহির,
সমুদয় নাগবংশ রসাতল হতে
উঠিতেছে চারি দিকে পৃথিবীর 'পরে—
পদে পদে তুলিতেছে ফণা। এসেছে কি
প্রলয়ের কাল!— এখন সময় নহে
বিস্ময়ের। সেনাপতি, লহ সৈন্যভার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দিরপ্রাঙ্গণ

জয়সিংহ ও রঘুপতি

রঘুপতি। গেছে গর্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব।
ওরে বৎস, আমি তোর গুরু নহি আর।
কাল আমি অসংশয়ে করেছি আদেশ
গুরুর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে
ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার।
অন্তরেতে সে দীপ্তি নিবেছে, যার বলে
তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্যের জ্যোতি,
রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র পড়িলে খসি
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ।
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে পরিহাসভরে
খদ্যোত ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায়।
দীপ প্রতিদিন নেবে, প্রতিদিন জলে,
বারেক নিবিলে তারা চির-অন্ধকার!
আমি সেই চিরদীপ্তিহীন; সামান্য এ
পরমায়ু, দেবতার অতি ক্ষুদ্র দান,
ভিক্ষা মেগে লইয়াছি তারি দুটো দিন
রাজদ্বারে নতজানু হয়ে। জয়সিংহ,
সেই দুই দিন যেন ব্যর্থ নাহি হয়।
সেই দুই দিন যেন আপন কলঙ্ক
ঘুচায়ে মরিয়া যায়। কালামুখ তার
রাজরক্তে রাঙা করে তবে যায় যেন।
বৎস, কেন নিরুত্তর? গুরুর আদেশ
নাহি আর; তবু তোরে করেছি পালন
আশৈশব, কিছু নহে তার অনুরোধ?

নহি কি রে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃবিহীনের পিতা বলে? এই দুঃখ,
এত করে স্মরণ করাতে হল! (কৃপা
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালোবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে!) বৎস, তবু নিরুত্তর? জানু তবে
আরবার নত হোক। কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোটো— তার কাছে নত হোক জানু। পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি।

জয়সিংহ। পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে
আর হানিয়ো না বজ্র। রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব। যাহা চাহে
সব দিব। সব ঋণ শোধ করে দিয়ে
যাব। তাই হবে। তাই হবে। [প্রস্থান

রঘুপতি। তবে তাই
হোক। দেবী চাহে, তাই বলে দিস। আমি
কেহ নই। হায় অকৃতজ্ঞ, দেবী তোর
কী করেছে? শিশুকাল হতে দেবী তোরে
প্রতিদিন করেছে পালন? রোগ হলে
করিয়াছে সেবা? ক্ষুধায় দিয়েছে অন্ন?
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে? হায়, কলিকাল! থাক্!

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদকক্ষ

গোবিন্দমাণিক্য

নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায়। বিদ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরায়ে,
যুদ্ধসজ্জা হয়েছে প্রস্তুত। আজ্ঞা দাও
মহারাজ, অগ্রসর হই— আশীর্বাদ
করো—

গোবিন্দমাণিক্য। চলো সেনাপতি, নিজে আমি যাব
রণক্ষেত্রে।

নয়নরায়। যতক্ষণ এ দাসের দেহে
প্রাণ আছে, ততক্ষণ মহারাজ, ক্ষান্ত
থাকো, বিপদের মুখে গিয়ে—

গোবিন্দমাণিক্য। সেনাপতি,
সবার বিপদ-অংশ হতে, মোর অংশ
নিতে চাই আমি। মোর রাজ-অংশ, সব
চেয়ে বেশি। এস সৈন্যগণ, লহ মোরে
তোমাদের মাঝে। তোমাদের নৃপতিরে
দূর সিংহাসনচূড়ে নির্বাসিত করে
সমরগৌরব হতে বঞ্চিত কোরো না।

চরের প্রবেশ

চর। নির্বাসনপথ হতে লয়েছে কাড়িয়া
কুমার নক্ষত্ররায়ে মোগলের সেনা;
রাজপদে বরিয়াছে তাঁরে। আসিছেন
সৈন্য লয়ে রাজধানী পানে।

গোবিন্দমাণিক্য। চুকে গেল।
আর ভয় নাই! যুদ্ধ তবে গেল মিটে।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। বিপক্ষশিবির হতে পত্র আসিয়াছে।

গোবিন্দমাণিক্য। নক্ষত্রের হস্তলিপি। শান্তির সংবাদ
হবে বুঝি।— এই কি স্নেহের সম্ভাষণ!
এ তো নহে নক্ষত্রের ভাষা! চাহে মোর
নির্বাসন, নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে
সোনার ত্রিপুরা— দগ্ধ করে দিবে দেশ,
বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুরতরে
ত্রিপুররমণী?— দেখি, দেখি, এই বটে
তারি লিপি। 'মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য!'
মহারাজ! দেখো সেনাপতি— এই দেখো
রাজদণ্ড-নির্বাসিত দিয়েছে রাজারে
নির্বাসন দণ্ড। এমনি বিধির খেলা!

নয়নরায়। নির্বাসন! এ কী স্পর্ধা! এখনো তো যুদ্ধ
শেষ হয় নাই।

গোবিন্দমাণিক্য। এ তো নহে মোগলের
দল। ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজা হতে
করিয়াছে সাধ, তার তরে যুদ্ধ কেন?

নয়নরায়। রাজ্যের মঙ্গল—

গোবিন্দমাণিক্য। রাজ্যের মঙ্গল হবে?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখি দুই ভাই হানে
ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য করে মৃত্যুমুখী ছুরি—
রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে— গৃহস্থের ঘর নেই,
ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা?
দেখি দেখি আরবার— এ কি তার লিপি?
নক্ষত্রের নিজের রচনা নহে। আমি
দস্যু, আমি দেবদ্বেষী, আমি অবিচারী,
এ রাজ্যের অকল্যাণ আমি! নহে, নহে,

এ তার রচনা নহে।— রচনা যাহারই
হোক, অক্ষর তো তারি বটে। নিজ হস্তে
লিখেছে তো সেই যে সর্পেরই বিষ হোক,
নিজের অক্ষরমুখে মাখায়ে দিয়েছে,
হেনেছে আমার বুকে।— বিধি, এ তোমার
শাস্তি, তার নহে। নির্বাসন! তাই হোক।
তার নির্বাসনদণ্ড তার হয়ে আমি
নীরবে বিনম্র শিরে করিব বহন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির। বাহিরে ঝড়

রঘুপতি

পূজোপকরণ লইয়া

রঘুপতি। এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষহুহুংকার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী! ওই বুঝি তোর
প্রলয়-সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু!
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি
কোথা দেবী? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ, তোর
চণ্ডীমূর্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে; হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে। ওই পদধ্বনি

শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা। জয়
মহাদেবী!

অপর্ণার প্রবেশ

দূর হ, দূর হ মায়াবিনী,—
জয়সিংহে চাস তুই? আরে সর্বনাশী!
মহাপাতকিনী! [অপর্ণার প্রস্থান

এ কী অকাল-ব্যাঘাত!
জয়সিংহ যদি নাই আসে! কভু নহে।
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার।— জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ংকরী!—
যদি বাধা পায়— যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে!—
জয় মা অভয়া, জয় ভক্তের সহায়!
জয় মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্বজয়া!
ভক্তবৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে, শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে। মাতৃ-অহংকার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবে না তোরে। ওই পদধ্বনি!
জয়সিংহ বটে! জয় নৃমুণ্ডমালিনী,
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি!

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ

জয়সিংহ,
রাজরক্ত কই?

জয়সিংহ। আছে আছে। ছাড়ো মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন।—

রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না

যৌবনে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

জয়সিংহের ভূমিকায় অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃষা ? আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ— রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা। [বক্ষে ছুরি বিন্ধন

রঘুপতি। জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দয়! নিষ্ঠুর!
এ কী সর্বনাশ করিলি রে ? জয়সিংহ,
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন!
জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি! অহংকার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক! তুই আয়!

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পাগল করিবে মোরে। জয়সিংহ, কোথা
জয়সিংহ!

রঘুপতি। আয় মা অমৃতময়ী! ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক্ ব্যগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে! ডাক্ জয়সিংহে! তুই তারে
নিয়ে যা মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি। [অপর্ণার মূর্ছা

প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া

ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ

গোবিন্দমাণিক্য ও নয়নরায়

গোবিন্দমাণিক্য। এখনি আনন্দধ্বনি! এখনি পরেছে
দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ! উঠিয়াছে
রাজধানী-বহির্দ্বারে বিজয়তোরণ
পুলকিত নগরের আনন্দ-উৎক্ষিপ্ত
দুই বাহু-সম! এখনো প্রাসাদ হতে
বাহিরে আসি নি— ছাড়ি নাই সিংহাসন।
এতদিন রাজা ছিনু— কারো কি করি নি
উপকার? কোনো অবিচার করি নাই
দূর? কোনো অত্যাচার করি নি শাসন?
ধিক্ ধিক্ নির্বাসিত রাজা! আপনারে
আপনি বিচার করি আপনার শোকে
আপনি ফেলিস অশ্রু!
মর্তরাজ্য গেল,
আপনার রাজা তবু আমি। মহোৎসব
হোক আজি অন্তরের সিংহাসনতলে।

গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী। প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, আর কেন নাথ?
এইবার শুনেছ তো দেবীর নিষেধ!
এস প্রভু, আজ রাত্রে শেষ পূজা করে
রামজানকীর মতো যাই নির্বাসনে।

গোবিন্দমাণিক্য। অয়ি প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর।
রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে। এস
প্রিয়ে, যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শুধু
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের

অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ
নিয়ে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়।

গুণবতী। ভিক্ষা
রাখো নাথ!

গোবিন্দমাণিক্য। বলো দেবী!

গুণবতী। হোয়ো না পাষাণ।
রাজগর্ব ছেড়ে দাও। দেবতার কাছে
পরাভব না মানিতে চাও যদি, তবু
আমার যন্ত্রণা দেখে গলুক হৃদয়।
তুমি তো নিষ্ঠুর কভু ছিলে নাকো প্রভু,
কে তোমারে করিল পাষাণ! কে তোমারে
আমার সৌভাগ্য হতে লইল কাড়িয়া!
করিল আমারে রাজাহীন রানী!

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়ে,
আমারে বিশ্বাস করো একবার শুধু,
না বুঝিয়া বোঝো মোর পানে চেয়ে। অশ্রু
দেখে বোঝো, আমারে যে ভালোবাস সেই
ভালোবাসা দিয়ে বোঝো আর রক্তপাত
নহে। মুখ ফিরায়ো না দেবী, আর মোরে
ছাড়িয়ো না, নিরাশ কোরো না আশা দিয়ে।
যাবে যদি মার্জনা করিয়া যাও তবে।

[গুণবতীর প্রস্থান

গেলে চলি! কী কঠিন নিষ্ঠুর সংসার।—
ওরে কে আছিস?— কেহ নাই? চলিলাম।
বিদায় হে সিংহাসন! হে পুণ্য প্রাসাদ,
আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্বাসিত পুত্র
তোমারে প্রণাম ক'রে লইল বিদায়।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরকক্ষ

গুণবতী

গুণবতী। বাজা বাদ্য বাজা, আজ রাত্রে পূজা হবে,
আজ মোর প্রতিজ্ঞা পুরিবে। আন্ বলি।
আন্ জবাফুল। রহিলি দাঁড়ায়ে? আজ্ঞা
শুনিবি নে? আমি কেহ নই? রাজ্য গেছে,
তাই ব'লে এতটুকু রানী বাকি নেই
আদেশ শুনিবে যার কিংকর-কিংকরী?
এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী—
এই নে যতেক আভরণ। ত্বরা ক'রে
কর্ গিয়ে আয়োজন দেবীর পূজার।
মহামায়া এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি

রঘুপতি। দেখো, দেখো, কী করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি। হা হা হা হা!
কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া।

মা বলিয়া ডাকে যত জীব, হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দয় বিদ্রূপ।
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর! দে ফিরায়ে!
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী!

নাড়া দিয়া

শুনিতে কি
পাস? আছে কর্ণ? জানিস কী করেছিস?
কার রক্ত করেছিস পান? কোন্ পুণ্য
জীবনের? কোন্ স্নেহদয়াপ্রীতি-ভরা
মহা হৃদয়ের?

থাক্ তুই চিরকাল
এইমতো— এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস!
দিব তোর পূজা প্রতিদিন, পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে। তোর পরিচয় কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব, শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে! কার কাছে কাঁদিতেছি!
তবে দূর, দূর, দূর, দূর করে দাও
হৃদয়দলনী পাষাণীরে। লঘু হোক
জগতের বক্ষ।

দূরে গোমতীর জলে প্রতিমা-নিক্ষেপ

মশাল লইয়া বাদ্য বাজাইয়া
গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী। জয় জয় মহাদেবী।
দেবী কই?

রঘুপতি। দেবী নাই।

গুণবতী। ফিরাও দেবীরে

গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষ শান্তি
করিব তাঁহার। আনিয়াছি মার পূজা।
রাজ্য পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু
প্রতিজ্ঞা আমার। দয়া করো, দয়া করে
দেবীরে ফিরায়ে আনো শুধু, আজি এই
এক রাত্রি তরে। কোথা দেবী ?

রঘুপতি। কোথাও সে
নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।

গুণবতী। প্রভু,
এইখানে ছিল না কি দেবী ?

রঘুপতি। দেবী বল
তারে ? এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী,
তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী ? মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিষ্ফল রক্ত হৃদয় বিদারি
মূঢ় পাষাণের পদে ? দেবী বল তারে ?
পুণ্যরক্ত পান ক'রে সে মহারাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে।

গুণবতী। গুরুদেব, বধিয়ো না
মোরে। সত্য করে বলো আরবার। দেবী
নাই ?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই ?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই ?
তবে কে রয়েছে ?

রঘুপতি। কেহ নাই। কিছু নাই।

গুণবতী। নিয়ে যা, নিয়ে যা পূজা ! ফিরে যা, ফিরে যা !
বল্ শীঘ্র কোন্ পথে গেছে মহারাজ।

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পিতা!

রঘুপতি। জননী, জননী, জননী আমার!
পিতা! এ তো নহে ভর্ৎসনার নাম। পিতা!
মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা ব'লে
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া করে গেছে। আহা, ডাক আরবার!

অপর্ণা। পিতা, এস এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা।

পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী কই?

রঘুপতি। দেবী নাই।

গোবিন্দমাণিক্য। একি রক্তধারা!

রঘুপতি। এই শেষ পুণ্যরক্ত এ পাপ-মন্দিরে।
জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে
হিংসারক্তশিখা।

গোবিন্দমাণিক্য। ধন্য ধন্য জয়সিংহ,
এ পূজার পুষ্পাঞ্জলি সঁপিনু তোমারে।

গুণবতী। মহারাজ!

গোবিন্দমাণিক্য। প্রিয়তমে!

গুণবতী। আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা। [প্রণাম

গোবিন্দমাণিক্য। গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।

অপর্ণা। পিতা চলে এস !

রঘুপতি। পাষাণ ভাঙিয়া গেল— জননী আমার
এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা !
জননী অমৃতময়ী !

অপর্ণা পিতা, চলে এস !

উপন্যাস ও গল্প

রাজর্ষি

সূচনা

রাজর্ষি সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ পেয়েছি। বলবার বিশেষ কিছু নেই। এর প্রধান বক্তব্য এই যে, এ আমার স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস।

বালক পত্রের সম্পাদিকা আমাকে ঐ মাসিকের পাতে নিয়মিত পরিবেশনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফল হল এই যে, প্রায় একমাত্র আমিই হলুম তার ভোজের জোগানদার। একটু সময় পেলেই মনটা 'কী লিখি' 'কী লিখি' করতে থাকে।

রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন দেওঘরে। তাঁকে দেখতে যাব বলে বেরনো গেল। রাত্রে গাড়ির আলোটা বিশ্রামের ব্যাঘাত করবে বলে তার নিচেকার আবরণটা টেনে দিলুম। অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সহযাত্রীর মন তাতে প্রসন্ন হল না, ঢাকা খুলে দিলেন। জাগা অনিবার্য ভেবে একটা গল্পের প্লট মনে আনতে চেষ্টা করলুম। ঘুম এসে গেল। স্বপ্নে দেখলুম— একটা পাথরের মন্দির। ছোটো মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদাপাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়! কী বেদনা! বাপকে সে বার বার করুণস্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন! বাপ কোনোমতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠেই বললুম, গল্প পাওয়া গেল। এই স্বপ্নের বিবরণ 'জীবনস্মৃতি'তে পূর্বেই লিখেছি, পুনরুক্তি করতে হল। আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ। কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল।

বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। ফসল-খেতের যেখানে কিনারা সেদিকটাতে চাষ পড়ে নি, আগাছায় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। সাময়িক পত্রের অবিবেচনায় প্রায়ই লেখনীর জাত নষ্ট হয়। বিশেষ যেখানে শিশু পাঠকই লক্ষ্য সেখানে বাজে বাচালতার সংকোচ থাকে না। অল্পবয়সের ছেলেদেরও সম্মান রাখার দরকার আছে, এ কথা শিশুসাহিত্য-লেখকেরা প্রায় ভোলেন। সাহিত্যরচনায় গুণী-লেখনীর সতর্কতা যদি না থাকে, যদি সে রচনা বিনা লজ্জায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠে, তবে সেটা

অস্বাস্থ্যকর হবেই, বিশেষত ছেলেদের পাকযন্ত্রের পক্ষে। দুধের বদলে পিঠুলি-গোলা যদি ব্যাবসার খাতিরে চালাতেই হয় তবে সে ফাঁকি বরঞ্চ চালানো যেতে পারে বয়স্কদের পাত্রে, তাতে তাঁদের রুচির পরীক্ষা হবে ; কিন্তু ছেলেদের ভোগে নৈব নৈব চ।

রাজর্ষি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পাথরের ঘাট গোমতী নদীতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য একদিন গ্রীষ্মকালের প্রভাতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার ভাই নক্ষত্ররায়ও আসিয়াছেন। এমন সময়ে একটি ছোটো মেয়ে তাহার ছোটো ভাইকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘাটে আসিল। রাজার কাপড় টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মা, আমি তোমার সন্তান।"

মেয়েটি বলিল, "আমাকে পূজার ফুল পাড়িয়া দাও-না।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা চলো।"

অনুচরগণ অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা কহিল, "মহারাজ, আপনি কেন যাইবেন, আমরা পাড়িয়া দিতেছি।"

রাজা বলিলেন, "না, আমাকে যখন বলিয়াছে আমিই পাড়িয়া দিব।"

রাজা সেই মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেদিনকার বিমল উষার সঙ্গে তাহার মুখের সাদৃশ্য ছিল। রাজার হাত ধরিয়া যখন সে মন্দিরসংলগ্ন ফুলবাগানে বেড়াইতেছিল, তখন চারি দিকের শুভ্র বেলফুলগুলির মতো তাহার ফুট্‌ফুটে মুখখানি হইতে যেন একটি বিমল সৌরভের ভাব উত্থিত হইয়া প্রভাতের কাননে ব্যাপ্ত হইতেছিল। ছোটো ভাইটি দিদির কাপড় ধরিয়া দিদির সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছিল। সে কেবল একমাত্র দিদিকেই জানে, রাজার সঙ্গে তাহার বড়ো-একটা ভাব হইল না।

রাজা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী মা ?"

মেয়ে বলিল, "হাসি।"

রাজা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী ?"

ছেলেটি বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিছু উত্তর করিল না।

হাসি তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল, "বল্‌-না ভাই, আমার নাম তাতা।"

ছেলেটি তাহার অতি ছোটো দুইখানি ঠোঁট একটুখানি খুলিয়া গম্ভীরভাবে দিদির কথার প্রতিধ্বনির মতো বলিল, "আমার নাম তাতা।"

বলিয়া দিদির কাপড় আরও শক্ত করিয়া ধরিল।

হাসি রাজাকে বুঝাইয়া বলিল, "ও কিনা ছেলেমানুষ, তাই ওকে সকলে তাতা বলে।"

ছোটো ভাইটির দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আচ্ছা, বল্ দেখি মন্দির।"

ছেলেটি দিদির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "লদন্দ।"

হাসি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাতা মন্দির বলিতে পারে না, বলে লদন্দ।— আচ্ছা, বল্ দেখি কড়াই।"

ছেলেটি গম্ভীর হইয়া বলিল, "বলাই।"

হাসি আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাতা আমাদের কড়াই বলিতে পারে না, বলে বলাই।"

বলিয়া তাতাকে ধরিয়া চুমো খাইয়া খাইয়া অস্থির করিয়া দিল।

তাতা সহসা দিদির এত হাসি ও এত আদরের কোনোই কারণ খুঁজিয়া পাইল না, সে কেবল মস্ত চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। বাস্তবিকই মন্দির এবং কড়াই শব্দ উচ্চারণ সম্বন্ধে তাতার সম্পূর্ণ ত্রুটি ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না; তাতার বয়সে হাসি মন্দিরকে কখনোই লদন্দ বলিত না, সে মন্দিরকে বলিত পালু, আর সে কড়াইকে বলাই বলিত কি না জানি না কিন্তু কড়িকে বলিত ঘয়ি, সুতরাং তাতার এরূপ বিচিত্র উচ্চারণ শুনিয়া তাহার যে অত্যন্ত হাসি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী। তাতা সম্বন্ধে নানা ঘটনা সে রাজাকে বলিতে লাগিল। একবার একজন বুড়োমানুষ কম্বল জড়াইয়া আসিয়াছিল, তাতা তাহাকে ভাল্লুক বলিয়াছিল, এমনি তাতার মন্দবুদ্ধি। আর একবার তাতা গাছের আতাফলগুলিকে পাখি মনে করিয়া মোটা মোটা ছোটো দুটি হাতে তালি দিয়া তাহাদিগকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাতা যে হাসির চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ, ইহা তাতার দিদি বিস্তর উদাহরণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়া দিল। তাতা নিজের বুদ্ধির পরিচয়ের কথা সম্পূর্ণ অবিচলিতচিত্তে শুনিতেছিল, যতটুকু বুঝিতে পারিল তাহাতে ক্ষোভের কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। এইরূপে সেদিনকার সকালে ফুল তোলা শেষ হইল। ছোটো মেয়েটির আঁচল ভরিয়া যখন ফুল দিলেন তখন রাজার মনে হইল, যেন তাঁহার পূজা শেষ হইল; এই দুইটি সরল প্রাণের স্নেহের দৃশ্য দেখিয়া, এই পবিত্র হৃদয়ের আশ মিটাইয়া ফুল তুলিয়া দিয়া, তাঁহার যেন দেবপূজার কাজ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন হইতে ঘুম ভাঙিলে সূর্য উঠিলেও রাজার প্রভাত হইত না, ছোটো দুটি ভাইবোনের মুখ দেখিলে তবে তাঁহার প্রভাত হইত। প্রতিদিন তাহাদিগকে ফুল তুলিয়া দিয়া তবে তিনি স্নান করিতেন; দুই ভাইবোনে ঘাটে বসিয়া তাহার স্নান দেখিত। যেদিন সকালে এই দুটি ছেলেমেয়ে না আসিত, সেদিন তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিক যেন সম্পূর্ণ হইত না।

হাসি ও তাতার বাপ মা কেহ নাই। কেবল একটি কাকা আছে। কাকার নাম কেদারেশ্বর। এই দুটি ছেলেমেয়েই তাহার জীবনের একমাত্র সুখ ও সম্বল।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাতা এখন মন্দির বলিতে পারে, কিন্তু এখনও কড়াই বলিতে বলাই বলে। অধিক কথা সে কয় না। গোমতী নদীর ধারে নাগকেশর গাছের তলায় পা ছড়াইয়া তাহার দিদি তাহাকে যে-কোনো গল্পই করিত, সে তাহাই ড্যাবাড্যাবা চোখে অবাক হইয়া শুনিত। সে গল্পের কোনো মাথামুণ্ড ছিল না; কিন্তু সে যে কী বুঝিত সেই জানে; গল্প শুনিয়া সেই গাছের তলায়, সেই সূর্যের আলোতে, সেই মুক্ত সমীরণে, একটি ছোটো ছেলের ছোটো হৃদয়টুকুতে যে কত কথা কত ছবি উঠিত তাহা আমরা কী জানি। তাতা আর-কোনো ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, কেবল তাহার দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো বেড়াইত।

আষাঢ় মাস। সকাল হইতে ঘন মেঘ করিয়া রহিয়াছে। এখনও বৃষ্টি পড়ে নাই, কিন্তু বাদলা হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। দূরদেশের বৃষ্টির কণা বহিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। গোমতী নদীর জলে এবং গোমতী নদীর উভয় পারের অরণ্যে অন্ধকার আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে অমাবস্যা ছিল, কাল ভুবনেশ্বরীর পূজা হইয়া গিয়াছে।

যথাসময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন। একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেত প্রস্তরের ঘাটের সোপান বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কাল রাত্রে যে এক-শো-এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত।

হাসি সেই রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা একপ্রকার সংকোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের দাগ বাবা!"

রাজা বলিলেন, "রক্তের দাগ মা!"

সে কহিল, "এত রক্ত কেন!" এমন একপ্রকার কাতর স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল 'এত রক্ত কেন', যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, 'এত রক্ত কেন!' তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। বহুদিন ধরিয়া প্রতিবৎসর রক্তের স্রোত দেখিয়া আসিতেছেন, একটি ছোটো মেয়ের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল, 'এত রক্ত কেন!' তিনি উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। অন্য মনে স্নান করিতে করিতে ঐ প্রশ্নই ভাবিতে লাগিলেন।

হাসি জলে আঁচল ভিজাইয়া সিঁড়িতে বসিয়া ধীরে ধীরে রক্তের রেখা মুছিতে লাগিল, তাহার দেখাদেখি ছোটো হাত দুটি দিয়া তাতাও তাহাই করিতে লাগিল। হাসির আঁচলখানি রক্তে লাল হইয়া গেল। রাজার যখন স্নান হইয়া গেল, তখন দুই ভাইবোনে মিলিয়া রক্তের দাগ মুছিয়া ফেলিয়াছে।

সেইদিন বাড়ি ফিরিয়া গিয়া হাসির জ্বর হইল। তাতা কাছে বসিয়া দুটি ছোটো আঙুলে দিদির মুদ্রিত চোখের পাতা খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া মাঝে মাঝে ডাকিতেছে, "দিদি!" দিদি অমনি সচকিতে একটুখানি জাগিয়া উঠিতেছে। "কী তাতা" বলিয়া তাতাকে কাছে টানিয়া লইতেছে; আবার তাহার চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছে। তাতা অনেক ক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কোনো কথাই বলে না। অবশেষে অনেক ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া দিদির মুখের কাছে মুখ দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "দিদি, তুই উঠবি নে?" হাসি চমকিয়া জাগিয়া তাতাকে বুকে চাপিয়া কহিল, "কেন উঠব না ধন!" কিন্তু দিদির উঠিবার আর সাধ্য নাই। তাতার ক্ষুদ্র হৃদয় যেন অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া গেল। তাতার সমস্ত দিনের খেলাধুলা আনন্দের আশা একেবারে ম্লান হইয়া গেল। আকাশ অত্যন্ত অন্ধকার, ঘরের চালের উপর ক্রমাগতই বৃষ্টির শব্দ শুনা যাইতেছে, প্রাঙ্গণের তেঁতুল গাছ জলে ভিজিতেছে, পথে পথিক নাই। কেদারেশ্বর একজন বৈদ্যকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বৈদ্য নাড়ি টিপিয়া অবস্থা দেখিয়া ভালো বোধ করিল না।

তাহার পরদিন স্নান করিতে আসিয়া রাজা দেখিলেন, মন্দিরে দুইটি ভাইবোন তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই। মনে করিলেন, এই ঘোরতর বর্ষায় তাহারা আসিতে পারে নাই। স্নান-তর্পণ শেষ করিয়া শিবিকায় চড়িয়া বাহকদিগকে কেদারেশ্বরের কুটিরে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। অনুচরেরা সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল, কিন্তু রাজাজ্ঞার উপরে আর কথা কহিতে পারিল না।

রাজার শিবিকা প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিলে কুটিরে অত্যন্ত গোলযোগ পড়িয়া গেল।

সে গোলমালে রোগীর রোগের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। কেবল তাতা নড়িল না, সে অচেতন দিদির কোলের কাছে বসিয়া দিদির কাপড়ের এক প্রান্ত মুখের ভিতর পুরিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

রাজাকে ঘরে আসিতে দেখিয়া তাতা জিজ্ঞাসা করিল, "কী হয়েছে?"

উদ্বিগ্নহৃদয় রাজা কিছুই উত্তর দিলেন না। তাতা ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির নেগেছে?"

খুড়ো কেদারেশ্বর কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, "হাঁ, লেগেছে।"

অমনি তাতা দিদির কাছে গিয়া দিদির মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তোমার কোথায় নেগেছে?"

মনের অভিপ্রায় এই যে, সেই জায়গাটাতে ফুঁ দিয়া, হাত বুলাইয়া, দিদির সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দিবে। কিন্তু যখন দিদি কোনো উত্তর দিল না তখন তাহার আর সহ্য হইল না— ছোটো দুইটি ঠোঁট উত্তরোত্তর ফুলিতে লাগিল, অভিমানে কাঁদিয়া উঠিল। কাল হইতে বসিয়া আছে, একটি কথা নাই কেন! তাতা কী করিয়াছে যে, তাহার উপর এত অনাদর! রাজার সম্মুখে তাতার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া কেদারেশ্বর অত্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে বিরক্ত হইয়া তাতার হাত ধরিয়া অন্য ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। তবুও দিদি কিছু বলিল না।

রাজবৈদ্য আসিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গেল। রাজা সন্ধ্যাবেলায় আবার হাসিকে দেখিতে আসিলেন। তখন বালিকা প্রলাপ বকিতেছে। বলিতেছে, "মাগো, এত রক্ত কেন!"

রাজা কহিলেন, "মা, এ রক্তস্রোত আমি নিবারণ করিব।"

বালিকা বলিল, "আয় ভাই তাতা, আমরা দুজনে এ রক্ত মুছে ফেলি।"

রাজা কহিলেন, "আয় মা, আমিও মুছি।"

সন্ধ্যার কিছু পরেই হাসি একবার চোখ খুলিয়াছিল। একবার চারি দিকে চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিল। তখন তাতা অন্য ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কাহাকে যেন না দেখিতে পাইয়া হাসি চোখ বুজিল। চক্ষু আর খুলিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রাজার কোলে হাসির মৃত্যু হইল।

হাসিকে যখন চিরদিনের জন্য কুটির হইতে লইয়া গেল, তখন তাতা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইতেছিল। সে যদি জানিতে পাইত, তবে সেও বুঝি দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছায়াটির মতো চলিয়া যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজার সভা বসিয়াছে। ভুবনেশ্বরী-দেবী-মন্দিরের পুরোহিত কার্যবশত রাজদর্শনে আসিয়াছেন।

পুরোহিতের নাম রঘুপতি। এ দেশে পুরোহিতকে চোন্তাই বলিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজার চৌদ্দ দিন পরে গভীর রাত্রে চতুর্দশ দেবতার এক পূজা হয়। এই পূজার সময় এক দিন দুই রাত্রি কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না, রাজাও না। রাজা যদি বাহির হন, তবে চোন্তাইয়ের নিকটে তাঁহাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। প্রবাদ আছে, এই পূজার রাত্রে মন্দিরে নরবলি হয়। এই পূজা উপলক্ষে সর্বপ্রথমে যে-সকল পশু বলি হয়, তাহা রাজবাড়ির দান বলিয়া গৃহীত হয়। এই বলির পশু গ্রহণ করিবার জন্য চোন্তাই রাজসমীপে আসিয়াছেন। পূজার আর বারো দিন বাকি আছে।

রাজা বলিলেন, "এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না।"

সভাসুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের মাথার চুল পর্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল।

চোন্তাই রঘুপতি বলিলেন, "আমি এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

রাজা বলিলেন, "না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।"

রঘুপতি কহিলেন, "মা তবে এতদিন ধরিয়া জীবের রক্ত পান করিয়া আসিতেছেন কী করিয়া?"

রাজা কহিলেন, "না, পান করেন নাই। তোমরা যখন রক্তপাত করিতে তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।"

রঘুপতি বলিলেন, "মহারাজ, রাজকার্য আপনি ভালো বুঝেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পূজা সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত, আমিই আগে জানিতে পারিতাম।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "হাঁ, এ ঠিক কথা। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত, ঠাকুরমহাশয়ই আগে জানিতে পাইতেন।"

রাজা বলিলেন, "হৃদয় যার কঠিন হইয়া গিয়াছে, দেবীর কথা সে শুনিতে পায় না।"

নক্ষত্ররায় পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিলেন— ভাবটা এই যে, এ কথার একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক। রঘুপতি আগুন হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি পাষণ্ড নাস্তিকের মতো কথা কহিতেছেন "

নক্ষত্ররায় মৃদু প্রতিধ্বনির মতো বলিলেন, "হাঁ, নাস্তিকের মতো কথা কহিতেছেন।"

গোবিন্দমাণিক্য উদ্দীপ্তমূর্তি পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রাজসভায় বসিয়া আপনি মিথ্যা সময় নষ্ট করিতেছেন। মন্দিরের কাজ বহিয়া যাইতেছে, আপনি মন্দিরে যান। যাইবার সময় পথে প্রচার করিয়া দিবেন যে, আমার রাজ্যে যে ব্যক্তি দেবতার নিকট জীববলি দিবে তাহার নির্বাসনদণ্ড হইবে "

তখন রঘুপতি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পইতা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তবে তুমি উচ্ছন্ন যাও!"

চারি দিক হইতে হা-হা করিয়া সভাসদগণ পুরোহিতের উপর গিয়া পড়িলেন। রাজা ইঙ্গিতে সকলকে নিষেধ করিলেন, সকলে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি বলিতে লাগিলেন, "তুমি রাজা, তুমি ইচ্ছা করিলে প্রজার সর্বস্ব হরণ করিতে পারো, তাই বলিয়া তুমি মায়ের বলি হরণ করিবে! বটে! কী তোমার সাধ্য! আমি রঘুপতি মায়ের সেবক থাকিতে কেমন তুমি পূজার ব্যাঘাত কর দেখিব।"

মন্ত্রী রাজার স্বভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন। তিনি জানেন সংকল্প হইতে রাজাকে শীঘ্র বিচলিত করা যায় না। তিনি ধীরে ধীরে সভয়ে কহিলেন, "মহারাজ, আপনার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ বরাবর দেবীর নিকটে নিয়মিত বলি দিয়া আসিতেছেন। কখনো এক দিনের জন্য ইহার অন্যথা হয় নাই।"

মন্ত্রী থামিলেন।

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, "আজ এতদিন পরে আপনার পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাচীন পূজার ব্যাঘাত সাধন করিলে স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন। নক্ষত্ররায় বিজ্ঞতাসহকারে বলিলেন, "হাঁ, স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

মন্ত্রী আবার বলিলেন, "মহারাজ, এক কাজ করুন, যেখানে সহস্র বলি হইয়া থাকে সেখানে একশত বলির আদেশ করুন।"

সভাসদেরা বজ্রাহতের মতো অবাক হইয়া রহিল, গোবিন্দমাণিক্যও বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ পুরোহিত অধীর হইয়া সভা হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময়ে কেমন করিয়া প্রহরীদের হাত এড়াইয়া খালি-গায়ে খালি-পায়ে একটি ছোটো ছেলে সভায় প্রবেশ করিল। রাজসভার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রাজার মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায় ?"

বৃহৎ রাজসভার সমস্ত যেন সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দীর্ঘ গৃহে কেবল একটি ছেলের কণ্ঠধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল "দিদি কোথায়"।

রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া ছেলেকে কোলে করিয়া দৃঢ়স্বরে মন্ত্রীকে বলিলেন, "আজ হইতে আমার রাজ্যে বলিদান হইতে পারিবে না। ইহার উপর আর কথা কহিয়ো না।"

মন্ত্রী কহিলেন, "যে আজ্ঞে।"

তাতা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায় ?"

রাজা বলিলেন, "মায়ের কাছে।"

তাতা অনেক ক্ষণ মুখে আঙুল দিয়া চুপ করিয়া রহিল, একটা যেন ঠিকানা পাইল এমনি তাহার মনে হইল। আজ হইতে রাজা তাতাকে নিজের কাছে রাখিলেন। খুড়ো কেদারেশ্বর রাজবাড়িতে স্থান পাইল।

সভাসদেরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতে লাগিল, "এ যে মগের মুল্লুক হইয়া দাঁড়াইল। আমরা তো জানি বৌদ্ধ মগেরাই রক্তপাত করে না, অবশেষে আমাদের হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে নাকি !"

নক্ষত্ররায়ও তাহাদের মতে সম্পূর্ণ মত দিয়া কহিলেন, "হাঁ, শেষে হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে নাকি ?"

সকলেই ভাবিল, অবনতির লক্ষণ ইহা হইতে আর কী হইতে পারে ! মগে হিন্দুতে তফাত রহিল কী !

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভুবনেশ্বরী-দেবী-মন্দিরের ভৃত্য জয়সিংহ জাতিতে রাজপুত, ক্ষত্রিয়। তাঁহার বাপ সুচেতসিংহ ত্রিপুরার রাজবাটীর একজন পুরাতন ভৃত্য ছিলেন। সুচেতসিংহের মৃত্যুকালে জয়সিংহ নিতান্ত বালক ছিলেন। এই অনাথ বালককে রাজা মন্দিরের কাজে নিযুক্ত করেন। জয়সিংহ মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির দ্বারাই পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছেন। ছেলেবেলা হইতে মন্দিরে পালিত হইয়া জয়সিংহ মন্দিরকে গৃহের মতো ভালোবাসিতেন, মন্দিরের প্রত্যেক সোপান প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডের সহিত তাহার পরিচয় ছিল। তাঁহার মা ছিলেন না, ভুবনেশ্বরী প্রতিমাকেই তিনি মায়ের মতো দেখিতেন, প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া তিনি কথা কহিতেন, তাঁহার একলা বোধ হইত না। তাহার আরও সঙ্গী ছিল। মন্দিরের বাগানের অনেকগুলি গাছকে তিনি নিজের হাতে মানুষ করিয়াছেন। তাঁহার চারি দিকে প্রতিদিন তাঁহার গাছগুলি বাড়িতেছে, লতাগুলি জড়াইতেছে, শাখা পুষ্পিত হইতেছে, ছায়া বিস্তৃত হইতেছে, শ্যামল বল্লরীর পল্লবস্তবকে যৌবনগর্বে নিকুঞ্জ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জয়সিংহের এ-সকল প্রাণের কথা, ভালোবাসার কথা, বড়ো কেহ একটা জানিত না; তাঁহার বিপুল বল ও সাহসের জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

মন্দিরের কাজকর্ম শেষ করিয়া জয়সিংহ তাঁহার কুটিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিয়াছে। অত্যন্ত ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। নববর্ষার জলে জয়সিংহের গাছগুলি স্নান করিতেছে, বৃষ্টিবিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোটো ছোটো শত শত প্রবাহ ঘোলা হইয়া, কলকল করিয়া গোমতী নদীতে গিয়া পড়িতেছে— জয়সিংহ পরমানন্দে তাঁহার কাননের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। চারি দিকে মেঘের স্নিগ্ধ অন্ধকার, বনের ছায়া, ঘনপল্লবের শ্যামশ্রী, ভেকের কোলাহল, বৃষ্টির অবিশ্রাম ঝরঝর শব্দ— কাননের মধ্যে এইরূপ নববর্ষার ঘোরঘটা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে।

ভিজিতে ভিজিতে রঘুপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়সিংহ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পা ধুইবার জল ও শুকনো কাপড় আনিয়া দিলেন।

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কাপড় আনিতে কে কহিল ?"

বলিয়া কাপড়গুলা লইয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

জয়সিংহ পা ধুইবার জল লইয়া অগ্রসর হইলেন। রঘুপতি বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "থাক্ থাক্, তোমার ও জল রাখিয়া দাও।"

বলিয়া পা দিয়া জলের ঘটি ঠেলিয়া ফেলিলেন।

জয়সিংহ সহসা এরূপ ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইলেন। কাপড় ভূমি হইতে তুলিয়া যথাস্থানে রাখিতে উদ্যত হইলেন— রঘুপতি পুনশ্চ বিরক্তভাবে কহিলেন, "থাক্ থাক্, ও কাপড়ে তোমার হাত দিতে হইবে না।"

বলিয়া নিজে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিলেন। জল লইয়া পা ধুইলেন।

জয়সিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রভু, আমি কি কোনো অপরাধ করিয়াছি?"

রঘুপতি কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে কহিলেন, "কে বলিতেছে যে তুমি অপরাধ করিয়াছ?"

জয়সিংহ ব্যথিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রঘুপতি অস্থিরভাবে কুটিরের দাওয়ায় বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি অনেক হইল; ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অবশেষে রঘুপতি জয়সিংহের পিঠে হাত দিয়া কোমলস্বরে কহিলেন, "বৎস, শয়ন করিতে যাও, রাত্রি অনেক হইল।"

জয়সিংহ রঘুপতির স্নেহের স্বরে বিচলিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু আগে শয়ন করিতে যান, তার পরে আমি যাইব।"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার বিলম্ব আছে। দেখো পুত্র, তোমার প্রতি আমি আজ কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, কিছু মনে করিয়ো না। আমার মন ভালো ছিল না। সবিশেষ বৃত্তান্ত তোমাকে কাল প্রভাতে বলিব। আজ তুমি শয়ন করোগে।"

জয়সিংহ কহিলেন, "যে আজ্ঞে।"

বলিয়া শয়ন করিতে গেলেন। রঘুপতি সমস্ত রাত বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রভাতে জয়সিংহ গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন, "জয়সিং, মায়ের বলি বন্ধ হইয়াছে।"

জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সেকি কথা প্রভু!"

রঘুপতি। রাজার এইরূপ আদেশ।

জয়সিংহ। কোন্ রাজার?

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এখানে রাজা আবার কয় গণ্ডা আছে? মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আদেশ করিয়াছেন, মন্দিরে জীববলি হইতে পারিবে না।"

জয়সিংহ। নরবলি?

রঘুপতি। আঃ, কী উৎপাত! আমি বলিতেছি জীববলি, তুমি শুনিতেছ নরবলি।

জয়সিংহ। কোনো জীববলিই হইতে পারিবে না ?

রঘুপতি। না।

জয়সিংহ। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এইরূপ আদেশ করিয়াছেন ?

রঘুপতি। হাঁ গো, এক কথা কতবার বলিব !

জয়সিংহ অনেক ক্ষণ কিছুই বলিলেন না, কেবল আপন মনে বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য !' গোবিন্দমাণিক্যকে জয়সিংহ ছেলেবেলা হইতে দেবতা বলিয়া জানিতেন। আকাশের পূর্ণচন্দ্রের প্রতি শিশুদের যেমন একপ্রকার আসক্তি আছে, গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের সেইরূপ মনের ভাব ছিল। গোবিন্দমাণিক্যের প্রশান্ত সুন্দর মুখ দেখিয়া জয়সিংহ প্রাণ বিসর্জন করিতে পারিতেন।

রঘুপতি কহিলেন, "ইহার একটা তো প্রতিবিধান করিতে হইবে।"

জয়সিংহ কহিলেন, "তা অবশ্য। আমি মহারাজের কাছে যাই, তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলি —"

রঘুপতি। সে চেষ্টা বৃথা।

জয়সিংহ। তবে কী করিতে হইবে ?

রঘুপতি কিয়ংক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "সে কাল বলিব। কাল তুমি প্রভাতে কুমার নক্ষত্ররায়ের নিকটে গিয়া তাঁহাকে গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রভাতে নক্ষত্ররায় আসিয়া রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, কী আদেশ করেন ?"

রঘুপতি কহিলেন, "তোমার প্রতি মায়ের আদেশ আছে। আগে মাকে প্রণাম করিবে চলো।"

উভয়ে মন্দিরে গেলেন। জয়সিংহও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। নক্ষত্ররায় ভুবনেশ্বরী-প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে কহিলেন, "কুমার, তুমি রাজা হইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি রাজা হইব ? ঠাকুরমশায় যে কী বলেন তার ঠিক নাই।"

বলিয়া নক্ষত্ররায় অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি বলিতেছি তুমি রাজা হইবে "

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আপনি বলিতেছেন আমি রাজা হইব?"

বলিয়া রঘুপতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছি?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আপনি কি মিথ্যা কথা বলিতেছেন? সে কেমন করিয়া হইবে? দেখুন ঠাকুরমশায়, আমি কাল ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিয়াছি। আচ্ছা, ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিলে কী হয় বলুন দেখি।"

রঘুপতি হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "কেমনতরো ব্যাঙ বলো দেখি। তাহার মাথায় দাগ আছে তো?"

নক্ষত্ররায় সগর্বে কহিলেন, "তাহার মাথায় দাগ আছে বৈকি। দাগ না থাকিলে চলিবে কেন!"

রঘুপতি কহিলেন, "বটে! তবে তো তোমার রাজটিকা লাভ হইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "তবে আমার রাজটিকা লাভ হইবে! আপনি বলিতেছেন আমার রাজটিকা লাভ হইবে? আর যদি না হয়?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার কথা ব্যর্থ হইবে? বল কী!"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "না না, সে কথা হইতেছে না। আপনি কিনা বলিতেছেন আমার রাজটিকা লাভ হইবে, মনে করুন যদিই না হয়। দৈবাৎ কি এমন হয় না যে—"

রঘুপতি কহিলেন, "না না, ইহার অন্যথা হইবে না।"

নক্ষত্ররায়। ইহার অন্যথা হইবে না। আপনি বলিতেছেন, ইহার অন্যথা হইবে না। দেখুন ঠাকুরমশায়, আমি রাজা হইলে আপনাকে মন্ত্রী করিব।

রঘুপতি। মন্ত্রিত্বের পদে আমি পদাঘাত করি।

নক্ষত্ররায় উদারভাবে কহিলেন, "আচ্ছা, জয়সিংহকে মন্ত্রী করিব।"

রঘুপতি কহিলেন, "সে কথা পরে হইবে। রাজা হইবার আগে কী করিতে হইবে সেটা শোনো আগে। মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আমার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আপনার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে। এ তো বেশ কথা।"

রঘুপতি কহিলেন, "তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত আনিতে হইবে।"

নক্ষত্ররায় খানিকটা হাঁ করিয়া রহিলেন। এ কথাটা তত 'বেশ' বলিয়া মনে হইল না।

রঘুপতি তীব্রস্বরে কহিলেন "সহসা ভ্রাতৃস্নেহের উদয় হইল নাকি ?"

নক্ষত্ররায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "হাঃ হাঃ, ভ্রাতৃস্নেহ! ঠাকুরমশায় বেশ বলিলেন যা হোক, ভ্রাতৃস্নেহ!"

এমন মজার কথা, এমন হাসিবার কথা যেন আর হয় না। ভ্রাতৃস্নেহ! কী লজ্জার বিষয়! কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, নক্ষত্ররায়ের প্রাণের ভিতরে ভ্রাতৃস্নেহ জাগিতেছে, না হাসিয়া উড়াইবার জো নাই।

রঘুপতি কহিলেন, "তা হইলে কী করিবে বলো।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কী করিব বলুন।"

রঘুপতি। কথাটা ভালো করিয়া শোনো। তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।

নক্ষত্ররায় মন্ত্রের মতো বলিয়া গেলেন, "গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।"

রঘুপতি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "নাঃ, তোমার দ্বারা কিছু হইবে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কেন হইবে না? যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। আপনি তো আদেশ করিতেছেন?"

রঘুপতি। হাঁ, আমি আদেশ করিতেছি।

নক্ষত্ররায়। কী আদেশ করিতেছেন?

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মায়ের ইচ্ছা, তিনি রাজরক্ত দর্শন করিবেন। তুমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত দেখাইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে, এই আমার আদেশ।"

নক্ষত্ররায়। আমি আজই গিয়া ফতে খাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করিব।

রঘুপতি। না না, আর কোনো লোককে ইহার বিন্দুবিসর্গ জানাইয়ো না। কেবল জয়সিংহকে তোমার সাহায্যে নিযুক্ত করিব। কাল প্রাতে আসিয়ো, কী উপায়ে এ কার্য সাধন করিতে হইবে কাল বলিব।

নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাত এড়াইয়া বাঁচিলেন। যত শীঘ্র পারিলেন বাহির হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় চলিয়া গেলে জয়সিংহ কহিলেন, "গুরুদেব, এমন ভয়ানক কথা কখনো শুনি নাই। আপনি মায়ের সম্মুখে মায়ের নাম করিয়া ভাইকে দিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রস্তাব করিলেন, আর আমাকে তাই দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল!"

রঘুপতি বলিলেন, "আর কী উপায় আছে বলো।"

জয়সিংহ কহিলেন, "উপায়! কিসের উপায়!"

রঘুপতি। তুমিও যে নক্ষত্ররায়ের মতো হইলে দেখিতেছি। এতক্ষণ তবে কী শুনিলে?

জয়সিংহ। যাহা শুনিলাম তাহা শুনিবার যোগ্য নহে, তাহা শুনিলে পাপ আছে।

রঘুপতি। পাপপুণ্যের তুমি কী বুঝ?

জয়সিংহ। এতকাল আপনার কাছে শিক্ষা পাইলাম, পাপপুণ্যের কিছুই বুঝি না কি?

রঘুপতি। শোনো বৎস, তোমাকে তবে আর-এক শিক্ষা দিই। পাপপুণ্য কিছুই নাই। কেই বা পিতা, কেই বা ভ্রাতা, কেই বা কে? হত্যা যদি পাপ হয় তো সকল হত্যাই সমান। কিন্তু কে বলে হত্যা পাপ? হত্যা তো প্রতিদিনই হইতেছে। কেহ বা মাথায় একখণ্ড পাথর পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা বন্যায় ভাসিয়া গিয়া হত হইতেছে, কেহ বা মড়কের মুখে পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা মনুষ্যের ছুরিকাঘাতে হত হইতেছে। কত পিপীলিকা আমরা প্রত্যহ পদতলে দলন করিয়া যাইতেছি, আমরা তাহাদের অপেক্ষা এমনই কি বড়ো? এই-সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন-মৃত্যু খেলা বৈ তো নয়, মহাশক্তির মায়া বৈ তো নয়। কালরূপিণী মহামায়ার নিকটে প্রতিদিন এমন কত লক্ষকোটি প্রাণীর বলিদান হইতেছে— জগতের চতুর্দিক হইতে জীবশোণিতের স্রোত তাঁহার মহাখর্পরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। আমিই নাহয় সেই স্রোতে আর-একটি কণা যোগ করিয়া দিলাম। তাঁহার বলি তিনিই এক কালে গ্রহণ করিতেন, আমি নাহয় মাঝখানে থাকিয়া উপলক্ষ হইলাম।

তখন জয়সিংহ প্রতিমার দিকে ফিরিয়া কহিতে লাগিলেন, "এইজন্যই কি তোকে সকলে মা বলে মা? তুই এমন পাষাণী! রাক্ষসী, সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্পেষণ

করিয়া লইয়া উদরে পুরিবার জন্য তুই ওই লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছিস? স্নেহ প্রেম মমতা সৌন্দর্য ধর্ম সমস্তই মিথ্যা, সত্য কেবল তোর ওই অনন্ত রক্তত্ষা? তোরই উদর-পূরণের জন্য মানুষ মানুষের গলায় ছুরি বসাইবে, ভাই ভাইকে খুন করিবে, পিতাপুত্রে কাটাকাটি করিবে। নিষ্ঠুর, সত্যসত্যই এই যদি তোর ইচ্ছা তবে মেঘ রক্তবর্ষণ করে না কেন, করুণাস্বরূপিণী নদী রক্তস্রোত লইয়া রক্তসমুদ্রে গিয়া পড়ে না কেন? না না মা, তুই প্রকাশ করিয়া বল্ - এ শিক্ষা মিথ্যা, এ শাস্ত্র মিথ্যা — আমার মাকে মা বলে না, সন্তানরক্তপিপাসু রাক্ষসী বলে— এ কথা আমি সহিতে পারিব না।"

জয়সিংহের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল— তিনি নিজের কথা লইয়া নিজেই ভাবিতে লাগিলেন। এত কথা ইতিপূর্বে কখনো তাঁহার মনে হয় নাই, রঘুপতি যদি তাঁহাকে নূতন শাস্ত্র শিক্ষা দিতে না আসিতেন, তবে কখনোই তাঁহার এত কথা মনেই আসিত না।

রঘুপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তবে তো বলিদানের পালা একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।"

জয়সিংহ অতি শৈশবকাল হইতে প্রতিদিন বলিদান দেখিয়া আসিতেছেন। এই জন্য, মন্দিরে যে বলিদান কোনোকালে বন্ধ হইতে পারে কিম্বা বন্ধ হওয়া উচিত এ কথা কিছুতেই তাঁহার মনে লাগে না। এমন-কি এ কথা মনে করিতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগে। এইজন্য রঘুপতির কথার উত্তরে জয়সিংহ বলিলেন, "সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার অন্য কোনো অর্থ আছে। তাহাতে তো কোনো পাপ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভাইকে ভাই হত্যা করিবে! তাই বলিয়া মহারাজ গোবিন্দ-মাণিক্যকে— প্রভু, আপনার পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি, আমাকে প্রবঞ্চনা করিবেন না, সত্যই কি মা স্বপ্নে কহিয়াছেন— রাজরক্ত নহিলে তাঁর তৃপ্তি হইবে না?"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "সত্য নহিলে কি মিথ্যা কহিতেছি? তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস কর?"

জয়সিংহ রঘুপতির পদধূলি লইয়া কহিলেন, "গুরুদেবের প্রতি আমার বিশ্বাস শিথিল না হয় যেন। কিন্তু নক্ষত্ররায়েরও তো রাজকুলে জন্ম।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেবতাদের স্বপ্ন ইঙ্গিতমাত্র; সকল কথা শুনা যায় না, অনেকটা বুঝিয়া লইতে হয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি দেবীর অসন্তোষ হইয়াছে, অসন্তোষের সম্পূর্ণ কারণও জন্মিয়াছে। অতএব দেবী যখন রাজরক্ত চাহিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে, তাহা গোবিন্দমাণিক্যেরই রক্ত।"

জয়সিংহ কহিলেন, "তা যদি সত্য হয়, তবে আমিই রাজরক্ত আনিব— নক্ষত্র-রায়কে পাপে লিপ্ত করিব না।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেবীর আদেশ পালন করিতে কোনো পাপ নাই।"

জয়সিংহ। পুণ্য আছে তো প্রভু। সে পুণ্য আমিই উপার্জন করিব।

রঘুপতি কহিলেন, "তবে সত্য করিয়া বলি বৎস। আমি তোমাকে শিশুকাল হইতে পুত্রের অধিক যত্নে প্রাণের অধিক ভালোবাসিয়া পালন করিয়া আসিয়াছি, আমি তোমাকে হারাইতে পারিব না। নক্ষত্ররায় যদি গোবিন্দমাণিক্যকে বধ করিয়া রাজা হয়, তবে কেহ তাহাতে একটি কথা কহিবে না, কিন্তু তুমি যদি রাজার গায়ে হাত তোল তো তোমাকে আর আমি ফিরিয়া পাইব না।"

জয়সিংহ কহিলেন, "আমার স্নেহে— পিতা, আমি অপদার্থ— আমার স্নেহে তুমি একটি পিপীলিকারও হানি করিতে পাইবে না। আমার প্রতি স্নেহে তুমি যদি পাপে লিপ্ত হও, তবে তোমার সে স্নেহ আমি বেশিদিন ভোগ করিতে পারিব না, সে স্নেহের পরিণাম কখনোই ভালো হইবে না।"

রঘুপতি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা পরে হইবে। কাল নক্ষত্র-রায় আসিলে যা হয় একটা ব্যবস্থা হইবে।"

জয়সিংহ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমিই রাজরক্ত আনিব। মায়ের নামে গুরুদেবের নামে ভ্রাতৃহত্যা ঘটিতে দিব না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জয়সিংহের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। গুরুর সহিত যে কথা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তাহার শাখাপ্রশাখা বাহির হইতে লাগিল। অধিকাংশ সময়েই আরম্ভ আমাদের আয়ত্ত, শেষ আমাদের আয়ত্ত নহে। চিন্তা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জয়সিংহের মনে অনিবার্য বেগে এমন-সকল কথা উঠিতে লাগিল যাহা তাঁহার আশৈশব বিশ্বাসের মূলে অবিশ্রাম আঘাত করিতে লাগিল। জয়সিংহ পীড়িত ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন।

কিন্তু দুঃস্বপ্নের মতো ভাবনা কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে চায় না। যে দেবীকে জয়সিংহ এতদিন মা বলিয়া জানিতেন, গুরুদেব আজ কেন তাঁহার মাতৃত্ব অপহরণ করিলেন, কেন তাঁহাকে হৃদয়হীন শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন? শক্তির সন্তোষই

কী, আর অসন্তোষই বা কী? শক্তির চক্ষুই বা কোথায়, কর্ণই বা কোথায়? শক্তি তো মহারথের ন্যায় তাহার সহস্র চক্রের তলে জগৎ কর্ষিত করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া কে চলিল, তাহার তলে পড়িয়া কে চূর্ণ হইল, তাহার উপরে উঠিয়া কে উৎসব করিতেছে, তাহার নিম্নে পড়িয়া কে আর্তনাদ করিতেছে, সে তাহার কী জানিবে? তাহার সারথি কি কেহ নাই? পৃথিবীর নিরীহ অসহায় ভীরু জীবদিগের রক্ত বাহির করিয়া কালরূপিণী নিষ্ঠুর শক্তির তৃষা নিবারণ করিতে হইবে এই কি আমার ব্রত! কেন? সে তো আপনার কাজ আপনিই করিতেছে— তাহার দুর্ভিক্ষ আছে, বন্যা আছে, ভূমিকম্প আছে, জরা মারী অগ্নিদাহ আছে, নির্দয়মানবহৃদয়স্থিত হিংসা আছে– ক্ষুদ্র আমাকে তাহার আবশ্যক কী!

তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল তাহা অতি মনোহর প্রভাত। বৃষ্টি শেষ হইয়াছে। পূর্বদিকে মেঘ নাই। সূর্যকিরণ যেন বর্ষার জলে ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টিবিন্দু ও সূর্যকিরণে দশ দিক ঝলমল করিতেছে। শুভ্র আনন্দপ্রভা আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে নদীস্রোতে বিকশিত শ্বেত শতদলের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশে চিল ভাসিয়া যাইতেছে— ইন্দ্রধনুর তোরণের নীচে দিয়া বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে। কাঠবিড়ালিরা গাছে গাছে ছুটাছুটি করিতেছে। দুই-একটি অতি ভীরু খরগোস সচকিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার আড়াল খুঁজিতেছে। ছাগশিশুরা অতি দুর্গম পাহাড়ে উঠিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। গোরু-গুলি আজ মনের আনন্দে মাঠ-ময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে। কলস-কক্ষ মায়ের আঁচল ধরিয়া আজ ছেলেমেয়েরা বাহির হইয়াছে। বৃদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, কলকল স্বরে তাহারা গল্প করিতেছে। নদীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই। আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

জয়সিংহ প্রতিমার দিকে চাহিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "কেন মা, আজ এমন অপ্রসন্ন কেন? একদিন তোমার জীবের রক্ত তুমি দেখিতে পাও নাই বলিয়া এত ভ্রূকুটি! আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখো, ভক্তির কি কিছু অভাব দেখিতেছ? ভক্তের হৃদয় পাইলেই কি তোমার তৃপ্তি হয় না, নিরপরাধের শোণিত চাই? আচ্ছা মা, সত্য করিয়া বল্ দেখি, পুণ্যের-শরীর গোবিন্দমাণিক্যকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিয়া এখানে

দানবের রাজত্ব স্থাপন করাই কি তোর অভিপ্রায়? রাজরক্ত কি নিতান্তই চাই? তোর মুখের উত্তর না শুনিলে আমি কখনোই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, আমি ব্যাঘাত করিব। বল্‌, হাঁ কি না।"

সহসা বিজন মন্দিরে শব্দ উঠিল, "হাঁ।"

জয়সিংহ চমকিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, মনে হইল যেন ছায়ার মতো কী একটা কাঁপিয়া গেল। স্বর শুনিয়া প্রথমেই তাঁহার মনে হইয়াছিল, যেন তাঁর গুরুর কণ্ঠস্বর। পরে মনে করিলেন, মা তাঁহাকে তাঁহার গুরুর কণ্ঠস্বরেই আদেশ করিলেন ইহাই সম্ভব। তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সশস্ত্রে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গোমতী নদীর দক্ষিণ দিকের এক স্থানের পাড় অতিশয় উচ্চ। বর্ষার ধারা ও ছোটো ছোটো স্রোত এই উন্নত ভূমিকে নানা গুহাগহ্বরে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার কিছু দূরে প্রায় অর্ধচন্দ্রাকারে বড়ো বড়ো শাল ও গাম্ভারি গাছে এই শতধা-বিদীর্ণ ভূমিখণ্ডকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু মাঝখানের এই জমিটুকুর মধ্যে বড়ো গাছ একটিও নাই। কেবল স্থানে স্থানে টিপির উপর ছোটো ছোটো শাল গাছ বাড়িতে পারিতেছে না, বাঁকিয়া কালো হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তর পাথর ছড়ানো। এক-হাত দুই-হাত প্রশস্ত ছোটো ছোটো জলস্রোত কত শত আঁকাবাঁকা পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, মিলিয়া, বিভক্ত হইয়া, নদীতে গিয়া পড়িতেছে। এই স্থান অতি নির্জন— এখানকার আকাশ গাছের দ্বারা অবরুদ্ধ নহে। এখান হইতে গোমতী নদী এবং তাহার পরপারের বিচিত্রবর্ণ শস্যক্ষেত্রসকল অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। প্রতিদিন প্রাতে রাজা গোবিন্দমাণিক্য এইখানে বেড়াইতে আসিতেন, সঙ্গে একটি সঙ্গী বা একটি অনুচরও আসিত না। জেলেরা কখনো কখনো গোমতীতে মাছ ধরিতে আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইত, তাহাদের সৌম্যমূর্তি রাজা যোগীর ন্যায় স্থিরভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখে প্রভাতের জ্যোতি কি তাঁহার আত্মার জ্যোতি বুঝা যাইত না। আজকাল বর্ষার দিনে প্রতিদিন এখানে আসিতে পারিতেন না, কিন্তু বর্ষা-উপশমে যেদিন আসিতেন সেদিন ছোটো তাতাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেন।

তাতাকে আর তাতা বলিতে ইচ্ছা করে না। একমাত্র যাহার মুখে তাতা সম্বোধন মানাইত সে তো আর নাই। পাঠকের কাছে তাতা শব্দের কোনো অর্থই নাই। কিন্তু হাসি যখন সকালবেলায় শালবনে, দুষ্টুমি করিয়া শালগাছের আড়ালে লুকাইয়া, তাহার সুমিষ্ট তীক্ষ্ণ স্বরে তাতা বলিয়া ডাকিত এবং তাহার উত্তরে গাছে গাছে দোয়েল ডাকিয়া উঠিত, দূর কানন হইতে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিত, তখন সেই তাতা শব্দ অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া কানন ব্যাপ্ত করিত-- তখন সেই তাতা সম্বোধন একটি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অতি কোমল স্নেহনীড় পরিত্যাগ করিয়া পাখির মতো স্বর্গের দিকে উড়িয়া যাইত – তখন সেই একটি স্নেহসিক্ত মধুর সম্বোধন প্রভাতের সমুদয় পাখির গান লুটিয়া লইত -- প্রভাত-প্রকৃতির আনন্দময় সৌন্দর্যের সহিত একটি ক্ষুদ্র বালিকার আনন্দময় স্নেহের ঐক্য দেখাইয়া দিত। এখন সে বালিকা নাই-- বালকটি আছে, কিন্তু তাতা নাই। বালকটি এ সংসারের সহস্র লোকের, সহস্র বিষয়ের, কিন্তু তাতা কেবলমাত্র সেই বালিকারই। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এই বালককে ধ্রুব বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও তাহাই বলিয়া ডাকিব।

মহারাজ পূর্বে একা গোমতীতীরে আসিতেন, এখন ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া আনেন। তাহার পবিত্র সরল মুখচ্ছবিতে তিনি দেবলোকের ছায়া দেখিতে পান। মধ্যাহ্নে সংসারের আবর্তের মধ্যে রাজা যখন প্রবেশ করেন তখন বৃদ্ধ বিজ্ঞ মন্ত্রীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, তাঁহাকে পরামর্শ দেয়। আর প্রভাত হইলে একটি শিশু তাঁহাকে সংসারের বাহিরে লইয়া আসে-- তাহার বড়ো বড়ো দুটি নীরব চক্ষুর সম্মুখে বিষয়ের সহস্র কুটিলতা সংকুচিত হইয়া যায়-- শিশুর হাত ধরিয়া মহারাজ বিশ্বজগতের মধ্যবর্তী অনন্তের দিকে প্রসারিত একটি উদার সরল বিস্তৃত রাজপথে গিয়া দাঁড়ান; সেখানে অনন্ত সুনীল আকাশ-চন্দ্রাতপের-নিম্ন-স্থিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাসভা দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোক সপ্তলোকের সংগীতের আভাস শুনা যায়; সেখানে সরল পথে সকলই সরল সহজ শোভন বলিয়া বোধ হয়, কেবলই অগ্রসর হইতে উৎসাহ হয়, উৎকট ভাবনা-চিন্তা অসুখ-অশান্তি দূর হইয়া যায়। মহারাজ সেই প্রভাতে, নির্জনে বনের মধ্যে, নদীর তীরে, মুক্ত আকাশে একটি শিশুর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া অসীম প্রেমসমুদ্রের পথ দেখিতে পান।

গোবিন্দমাণিক্য ধ্রুবকে কোলে করিয়া লইয়া তাহাকে ধ্রুবোপাখ্যান শুনাইতেছেন; সে যে বড়ো একটা কিছু বুঝিতেছে তাহা নহে, কিন্তু রাজার ইচ্ছা ধ্রুবের মুখে আধো-আধো স্বরে এই ধ্রুবোপাখ্যান আবার ফিরিয়া শুনেন।

গল্প শুনিতে শুনিতে ধ্রুব বলিল, "আমি বনে যাব।"

রাজা বলিলেন, "কী করতে বনে যাবে ?"

ধ্রুব বলিল, "হয়িকে দেখতে যাব।"

রাজা বলিলেন, "আমরা তো বনে এসেছি, হরিকে দেখতে এসেছি।"

ধ্রুব। হয়ি কোথায় ?

রাজা। এইখানেই আছেন।

ধ্রুব কহিল, "দিদি কোথায় ?"

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল— তাহার মনে হইল, দিদি যেন আগেকার মতো পিছন হইতে সহসা তাহার চোখ টিপিবার জন্য আসিতেছে। কাহাকেও না পাইয়া ঘাড় নামাইয়া চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায় ?"

রাজা কহিলেন, "হরি তোমার দিদিকে ডেকে নিয়েছেন।"

ধ্রুব কহিল, "হয়ি কোথায় ?"

রাজা কহিলেন, "তাঁকে ডাকো বৎস। তোমাকে সেই যে শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছিলেম সেইটে বলো।"

ধ্রুব দুলিয়া দুলিয়া বলিতে লাগিল—

হরি তোমায় ডাকি— বালক একাকী,
আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাই হে।
সদা মনে হয় কী করি কী করি,
কখন আসিবে কাল-বিভাবরী,
তাই ভয়ে মরি ডাকি 'হরি হরি'—
হরি বিনা কেহ নাই হে।
নয়নের জল হবে না বিফল,
তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল,
সেই আশা মনে করেছি সম্বল—
বেঁচে আছি আমি তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তোমার আঁখিতারা,
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা,
ধ্রুব তোমায় চাহে তুমি ধ্রুবতারা—
আর কার পানে চাই হে।

'র'য়ে 'ল'য়ে 'ড'য়ে 'দ'য়ে উলটপালট করিয়া, অর্ধেক কথা মুখের মধ্যে রাখিয়া, অর্ধেক কথা উচ্চারণ করিয়া, ধ্রুব দুলিয়া দুলিয়া সুধাময় কণ্ঠে এই শ্লোক পাঠ করিল। শুনিয়া রাজার প্রাণ আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল, প্রভাত দ্বিগুণ মধুর হইয়া উঠিল, চারি দিকে নদী-কানন তরুলতা হাসিতে লাগিল। কনকসুধাসিক্ত নীলাকাশে তিনি কাহার অনুপম সুন্দর সহাস্য মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন। ধ্রুব যেমন তাঁহার কোলে বসিয়া আছে— তাঁহাকেও তেমনি কে যেন বাহুপাশের মধ্যে, কোলের মধ্যে তুলিয়া লইল। তিনি আপনাকে, আপনার চারি দিকের সকলকে, বিশ্বচরাচরকে কাহার কোলের উপর দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আনন্দ ও প্রেম সূর্যকিরণের ন্যায় দশ দিকে বিকিরিত হইয়া আকাশ পূর্ণ করিল।

এমন সময় সশস্ত্র জয়সিংহ গুহাপথ দিয়া সহসা রাজার সম্মুখে আসিয়া উত্থিত হইলেন।

রাজা তাঁহাকে দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন; কহিলেন, "এস জয়সিংহ, এস।"

রাজা তখন শিশুর সহিত মিশিয়া শিশু হইয়াছেন, তাঁহার রাজমর্যাদা কোথায়।

জয়সিংহ রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কহিলেন, "মহারাজ, এক নিবেদন আছে।"

রাজা কহিলেন, "কী বলো।"

জয়সিংহ। মা, আপনার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন।

রাজা। কেন, আমি তাঁর অসন্তোষের কাজ কী করিয়াছি?

জয়সিংহ। মহারাজ বলি বন্ধ করিয়া দেবীর পূজার ব্যাঘাত করিয়াছেন।

রাজা বলিয়া উঠিলেন, "কেন জয়সিংহ, কেন এ হিংসার লালসা! মাতৃক্রোড়ে সন্তানের রক্তপাত করিয়া তুমি মাকে প্রসন্ন করিতে চাও!"

জয়সিংহ ধীরে ধীরে রাজার পায়ের কাছে বসিলেন। ধ্রুব তাঁহার তলোয়ার লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

জয়সিংহ কহিলেন, "কেন মহারাজ, শাস্ত্রে তো বলিদানের ব্যবস্থা আছে।"

রাজা কহিলেন, "শাস্ত্রের যথার্থ বিধি কেই বা পালন করে। আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে সকলেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। যখন দেবীর সম্মুখে বলির সকর্দম রক্ত সর্বাঙ্গে মাখিয়া সকলে উৎকট চীৎকারে ভীষণ উল্লাসে প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে থাকে, তখন কি তাহারা মায়ের পূজা করে, না নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে হিংসারাক্ষসী আছে সেই রাক্ষসীটার পূজা করে! হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।"

জয়সিংহ অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কল্য রাত্রি হইতে তাঁহার মনেও এমন অনেক কথা তোলপাড় হইয়াছে।

অবশেষে বলিলেন, "আমি মায়ের স্বমুখে শুনিয়াছি— এ বিষয়ে আর কোনো সংশয় থাকিতে পারে না। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি মহারাজের রক্ত চান।"

বলিয়া জয়সিংহ প্রভাতের মন্দিরের ঘটনা রাজাকে বলিলেন।

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "এ তো মায়ের আদেশ নয়, এ রঘুপতির আদেশ। রঘুপতিই অন্তরাল হইতে তোমার কথার উত্তর দিয়াছিলেন।"

রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া জয়সিংহ একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনেও এইরূপ সংশয় একবার চকিতের মতো উঠিয়াছিল, কিন্তু আবার বিদ্যুতের মতো অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজার কথায় সেই সন্দেহে আবার আঘাত লাগিল।

জয়সিংহ অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না মহারাজ আমাকে ক্রমাগত সংশয় হইতে সংশয়ান্তরে লইয়া যাইবেন না— আমাকে তীর হইতে ঠেলিয়া সমুদ্রে ফেলিবেন না— আপনার কথায় আমার চারি দিকের অন্ধকার কেবল বাড়িতেছে। আমার যে বিশ্বাস, যে ভক্তি ছিল, তাই থাক্— তাহার পরিবর্তে এ কুয়াশা আমি চাই না। মায়ের আদেশই হউক আর গুরুর আদেশই হউক, সে একই কথা— আমি পালন করিব।" বলিয়া বেগে উঠিয়া তাঁহার তলোয়ার খুলিলেন— তলোয়ার রৌদ্রকিরণে বিদ্যুতের মতো চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া ধ্রুব ঊর্ধ্বস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, তাহার ছোটো দুইটি হাতে রাজাকে জড়াইয়া রাজাকে প্রাণপণে আচ্ছাদন করিয়া ধরিল— রাজা জয়সিংহের প্রতি লক্ষ না করিয়া ধ্রুবকেই বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

জয়সিংহ তলোয়ার দূরে ফেলিয়া দিলেন। ধ্রুবের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কোনো ভয় নেই বৎস, কোনো ভয় নেই। আমি এই চলিলাম, তুমি ওই মহৎ আশ্রয়ে থাকো, ওই বিশাল বক্ষে বিরাজ করো— তোমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করিবে না।"

বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

সহসা আবার কী ভাবিয়া ফিরিয়া কহিলেন, "মহারাজকে সাবধান করিয়া দিই, আপনার ভ্রাতা নক্ষত্ররায় আপনার বিনাশের পরামর্শ করিয়াছেন। ২৯শে আষাঢ় চতুর্দশ দেবতার পূজার রাত্রে আপনি সতর্ক থাকিবেন।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "নক্ষত্র কোনোমতেই আমাকে বধ করিতে পারিবে না, সে আমাকে ভালোবাসে।"

জয়সিংহ বিদায় হইয়া গেলেন।

রাজা ধ্রুবের দিকে চাহিয়া ভক্তিভাবে কহিলেন, "তুমিই আজ রক্তপাত হইতে ধরণীকে রক্ষা করিলে, সেই উদ্দেশেই তোমার দিদি তোমাকে রাখিয়া গিয়াছেন।"

বলিয়া ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত দুইটি কপোল মুছাইয়া দিলেন।

ধ্রুব গম্ভীর মুখে কহিল, "দিদি কোথায় ?"

এমন সময়ে মেঘ আসিয়া সূর্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, নদীর উপর কালো ছায়া পড়িল। দূরের বনান্ত মেঘের মতোই কালো হইয়া উঠিল। বৃষ্টিপাতের লক্ষণ দেখিয়া রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মন্দির অনেক দূরে নয়। কিন্তু জয়সিংহ বিজন নদীর ধার দিয়া অনেক ঘুরিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে চলিলেন। বিস্তর ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। এক জায়গায় নদীর তীরে গাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, অথচ সংশয় যাইতেছে না। আজ হইতে কেই বা আমার সংশয় ঘুচাইবে! কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ আজ হইতে কে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে! সংসারের সহস্র কোটি পথের মোহানায় দাঁড়াইয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব কোন্‌টা যথার্থ পথ! প্রান্তরের মধ্যে আমি অন্ধ একাকী দাঁড়াইয়া আছি, আজ আমার যষ্টি ভাঙিয়া গেছে।'

জয়সিংহ যখন উঠিলেন তখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। দেখিলেন বিস্তর লোক কোলাহল করিতে করিতে মন্দিরের দিক হইতে দল বাঁধিয়া চলিয়া আসিতেছে।

বুড়া বলিতেছে, "বাপ-পিতামহর কাল থেকে এই তো চলে আসছে জানি, আজ রাজার বুদ্ধি কি তাঁদের সকলকেই ছাড়িয়ে উঠল!"

যুবা বলিতেছে, "এখন আর মন্দিরে আসতে ইচ্ছে করে না, পুজোর সে ধুম নেই।"

কেহ বলিল, "এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে দাঁড়ালো।"

তাহার মনের ভাব এই যে, বলিদান সম্বন্ধে দ্বিধা একজন মুসলমানের মনেই জন্মাইতে পারে, কিন্তু একজন হিন্দুর মনে জন্মানো অত্যন্ত আশ্চয।

মেয়েরা বলিতে লাগিল, "এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।"

একজন কহিল, "পুরুত-ঠাকুর তো স্বয়ং বললেন যে, মা স্বপ্নে বলেছেন তিন মাসের মধ্যে এ দেশ মড়কে উচ্ছন্ন যাবে।"

হারু বলিল, "এই দেখো-না কেন, মোধো আজ দেড় বছর ধরে ব্যামো ভুগে বরাবর বেঁচে এসেছে, যেই বলি বন্ধ হল অমনি সে মারা গেল।"

ক্ষান্ত বলিল, "তা কেন, আমার ভাশুরপো, সে যে মরবে এ কে জানত। তিন দিনের জ্বর। যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উলটে গেল।"

ভাশুরপোর শোকে এবং রাজ্যের অমঙ্গল-আশঙ্কায় ক্ষান্ত কাতর হইয়া পড়িল।

তিনকড়ি কহিল, "সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগল, একখানা চালাও বাকি রইল না।"

চিন্তামণি চাষা তাহার একজন সঙ্গী চাষাকে কহিল, "অত কথায় কাজ কী, দেখো-না কেন এ বছর যেমন ধান সস্তা হয়েছে এমন অন্য কোনো বছর হয় নি। এ বছর চাষার কপালে কী আছে কে জানে।"

বলিদান বন্ধ হইবার পরে এবং পূর্বেও যাহার যাহা-কিছু ক্ষতি হইয়াছে, সর্বসম্মতিক্রমে ওই বলি বন্ধ হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ নির্দিষ্ট হইল। এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভালো, এইরূপ সকলের মত হইল। এ মত কিছুতেই পরিবর্তিত হইল না বটে, কিন্তু দেশেই সকলে বাস করিতে লাগিল।

জয়সিংহ অন্যমনস্ক ছিলেন। ইহাদের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া তিনি মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, পূজা শেষ করিয়া রঘুপতি মন্দিরের বাহিরে বসিয়া আছেন।

দ্রুতগতি রঘুপতির নিকটে গিয়াই জয়সিংহ কাতর অথচ দৃঢ় স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, মায়ের আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আজ প্রভাতে আমি যখন মাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কেন তাহার উত্তর দিলেন ?"

রঘুপতি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন. "মা তো আমার দ্বারাই তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন, তিনি নিজমুখে কিছু বলেন না।"

জয়সিংহ কহিলেন, "আপনি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন না কেন ? অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাকে ছলনা করিলেন কেন ?"

রঘুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "চুপ করো। আমি কী ভাবিয়া কী করি তুমি তাহার কী বুঝিবে ? বাচালের মতো যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়ো না। আমি যাহা আদেশ করিব তুমি কেবল তাহাই পালন করিবে, কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না।"

জয়সিংহ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সংশয় বাড়িল বৈ কমিল না। কিছু ক্ষণ পরে বলিলেন, "আজ প্রাতে আমি মায়ের কাছে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যদি স্বমুখে আমাকে আদেশ না করেন তবে আমি কখনোই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, তাহার ব্যাঘাত করিব। যখন স্থির বুঝিলাম মা আদেশ করেন নাই, তখন মহারাজের নিকট নক্ষত্ররায়ের সংকল্প প্রকাশ করিয়া দিতে হইল, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলাম।"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উদ্‌বেল ক্রোধ দমন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মন্দিরে প্রবেশ করো।"

উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করো— বলো যে, ২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।"

জয়সিংহ ঘাড় হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে একবার গুরুর মুখের দিকে একবার প্রতিমার মুখের দিকে চাহিলেন। প্রতিমা স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।"

দশম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ নিয়মিত রাজকার্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সূর্যালোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন। অন্যদিন রাজসভায় নক্ষত্র-রায় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার শরীর অসুস্থ। রাজা স্বয়ং নক্ষত্ররায়ের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া কাজে ব্যস্ত আছেন এমনি ভান করিলেন। রাজা বলিলেন, "নক্ষত্র, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

নক্ষত্র কাগজের এপিঠ ওপিঠ উল্‌টাইয়া হাতের অঙ্গুরি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "অসুখ? না, অসুখ ঠিক নয়— এই একটুখানি কাজ ছিল— হাঁ হাঁ, অসুখ হয়েছিল— কতকটা অসুখের মতন বটে।"

নক্ষত্ররায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, গোবিন্দমাণিক্য অতিশয় বিষণ্ণমুখে

নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন— 'হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মতো লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই, শেষে কি মানুষও মানুষকে ভয় করিবে, ভাইও ভাইয়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পাইবে না। এ সংসারে হিংসা-লোভই এত বড়ো হইয়া উঠিল, আর স্নেহ-প্রেম কোথাও ঠাঁই পাইল না! এই আমার ভাই, ইহার সহিত প্রতিদিন এক গৃহে বাস করি, একাসনে বসিয়া থাকি, হাসিমুখে কথা কই— এও আমার পাশে বসিয়া মনের মধ্যে ছুরি শানাইতেছে।' গোবিন্দমাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মতো বোধ হইতে লাগিল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারি দিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ মনে করিলেন, 'এই স্নেহপ্রেমহীন হানাহানির রাজ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া আমি আমার স্বজাতির, আমার ভাইদের, মনে কেবলই হিংসা লোভ ও দ্বেষের অনল জ্বালাইতেছি— আমার সিংহাসনের চারি দিকে আমার প্রাণাধিক আত্মীয়েরা আমার দিকে চাহিয়া মনে মনে মুখ বক্র করিতেছে, দন্ত ঘর্ষণ করিতেছে, শৃঙ্খলবদ্ধ ভীষণ কুক্কুরের মতো চারি দিক হইতে আমার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার অবসর খুঁজিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইহাদের খরনখরাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া, ইহাদের রক্তের তৃষা মিটাইয়া এখান হইতে অপসৃত হওয়াই ভালো।'

প্রভাত-আকাশে গোবিন্দমাণিক্য যে প্রেমমুখচ্ছবি দেখিয়াছিলেন তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নক্ষত্র, আজ অপরাহ্নে গোমতী-তীরের নির্জন অরণ্যে আমরা দুইজনে বেড়াইতে যাইব।"

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিল না, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহারই মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়াছিলেন— সেখানে অন্ধকার গর্তের মধ্যে যে ভাবনাগুলো কীটের মতো কিল্‌বিল্ করিতেছিল, সেগুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ভয়ে নক্ষত্ররায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন— দেখিলেন তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ণ শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখামাত্র নাই। মানবহৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। তখনো মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া

মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনো সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে— কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে, কিন্তু দুই-একটা চিল এখনো আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে— তাহারা একটি কথা কহে না, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু পর্যন্তও শোনে; তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্থিত অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যের সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্র-রায়ের পা যেন আর উঠে না চারি দিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল; নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল; ভীষণ অদৃষ্টের মতো নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন কিছুই ঠাহর পাইলেন না। নিশ্চয় মনে করিলেন, রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন, এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্ররায় ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু মনে হইল কে যেন তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মতো আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, "দাঁড়াও!"

নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল— সেই মুহূর্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল— নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই। কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেক ক্ষণ ধরিয়া যেন গম্‌ গম্‌ করিতে লাগিল— সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন তড়িৎপ্রবাহের মতো বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল; অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতোই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও?"

নক্ষত্র বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না।

রাজা কহিলেন, "কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর রাজা কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শতসহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো— এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে সে তো দস্যু— সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোনো রাজচ্ছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলংকার করিয়া পরে, তাহার ভূমিবিস্তৃত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্ন কন্থা। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়।"

গোবিন্দমাণিক্য থামিলেন। চারি দিকে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায় মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মহারাজ খাপ হইতে তরবারি খুলিলেন। নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, এখানে লোক নাই, সাক্ষ্য নাই, কেহ নাই— ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চায় তবে তাহার স্থান এই, সময় এই। এখানে কেহ তোমাকে নিবারণ করিবে না, কেহ তোমাকে নিন্দা করিবে না। তোমার শিরায় আর আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে, একই পিতা একই পিতামহের রক্ত— তুমি সেই রক্তপাত করিতে চাও করো, কিন্তু মনুষ্যের আবাসস্থলে করিয়ো না। কারণ, যেখানে এই রক্তের বিন্দু পড়িবে, সেইখানেই অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। পাপের শেষ কোথায় গিয়া হয় কে জানে। পাপের একটি বীজ যেখানে পড়ে সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়া সহস্র বৃক্ষ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সুশোভন মানবসমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া যায় তাহা কেহ জানিতে পারে না। অতএব নগরে গ্রামে যেখানে নিশ্চিন্তচিত্তে পরমস্নেহে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করিয়া

আছে, সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের রক্তপাত করিয়ো না। এইজন্য তোমাকে আজ অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি।"

এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিলেন। নক্ষত্ররায়ের হাত হইতে তরবারি মাটিতে পড়িয়া গেল। নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দাদা, আমি দোষী নই- এ কথা আমার মনে কখনো উদয় হয় নাই—"

রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি তাহা জানি। তুমি কি কখনো আমাকে আঘাত করিতে পারো!— তোমাকে পাঁচজনে মন্দ পরামর্শ দিয়াছে।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "আমাকে রঘুপতি কেবল এই উপদেশ দিতেছে।"

রাজা বলিলেন, "রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিয়ো।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "কোথায় যাইব বলিয়া দিন। আমি এখানে থাকিতে চাই না। আমি এখান হইতে— রঘুপতির কাছ হইতে পালাইতে চাই।"

রাজা বলিলেন, "তুমি আমারই কাছে থাকো - আর কোথাও যাইতে হইবে না— রঘুপতি তোমার কী করিবে!"

নক্ষত্ররায় রাজার হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, যেন রঘুপতি তাঁহাকে টানিয়া লইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় রাজার হাত ধরিয়া অরণ্যের মধ্য দিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন তখনো আকাশ হইতে অল্প অল্প আলো আসিতেছিল— কিন্তু অরণ্যের নীচে অত্যন্ত অন্ধকার হইয়াছে। যেন অন্ধকারের বন্যা আসিয়াছে, কেবল গাছগুলোর মাথা উপরে জাগিয়া আছে। ক্রমে তাহাও ডুবিয়া যাইবে; তখন অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আকাশে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে।

প্রাসাদের পথে না গিয়া রাজা মন্দিরের দিকে গেলেন। মন্দিরের সন্ধ্যা-আরতি সমাপন করিয়া একটি দীপ জ্বালিয়া রঘুপতি ও জয়সিংহ কুটিরে বসিয়া আছেন। উভয়েই নীরবে আপন আপন ভাবনা লইয়া আছেন। দীপের ক্ষীণ আলোকে কেবল তাঁহাদের দুইজনের মুখের অন্ধকার দেখা যাইতেছে। নক্ষত্ররায় রঘুপতিকে দেখিয়া মুখ তুলিতে পারিলেন না; রাজার ছায়ায় দাঁড়াইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন—

রাজা তাঁহাকে পাশে টানিয়া লইয়া দৃঢ়রূপে তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন ও স্থির-নেত্রে রঘুপতির মুখের দিকে একবার চাহিলেন। রঘুপতি তীব্রদৃষ্টিতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অবশেষে রাজা রঘুপতিকে প্রণাম করিলেন, নক্ষত্র-রায়ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রঘুপতি প্রণাম গ্রহণ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "জয়োস্তু— রাজ্যের কুশল ?"

রাজা একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আশীর্বাদ করুন, রাজ্যের অকুশল না ঘটুক। এ রাজ্যে মায়ের সকল সন্তান যেন সদ্ভাবে প্রেমে মিলিয়া থাকে, এ রাজ্যে ভাইয়ের কাছ হইতে ভাইকে কেহ যেন কাড়িয়া না লয়, যেখানে প্রেম আছে সেখানে কেহ যেন হিংসার প্রতিষ্ঠা না করে। রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই আসিয়াছি। পাপসংকল্পের সংঘর্ষণে দাবানল জ্বলিয়া উঠিতে পারে— নির্বাণ করুন, শান্তির বারি বর্ষণ করুন, পৃথিবী শীতল করুন।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেবতার রোষানল জ্বলিয়া উঠিলে কে তাহা নির্বাণ করিবে! এক অপরাধীর জন্য সহস্র নিরপরাধ সে অনলে দগ্ধ হয়।"

রাজা বলিলেন, "সেই তো ভয়, সেইজন্যই কাঁপিতেছি। সে কথা কেহ বুঝিয়াও বোঝে না কেন! আপনি কি জানেন না, এ রাজ্যে দেবতার নাম করিয়া দেবতার নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে ? সেইজন্যই অমঙ্গল-আশঙ্কায় আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছি— এখানে পাপের বৃক্ষ রোপণ করিয়া আমার এই ধনধান্যময় সুখের রাজ্যে দেবতার বজ্র আহ্বান করিয়া আনিবেন না। আপনাকে এই কথা বলিয়া গেলাম, এই কথা বলিবার জন্যই আজ আমি আসিয়াছিলাম।"

বলিয়া মহারাজ রঘুপতির মুখের উপর তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। রাজার সুগম্ভীর দৃঢ় স্বর রুদ্ধ ঝটিকার মতো কুটিরের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। রঘুপতি একটি উত্তর দিলেন না, পইতা লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া নক্ষত্ররায়ের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জয়সিংহও বাহির হইলেন। ঘরের মধ্যে কেবল একটি দীপ, রঘুপতি এবং রঘুপতির বৃহৎ ছায়া রহিল।

তখন আকাশের আলো নিবিয়া গেছে। মেঘের মধ্যে তারা নিমগ্ন। আকাশের কানায় কানায় অন্ধকার। পুবে বাতাসে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কোথা হইতে কদম ফুলের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে এবং অরণ্যের মর্মরশব্দ শুনা যাইতেছে। ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া পরিচিত পথ দিয়া রাজা চলিতেছেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে শুনিলেন কে ডাকিল "মহারাজ"।

রাজা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ?"

পরিচিত স্বর কহিল, "আমি আপনার অধম সেবক, আমি জয়সিংহ। মহারাজ আপনি আমার গুরু, আমার প্রভু। আপনি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। যেমন আপনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধরিয়া অন্ধকারের মধ্যে দিয়া লইয়া যাইতেছেন, তেমনি আমারও হাত ধরুন, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যান; আমি গুরুতর অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়াছি। আমার কিসে ভালো হইবে, কিসে মন্দ হইবে আমি কিছুই জানি না। আমি একবার বামে যাইতেছি, একবার দক্ষিণে যাইতেছি, আমার কর্ণধার কেহ নাই।"

সেই অন্ধকারে অশ্রু পড়িতে লাগিল, কেহ দেখিতে পাইল না, কেবল আবেগভরে জয়সিংহের আর্দ্র স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্তব্ধ স্থির অন্ধকার, বায়ুচঞ্চল সমুদ্রের মতো কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন, "চলো, আমার সঙ্গে প্রাসাদে চলো।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন যখন জয়সিংহ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন পূজার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। রঘুপতি বিমর্ষ মুখে একাকী বসিয়া আছেন। ইহার পূর্বে কখনো এরূপ অনিয়ম হয় নাই।

জয়সিংহ আসিয়া গুরুর কাছে না গিয়া তাঁহার বাগানের মধ্যে গেলেন। তাঁহার গাছপালাগুলির মধ্যে গিয়া বসিলেন। তাহারা তাঁহার চারি দিকে কাঁপিতে লাগিল, নড়িতে লাগিল, ছায়া নাচাইতে লাগিল। তাঁহার চারি দিকে পুষ্পখচিত পল্লবের স্তর, শ্যামল স্তরের উপর স্তর, ছায়াপূর্ণ সুকোমল স্নেহের আচ্ছাদন, সুমধুর আহ্বান, প্রকৃতির প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন। এখানে সকলে অপেক্ষা করিয়া থাকে, কথা জিজ্ঞাসা করে না, ভাবনার ব্যাঘাত করে না, চাহিলে তবে চায়, কথা কহিলে তবে কথা কয়। এই নীরব শুশ্রূষার মধ্যে, প্রকৃতির এই অন্তঃপুরের মধ্যে বসিয়া জয়সিংহ ভাবিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে রঘুপতি আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত দিলেন। জয়সিংহ সচকিত হইয়া উঠিলেন। রঘুপতি তাঁহার পাশে বসিলেন। জয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতস্বরে কহিলেন, "বৎস, তোমার এমন ভাব দেখিতেছি কেন? আমি

তোমার কী করিয়াছি যে, তুমি অল্পে অল্পে আমার কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছ?"

জয়সিংহ কী বলিতে চেষ্টা করিলেন, রঘুপতি তাহাতে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "এক মুহূর্তের জন্য কি আমার স্নেহের অভাব দেখিয়াছ? আমি কি তোমার কাছে কোনো অপরাধ করিয়াছি জয়সিংহ? যদি করিয়া থাকি তবে আমি তোমার গুরু, তোমার পিতৃতুল্য, আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি— আমাকে মার্জনা করো।"

জয়সিংহ বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন; গুরুর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; বলিলেন, "পিতা, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, আমি কোথায় যাইতেছি দেখিতে পাইতেছি না।"

রঘুপতি জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে তোমার শৈশব হইতে মাতার ন্যায় স্নেহে পালন করিয়াছি, পিতার ন্যায় যত্নে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়াছি— তোমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সখার ন্যায় তোমাকে আমার সমুদয় মন্ত্রণার সহযোগী করিয়াছি। আজ তোমাকে কে আমার পাশ হইতে টানিয়া লইতেছে? এতদিনকার স্নেহমমতার বন্ধন কে বিচ্ছিন্ন করিতেছে? তোমার উপর আমার যে দেবদত্ত অধিকার জন্মিয়াছে সে পবিত্র অধিকারে কে হস্তক্ষেপ করিয়াছে? বলো, বৎস, সেই মহাপাতকীর নাম বলো।"

জয়সিংহ বলিলেন, "প্রভু, আপনার কাছ হইতে আমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করে নাই —আপনিই আমাকে দূর করিয়া দিয়াছেন। আমি ছিলাম গৃহের মধ্যে, আপনি সহসা পথের মধ্যে আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন, কেই বা পিতা, কেই বা মাতা, কেই বা ভ্রাতা! আপনি বলিয়াছেন, পৃথিবীতে কোনো বন্ধন নাই, স্নেহপ্রেমের পবিত্র অধিকার নাই। যাঁহাকে মা বলিয়া জানিতাম আপনি তাঁহাকে বলিয়াছেন শক্তি— যে যেখানে হিংসা করিতেছে, যে যেখানে রক্তপাত করিতেছে, যেখানেই ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, যেখানেই দুই জন মানুষে যুদ্ধ, সেইখানেই এই তৃষিত শক্তি রক্তলালসায় তাঁহার খর্পর লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন! আপনি মায়ের কোল হইতে আমাকে এ কী রাক্ষসীর দেশে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছেন!"

রঘুপতি অনেক ক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে তুমি স্বাধীন হইলে, বন্ধনমুক্ত হইলে, তোমার উপর হইতে আমার সমস্ত অধিকার আমি প্রত্যাহরণ করিলাম। তাহাতেই যদি তুমি সুখী হও, তবে তাই হউক।"

বলিয়া উঠিবার উদ্‌যোগ করিলেন।

জয়সিংহ তাঁহার পা ধরিয়া বলিলেন, "না না না প্রভু— আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমি রহিলাম— আপনার পদতলেই রহিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন। আপনার পথ ছাড়া আমার অন্য পথ নাই।"

রঘুপতি তখন জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন— তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত হইয়া জয়সিংহের স্কন্ধে পড়িতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মন্দিরে অনেক লোক জমা হইয়াছে। খুব কোলাহল উঠিয়াছে। রঘুপতি রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কী করিতে আসিয়াছ?"

তাহারা নানা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমরা ঠাকরুন দর্শন করতে আসিয়াছি।"

রঘুপতি বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকরুন কোথায়? ঠাকরুন এ রাজ্য থেকে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুনকে রাখতে পারলি কৈ? তিনি চলে গেছেন।"

ভারি গোলমাল উঠিল, নানা দিক হইতে নানা কথা শুনা যাইতে লাগিল।

"সে কী কথা ঠাকুর!"

"আমরা কী অপরাধ করেছি ঠাকুর?"

"মা কি কিছুতেই প্রসন্ন হবেন না?"

"আমার ভাইপোর ব্যামো ছিল ব'লে আমি ক'দিন পূজা দিতে আসি নি।" (তার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারই উপেক্ষা সহিতে না পারিয়া দেবী দেশ ছাড়িতেছেন।)

"আমার পাঁঠা দুটি ঠাকরুনকে দেব মনে করেছিলুম, বিস্তর দূর বলে আসতে পারি নি।" (দুটো পাঁঠা দিতে দেরি করিয়া রাজ্যের যে এরূপ অমঙ্গল ঘটিল, ইহাই মনে করিয়া সে কাতর হইতেছিল।)

"গোবর্ধন যা মানত করেছিল তা মাকে দেয় নি বটে, কিন্তু মাও তো তেমনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়েছে, সে আজ ছ মাস বিছানায় পড়ে।" (গোবর্ধন তাহার প্লীহার আতিশয্য লইয়া চুলায় যাক্, মা দেশে থাকুন— এইরূপ সে মনে মনে প্রার্থনা করিল। সকলেই অভাগা গোবর্ধনের প্লীহার প্রচুর উন্নতি কামনা করিতে লাগিল।)

ভিড়ের মধ্যে একটি দীর্ঘপ্রস্থ লোক ছিল, সে সকলকে ধমক দিয়া থামাইল

এবং রঘুপতিকে জোড়হস্তে কহিল, "ঠাকুর, মা কেন চলিয়া গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হইয়াছিল?"

রঘুপতি কহিলেন, "তোরা মায়ের জন্য এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস নে, এই তো তোদের ভক্তি।"

সকলে চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে কথা উঠিতে লাগিল। অস্পষ্ট স্বরে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "রাজার নিষেধ, আমরা কী করিব!"

জয়সিংহ প্রস্তরের পুত্তলিকার মতো স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। 'মায়ের নিষেধ' এই কথা তড়িদ্‌বেগে তাঁহার রসনাগ্রে উঠিয়াছিল; কিন্তু তিনি আপনাকে দমন করিলেন, একটি কথা কহিলেন না!

রঘুপতি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রাজা কে! মায়ের সিংহাসন কি রাজার সিংহাসনের নীচে! তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে লইয়াই তোরা থাক্। দেখি তোদের কে রক্ষা করে।"

জনতার মধ্যে গুন্ গুন্ শব্দ উঠিল। সকলেই সাবধানে কথা কহিতে লাগিল।

রঘুপতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "রাজাকেই বড়ো করিয়া লইয়া তোদের মাকে তোরা রাজ্য হইতে অপমান করিয়া বিদায় করিলি। সুখে থাকিবি মনে করিস নে আর তিন বৎসর পরে এতবড়ো রাজ্যে তোদের ভিটের চিহ্ন থাকিবে না— তোদের বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না।"

জনতার মধ্যে সাগরের গুন্ গুন্ শব্দ ক্রমশ স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। জনতাও ক্রমে বাড়িতেছে। সেই দীর্ঘ লোকটি জোড়হাত করিয়া রঘুপতিকে কহিল, "সন্তান যদি অপরাধ ক'রে থাকে তবে মা তাকে শাস্তি দিন, কিন্তু মা সন্তানকে একেবারে পরিত্যাগ করে যাবেন এ কি কখনো হয়! প্রভু, বলে দিন কী করলে মা ফিরে আসবেন।"

রঘুপতি কহিলেন, "তোদের এই রাজা যখন এ রাজ্য হইতে বাহির হইয়া যাইবেন, মাও তখন এই রাজ্যে পুনর্বার পদার্পণ করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া জনতার গুন্ গুন্ শব্দ হঠাৎ থামিয়া গেল। হঠাৎ চতুর্দিক সুগভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল, অবশেষে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল; কেহ সাহস করিয়া কথা কহিতে পারিল না।

রঘুপাত মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তবে তোরা দেখিবি! আয়, আমার সঙ্গে আয়। অনেক দূর হতে অনেক আশা করিয়া তোরা ঠাকরুনকে দর্শন করিতে আসিয়াছিস— চল্ একবার মন্দিরে চল্।"

সকলে সভয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইল। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ছিল, রঘুপতি ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। প্রতিমার মুখ দেখা যাইতেছে না, প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দর্শকের দিকে স্থাপিত। মা বিমুখ হইয়াছেন। সহসা জনতার মধ্য হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল, "একবার ফিরে দাঁড়া মা! আমরা কী অপরাধ করেছি!" চারি দিকে "মা কোথায়, মা কোথায়" রব উঠিল। প্রতিমা পাষাণ বলিয়াই ফিরিল না। অনেকে মূর্ছা গেল। ছেলেরা কিছু না বুঝিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধেরা মাতৃহারা শিশুসন্তানের মতো কাঁদিতে লাগিল, "মা, ওমা!" স্ত্রীলোকদের ঘোমটা খুলিয়া গেল, অঞ্চল খসিয়া পড়িল, তাহারা বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। যুবকেরা কম্পিত ঊর্ধ্বস্বরে বলিতে লাগিল "মা, তোকে আমরা ফিরিয়ে আনব-- তোকে আমরা ছাড়ব না।"

একজন পাগল গাহিয়া উঠিল—

"মা আমার পাষাণের মেয়ে
সন্তানে দেখলি নে চেয়ে।"

মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সমস্ত রাজ্য যেন "মা" "মা" করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল— কিন্তু প্রতিমা ফিরিল না। মধ্যাহ্নের সূর্য প্রখর হইয়া উঠিল, প্রাঙ্গণে উপবাসী জনতার বিলাপ থামিল না।

তখন জয়সিংহ কম্পিত পদে আসিয়া রঘুপতিকে কহিলেন, "প্রভু, আমি কি একটি কথাও কহিতে পাইব না?"

রঘুপতি কহিলেন, "না, একটি কথাও না।"

জয়সিংহ কহিলেন, "সন্দেহের কি কোনো কারণ নাই?"

রঘুপতি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না।"

জয়সিংহ দৃঢ়রূপে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিলেন, "সমস্তই কি বিশ্বাস করিব?"

রঘুপতি জয়সিংহকে সুতীব্র দৃষ্টিদ্বারা দগ্ধ করিয়া কহিলেন, "হাঁ।"

জয়সিংহ বক্ষে হাত দিয়া কহিলেন, "আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

তিনি জনতার মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন ২৯শে আষাঢ়। আজ রাত্রে চতুর্দশ দেবতার পূজা। আজ প্রভাতে তালবনের আড়ালে সূর্য যখন উঠিতেছেন, তখন পূর্ব দিকে মেঘ নাই। কনককিরণপ্লাবিত আনন্দময় কাননের মধ্যে গিয়া জয়সিংহ যখন বসিলেন তখন তাঁহার পুরাতন স্মৃতিসকল মনে উঠিতে লাগিল। এই বনের মধ্যে এই পাষাণ-মন্দিরের পাষাণ-সোপানাবলীর মধ্যে, এই গোমতীতীরে সেই বৃহৎ বটের ছায়ায়, সেই ছায়া-দিয়া-ঘেরা পুকুরের ধারে তাঁহার বাল্যকাল সুমধুর স্বপ্নের মতো মনে পড়িতে লাগিল। যে-সকল মধুর দৃশ্য তাঁহার বাল্যকালকে সস্নেহে ঘিরিয়া থাকিত তাহারা আজ হাসিতেছে, তাঁহাকে আবার আহ্বান করিতেছে, কিন্তু তাঁহার মন বলিতেছে, "আমি যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি, আমি বিদায় লইয়াছি, আমি আর ফিরিব না।" শ্বেত পাষাণের মন্দিরের উপরে সূর্যকিরণ পড়িয়াছে এবং তাহার বাম দিকের ভিত্তিতে বকুলশাখার কম্পিত ছায়া পড়িয়াছে। ছেলেবেলায় এই পাষাণমন্দিরকে যেমন সচেতন বোধ হইত, এই সোপানের মধ্যে একলা বসিয়া যখন খেলা করিতেন তখন এই সোপানগুলির মধ্যে যেমন সঙ্গ পাইতেন, আজ প্রভাতের সূর্যকিরণে মন্দিরকে তেমনি সচেতন, তাহার সোপানগুলিকে তেমনি শৈশবের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; মন্দিরের ভিতরে মাকে আজ আবার মা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু অভিমানে তাঁহার হৃদয় পুরিয়া গেল, তাঁহার দুই চক্ষু ভাসিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রঘুপতিকে আসিতে দেখিয়া জয়সিংহ চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন, "আজ পূজার দিন। মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া কী শপথ করিয়াছিলে মনে আছে?"

জয়সিংহ কহিলেন, "আছে।"

রঘুপতি। শপথ পালন করিবে তো?

জয়সিংহ। হাঁ।

রঘুপতি। দেখিয়ো বৎস, সাবধানে কাজ করিয়ো। বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই প্রজাদিগকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছি।

জয়সিংহ চুপ করিয়া রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই উত্তর

করিলেন না ; রঘুপতি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "আমার আশীর্বাদে নির্বিঘ্নে তুমি তোমার কার্য সাধন করিতে পারিবে, মায়ের আদেশ পালন করিতে পারিবে।"

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্ণে একটি ঘরে বসিয়া রাজা ধ্রুবের সহিত খেলা করিতেছেন। ধ্রুবের আদেশমতে একবার মাথার মুকুট খুলিতেছেন একবার পরিতেছেন ; ধ্রুব মহারাজের এই দুর্দশা দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছে। রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি অভ্যাস করিতেছি। তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেমন সহজে পরিতে পারিয়াছি, তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেন তেমনি সহজে খুলিতে পারি। মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন।"

ধ্রুবের মনে সহসা একটা ভাবোদয় হইল— কিয়ৎক্ষণ রাজার মুখের দিকে চাহিয়া মুখে আঙুল দিয়া বলিল, "তুমি আজা।" রাজা শব্দ হইতে 'র' অক্ষর একেবারে সমূলে লোপ করিয়া দিয়াও ধ্রুবের মনে কিছুমাত্র অনুতাপের উদয় হইল না। রাজার মুখের সামনে রাজাকে আজা বলিয়া সে সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

রাজা ধ্রুবের এই ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তুমি আজা।"

ধ্রুব বলিল, "তুমি আজা।"

এ বিষয়ে তর্কের শেষ হইল না। কোনো পক্ষে কোনো প্রমাণ নাই, তর্ক কেবলই গায়ের জোরে। অবশেষে রাজা নিজের মুকুট লইয়া ধ্রুবের মাথায় চড়াইয়া দিলেন। তখন ধ্রুবের আর কথাটি কহিবার জো রহিল না, সম্পূর্ণ হার হইল। ধ্রুবের মুখের আধখানা সেই মুকুটের নীচে ডুবিয়া গেল। মুকুট-সমেত মস্ত মাথা দুলাইয়া ধ্রুব মুকুট-হীন রাজার প্রতি আদেশ করিল, "একটা গল্প বলো।"

রাজা বলিলেন, "কী গল্প বলিব।"

ধ্রুব কহিল, "দিদির গল্প বলো।" গল্পমাত্রকেই ধ্রুব দিদির গল্প বলিয়া জানিত। সে জানিত, দিদি যে-সকল গল্প বলিত তাহা ছাড়া পৃথিবীতে আর গল্প নাই।

রাজা তখন মস্ত এক পৌরাণিক গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হিরণ্যকশিপু নামে এক আজা ছিল।"

আজা শুনিয়া ধ্রুব বলিয়া উঠিল, "আমি আজা।" মস্ত ঢিলে মুকুটের জোরে হিরণ্যকশিপুর রাজপদ সে একেবারে অগ্রাহ্য করিল।

চাটুভাষী সভাসদের ন্যায় গোবিন্দমাণিক্য সেই কিরীটী শিশুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন, "তুমিও আজা, সেও আজা।"

ধ্রুব তাহাতেও সুস্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "না, আমি আজা।"

অবশেষে মহারাজ যখন বলিলেন, "হিরণ্যকশিপু আজ্ঞা নয়, সে আক্কস" তখন ধ্রুব তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই দেখিল না।

এমন সময় নক্ষত্ররায় গৃহে প্রবেশ করিলেন— কহিলেন, "শুনিলাম রাজকার্যোপলক্ষে মহারাজ আমাকে ডাকিয়াছেন। আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

রাজা কহিলেন, "আর-একটু অপেক্ষা করো, গল্পটা শেষ করিয়া লই।" বলিয়া গল্পটা সমস্ত শেষ করিলেন। "আক্কস দুষ্টু" —গল্প শুনিয়া সংক্ষেপে ধ্রুব এইরূপ মত প্রকাশ করিল।

ধ্রুবের মাথায় মুকুট দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের ভালো লাগে নাই। ধ্রুব যখন দেখিল নক্ষত্ররায়ের দৃষ্টি তাহার দিকে স্থাপিত রহিয়াছে, তখন সে নক্ষত্ররায়কে গম্ভীরভাবে জানাইয়া দিল, "আমি আজ্ঞা।"

নক্ষত্র বলিলেন, "ছি, ও কথা বলিতে নাই।" বলিয়া ধ্রুবের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া লইয়া রাজার হাতে দিতে উদ্যত হইলেন। ধ্রুব মুকুটহরণের সম্ভাবনা দেখিয়া সত্যকার রাজাদের মতো চীৎকার করিয়া উঠিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, নক্ষত্রকে নিবারণ করিলেন।

অবশেষে গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায়কে কহিলেন, "শুনিয়াছি রঘুপতি ঠাকুর অসং উপায়ে প্রজাদের অসন্তোষ উদ্রেক করিয়া দিতেছেন। তুমি স্বয়ং নগরের মধ্যে গিয়া এ বিষয়ে তদারক করিয়া আসিবে এবং সত্যমিথ্যা অবধারণ করিয়া আমাকে জানাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "যে আজ্ঞে।" বলিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু ধ্রুবের মাথায় মুকুট তাঁহার কিছুতেই ভালো লাগিল না।

প্রহরী আসিয়া কহিল, "পুরোহিত ঠাকুরের সেবক জয়সিংহ সাক্ষাৎ-প্রার্থনায় দ্বারে দাঁড়াইয়া।"

রাজা তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

জয়সিংহ মহারাজকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ, আমি বহুদূরদেশে চলিয়া যাইতেছি। আপনি আমার রাজা, আমার গুরু, আপনার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবে জয়সিংহ?"

জয়সিংহ কহিলেন, "জানি না মহারাজ, কোথায় তাহা কেহ বলিতে পারে না।"

রাজাকে কথা কহিতে উদ্যত দেখিয়া জয়সিংহ কহিলেন, "নিষেধ করিবেন না মহারাজ। আপনি নিষেধ করিলে আমার যাত্রা শুভ হইবে না; আশীর্বাদ করুন, এখানে

আমার যে-সকল সংশয় ছিল, সেখানে যেন সে-সকল সংশয় দূর হইয়া যায়। এখানকার মেঘ সেখানে যেন কাটিয়া যায়। যেন আপনার মতো রাজার রাজত্বে যাই, যেন শান্তি পাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে যাইবে।"

জয়সিংহ কহিলেন, "আজ সন্ধ্যাকালে। অধিক সময় নাই মহারাজ, আজ আমি তবে বিদায় হই।"

বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া রাজার পদধূলি লইলেন, রাজার চরণে দুই ফোঁটা অশ্রু পড়িল।

জয়সিংহ উঠিয়া যখন যাইতে উদ্যত হইলেন তখন ধ্রুব ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার কাপড় টানিয়া কহিল, "তুমি যেয়ো না।"

জয়সিংহ হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "কার কাছে থাকিব বৎস? আমার কে আছে?"

ধ্রুব কহিল, "আমি আজা।"

জয়সিংহ কহিলেন, "তোমরা রাজার রাজা, তোমরাই সকলকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ।"

ধ্রুবকে কোল হইতে নামাইয়া জয়সিংহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মহারাজ গম্ভীরমুখে অনেক ক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশী তিথি। মেঘও করিয়াছে, চাঁদও উঠিয়াছে। আকাশের কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার। কখনো চাঁদ বাহির হইতেছে, কখনো চাঁদ লুকাইতেছে। গোমতী-তীরের অরণ্যগুলি চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহাদের গভীর অন্ধকাররাশির মর্মভেদ করিয়া মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলিতেছে।

আজ রাত্রে পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। রাত্রে পথে লোক কেই বা বাহির হয়। কিন্তু নিষেধ আছে বলিয়া পথের বিজনতা আজ আরও গভীর বোধ হইতেছে। নগরবাসীরা সকলেই আপনার ঘরের দীপ নিবাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পথে একটি প্রহরী নাই। চোরও আজ পথে বাহির হয় না। যাহারা শ্মশানে শবদাহ করিতে যাইবে তাহারা মৃতদেহ ঘরে লইয়া প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ঘরে যাহাদের সন্তান মুমূর্ষু তাহারা বৈদ্য ডাকিতে বাহির হয় না।

যে ভিক্ষুক পথপ্রান্তে বৃক্ষতলে শয়ন করিত সে আজ গৃহস্থের গোশালায় আশ্রয় লইয়াছে।

সে রাত্রে শৃগাল-কুকুর নগরের পথে পথে বিচরণ করিতেছে দুই একটা চিতাবাঘ গৃহস্থের দ্বারের কাছে আসিয়া উঁকি মারিতেছে। মানুষের মধ্যে কেবল একজন মাত্র আজ গৃহের বাহিরে আছে— আর মানুষ নাই। সে একখানা ছুরি লইয়া নদীতীরে পাথরের উপর শান দিতেছে, এবং অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছে। ছুরির ধার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে বোধ করি ছুরির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাতেও শান দিতেছিল, তাই তার শান দেওয়া আব শেষ হইতেছিল না। প্রস্তরের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ ছুরি হিস হিস শব্দ করিয়া হিংসার লালসায় তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার নদী বহিয়া যাইতেছিল। জগতের উপর দিয়া অন্ধকার রজনীর প্রহর বহিয়া যাইতেছিল। আকাশের উপর দিয়া অন্ধকার ঘনমেঘের স্রোত ভাসিয়া যাইতেছিল।

অবশেষে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল তখন জয়সিংহের চেতনা হইল। তপ্ত ছুরি খাপের মধ্যে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পূজার সময় নিকটবর্তী হইয়াছে। তাঁহার শপথের কথা মনে পড়িয়াছে। আর এক দণ্ডও বিলম্ব করিলে চলিবে না।

মন্দির আজ সহস্র দীপে আলোকিত। ত্রয়োদশ দেবতার মাঝখানে কালী দাড়াইয়া নররক্তের জন্য জিহ্বা মেলিয়াছেন। মন্দিরের সেবকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া চতুর্দশ দেবপ্রতিমা সম্মুখে করিয়া রঘুপতি একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘ খাঁড়া। উলঙ্গ উজ্জ্বল খড়্গ দীপালোকে বিভাসিত হইয়া স্থির বজ্রের ন্যায় দেবীর আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

অর্ধরাত্রে পূজা। সময় নিকটবর্তী। রঘুপতি অত্যন্ত অস্থিরচিত্তে জয়সিংহের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। সহসা ঝড়ের মতো বাতাস উঠিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বাতাসে মন্দিরের সহস্র দীপশিখা কাঁপিতে লাগিল, উলঙ্গ খড়্গের উপর বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। চতুর্দশ দেবতা এবং রঘুপতির ছায়া যেন জীবন পাইয়া দীপশিখার নৃত্যের তালে তালে মন্দিরের ভিত্তিময় নাচিতে লাগিল। একটা নরকপাল ঝড়ের বাতাসে ঘরময় গড়াইতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে দুইটা চামচিকা আসিয়া শুষ্ক পত্রের মতো ক্রমাগত উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল— দেয়ালে তাহাদের ছায়া উড়িতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর হইল। প্রথমে নিকটে, পরে দূর-দূরান্তরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল।

ঝড়ের বাতাসও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পূজার সময় হইয়াছে। রঘুপতি অমঙ্গল-আশঙ্কায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

এমন সময় জীবন্ত ঝড়বৃষ্টিবিদ্যুতের মতো জয়সিংহ নিশীথের অন্ধকারের মধ্য হইতে সহসা মন্দিরের আলোকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘ চাদরে দেহ আচ্ছাদিত, সর্বাঙ্গ বাহিয়া বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, নিশ্বাস বেগে বহিতেছে, চক্ষুতারকায় অগ্নিকণা জ্বলিতেছে।

রঘুপতি তাঁহাকে ধরিয়া কানের কাছে মুখ দিয়া কহিলেন, "রাজরক্ত আনিয়াছ?"

জয়সিংহ তাঁহার হাত ছাড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, "আনিয়াছি। রাজরক্ত আনিয়াছি। আপনি সরিয়া দাঁড়ান, আমি দেবীকে নিবেদন করি।"

শব্দে মন্দির কাঁপিয়া উঠিল।

কালীর প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "সত্যই কি তবে তুই সন্তানের রক্ত চাস মা! রাজরক্ত নহিলে তোর তৃষা মিটিবে না? জন্মাবধি আমি তোকেই মা বলিয়া আসিয়াছি, আমি তোরই সেবা করিয়াছি, আমি আর-কাহারও দিকে চাই নাই, আমার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রাজপুত, আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, আমার মাতামহবংশীয়েরা আজও রাজত্ব করিতেছেন। এই নে তবে তোর সন্তানের রক্ত, তোর রাজরক্ত এই নে।" গাত্র হইতে চাদর পড়িয়া গেল। কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিলেন— বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল— চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাঁহার হৃদয়ে নিহিত করিলেন, মরণের তীক্ষ্ণ জিহ্বা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন; পাষাণ-প্রতিমা বিচলিত হইল না।

রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন— জয়সিংহকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া রহিলেন। রক্ত গড়াইয়া মন্দিরের শ্বেত প্রস্তরের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দীপগুলি একে একে নিবিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি একটি প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ শুনা গেল; রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় ঝড় থামিয়া চারি দিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল। রাত্রি চতুর্থ প্রহরের সময় মেঘের ছিদ্র দিয়া চন্দ্রালোক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রালোক জয়সিংহের পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর পড়িল, চতুর্দশ দেবতা শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। প্রভাতে বন হইতে যখন পাখি ডাকিয়া উঠিল, তখন রঘুপতি মৃতদেহ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রাজার আদেশমত প্রজাদের অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নক্ষত্ররায় স্বয়ং প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার ভাবনা হইতে লাগিল, মন্দিরে কী করিয়া যাই। রঘুপতির সম্মুখে পড়িলে তিনি কেমন অস্থির হইয়া পড়েন, আত্মসংবরণ করিতে পারেন না। রঘুপতির সম্মুখে পড়িতে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। এই জন্য তিনি স্থির করিয়াছেন, রঘুপতির দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে জয়সিংহের কক্ষে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে জয়সিংহের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই মনে করিলেন, ফিরিতে পারিলে বাঁচি। দেখিলেন জয়সিংহের পুঁথি, তাঁহার বসন, তাঁহার গৃহসজ্জা চারি দিকে ছড়ানো রহিয়াছে, মাঝখানে রঘুপতি বসিয়া। জয়সিংহ নাই। রঘুপতির লোহিত চক্ষু অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতেছে, তাঁহার কেশপাশ বিশৃঙ্খল। তিনি নক্ষত্ররায়কে দেখিয়াই দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হাত ধরিলেন। বলপূর্বক তাহাকে মাটিতে বসাইলেন। নক্ষত্ররায়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। রঘুপতি তাঁহার অঙ্গারনয়নে নক্ষত্ররায়ের মর্মস্থান পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া পাগলের মতো বলিলেন, "রক্ত কোথায়?"

নক্ষত্ররায়ের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, মুখ দিয়া কথা সরিল না।

রঘুপতি উচ্চস্বরে বলিলেন, "তোমার প্রতিজ্ঞা কোথায়? রক্ত কোথায়?"

নক্ষত্ররায় হাত নাড়িলেন, পা নাড়িলেন, বামে সরিয়া বসিলেন, কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন— তাঁহার ঘর্ম বহিতে লাগিল, তিনি শুষ্কমুখে বলিলেন, "ঠাকুর—"

রঘুপতি কহিলেন, "এবার মা যে স্বয়ং খড়্গ তুলিয়াছেন, এবার চারি দিকে যে রক্তের স্রোত বহিতে থাকিবে— এবার তোমাদের বংশে এক ফোঁটা রক্ত যে বাকি থাকিবে না। তখন দেখিব নক্ষত্ররায়ের ভ্রাতৃস্নেহ।"

"ভ্রাতৃস্নেহ! হাঃ হাঃ হাঃ! ঠাকুর"—

নক্ষত্ররায়ের হাসি আর বাহির হইল না, গলা শুকাইয়া গেল।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত চাই না। পৃথিবীতে গোবিন্দমাণিক্যের যে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, আমি তাহাকেই চাই। তাহার রক্ত লইয়া আমি গোবিন্দমাণিক্যের গায়ে মাখাইতে চাই— তাহার বক্ষস্থল রক্তবর্ণ হইয়া যাইবে— সে রক্তের চিহ্ন কিছুতেই মুছিবে না। এই দেখো— চাহিয়া দেখো।"

বলিয়া উত্তরীয় মোচন করিলেন, তাঁহার দেহ রক্তে লিপ্ত, তাঁহার বক্ষোদেশে স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া আছে।

নক্ষত্ররায় শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। রঘুপতি বজ্রমুষ্টিতে নক্ষত্ররায়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "সে কে? কে গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়? কে চলিয়া গেলে গোবিন্দমাণিক্যের চক্ষে পৃথিবী শ্মশান হইয়া যাইবে, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য চলিয়া যাইবে? সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই-কাহার মুখ তাঁহার মনে পড়ে, কাহার স্মৃতি সঙ্গে করিয়া তিনি রাত্রে শয়ন করিতে যান, তাঁহার হৃদয়ের নীড় সমস্তটা পরিপূর্ণ করিয়া কে বিরাজ করিতেছে? সে কে? সে কি তুমি?"

বলিয়া, ব্যাঘ্র লম্ফ দিবার পূর্বে কম্পিত হরিণশিশুর দিকে যেমন একদৃষ্টিতে চায়, রঘুপতি তেমনি নক্ষত্রের দিকে চাহিলেন। নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "না, আমি না।" কিন্তু কিছুতেই রঘুপতির মুষ্টি ছাড়াইতে পারিলেন না।

রঘুপতি বলিলেন, "তবে বলো সে কে!"

নক্ষত্ররায় বলিয়া ফেলিলেন, "সে ধ্রুব।"

রঘুপতি বলিলেন, "ধ্রুব কে?"

নক্ষত্ররায়, "সে একটি শিশু—"

রঘুপতি বলিলেন, "আমি জানি, তাহাকে জানি। রাজার নিজের সন্তান নাই, তাহাকেই সন্তানের মতো পালন করিতেছেন। নিজের সন্তানকে লোকে কেমন ভালোবাসে জানি না, কিন্তু পালিত সন্তানকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে তাহা জানি। আপনার সমুদয় সম্পদের চেয়ে তাহার সুখ রাজার বেশি মনে হয়। আপনার মাথায় মুকুটের চেয়ে তাহার মাথায় মুকুট দেখিতে রাজার বেশি আনন্দ হয়।"

নক্ষত্ররায় আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা।"

রঘুপতি কহিলেন, "ঠিক কথা নয় তো কী? রাজা তাহাকে কতখানি ভালোবাসেন তাহা কি আমি জানি না? আমি কি বুঝিতে পারি না? আমিও তাহাকেই চাই।"

নক্ষত্ররায় হাঁ করিয়া রঘুপতির দিকে চাহিয়া রহিলেন। আপন-মনে বলিলেন, "তাহাকেই চাই।"

রঘুপতি কহিলেন, "তাহাকে আনিতেই হইবে— আজই আনিতে হইবে— আজ রাত্রেই চাই।" নক্ষত্ররায় প্রতিধ্বনির মতো কহিলেন, "আজ রাত্রেই চাই।"

নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া গলার স্বর নামাইয়া রঘুপতি বলিলেন,

"এই শিশুই তোমার শত্রু, তাহা জান? তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ— কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীল শিশু তোমার মাথা হইতে মুকুট কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে তাহা কি জান? যে সিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সিংহাসনে তাহার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কি দুটো চক্ষু থাকিতে দেখিতে পাইতেছ না!"

নক্ষত্ররায়ের কাছে এ-সকল কথা নূতন নহে। তিনিও পূর্বে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। সগর্বে বলিলেন, "তা কি আর বলিতে হইবে ঠাকুর! আমি কি আর এইটে দেখিতে পাই না!"

রঘুপতি কহিলেন, "তবে আর কী। তবে তাহাকে আনিয়া দাও। তোমার সিংহাসনের বাধা দূর করি। এই কটা প্রহর কোনোমতে কাটিবে, তার পরে— তুমি কখন আনিবে?"

নক্ষত্ররায়, "আজ সন্ধ্যাবেলায়— অন্ধকার হইলে।"

পইতা স্পর্শ করিয়া রঘুপতি বলিলেন, "যদি না আনিতে পার তো ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিবে। তা হইলে, যে মুখে তুমি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া পালন না কর, ত্রিরাত্রি না পোহাইতে সেই মুখের মাংস শকুনি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে।"

শুনিয়া নক্ষত্ররায় চমকিয়া মুখে হাত বুলাইলেন— কোমল মাংসের উপরে শকুনির চঞ্চুপাত -কল্পনা তাঁহার নিতান্ত দুঃসহ বোধ হইল। রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় হইলেন। সে ঘর হইতে আলোক বাতাস ও জনকোলাহলের মধ্যে গিয়া নক্ষত্ররায় পুনর্জীবন লাভ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া ধ্রুব "কাকা" বলিয়া ছুটিয়া আসিল, দুটি ছোটো হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া তাঁহার কপোলে কপোল দিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিল। চুপি চুপি বলিল, "কাকা।"

নক্ষত্র কহিলেন, "ছি, ও কথা বোলো না, আমি তোমার কাকা না।"

ধ্রুব তাঁহাকে এতকাল বরাবর কাকা বলিয়া আসিতেছিল, আজ সহসা বারণ শুনিয়া সে ভারী আশ্চর্য হইয়া গেল। গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তার পরে নক্ষত্রের মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি তোমার কাকা নই।"

শুনিয়া সহসা ধ্রুবের অত্যন্ত হাসি পাইল— এতবড়ো অসম্ভব কথা সে ইতিপূর্বে

আর কখনোই শুনে নাই; সে হাসিয়া বলিল, "তুমি কাকা।" নক্ষত্র যত নিষেধ করিতে লাগিলেন সে ততই বলিতে লাগিল, "তুমি কাকা।" তাহার হাসিও ততই বাড়িতে লাগিল। সে নক্ষত্ররায়কে কাকা বলিয়া খেপাইতে লাগিল। নক্ষত্র বলিলেন, "ধ্রুব, তোমার দিদিকে দেখিতে যাইবে?"

ধ্রুব তাড়াতাড়ি নক্ষত্রের গলা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "দিদি কোথায়?"

নক্ষত্র বলিলেন, "মায়ের কাছে।"

ধ্রুব কহিল, "মা কোথায়?"

নক্ষত্র, "মা আছেন এক জায়গায়। আমি সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।"

ধ্রুব হাততালি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কখন নিয়ে যাবে কাকা?"

নক্ষত্র, "এখনি।"

ধ্রুব আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সজোরে নক্ষত্রের গলা জড়াইয়া ধরিল; নক্ষত্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চাদরে আচ্ছাদন করিয়া গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আজ রাত্রেও পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। এইজন্য পথে প্রহরী নাই, পথিক নাই। আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

মন্দিরে গিয়া নক্ষত্ররায় ধ্রুবকে রঘুপতির হাতে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। রঘুপতিকে দেখিয়া ধ্রুব সবলে নক্ষত্ররায়কে জড়াইয়া ধরিল, কোনোমতে ছাড়িতে চাহিল না। রঘুপতি তাহাকে বলপূর্বক কাড়িয়া লইলেন ধ্রুব "কাকা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্ররায়ের চোখে জল আসিল— কিন্তু রঘুপতির কাছে এই হৃদয়ের দুর্বলতা দেখাইতে তাঁহার নিতান্ত লজ্জা করিতে লাগিল। তিনি ভান করিলেন যেন তিনি পাষাণে গঠিত! তখন ধ্রুব কাঁদিয়া কাঁদিয়া "দিদি" "দিদি" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, দিদি আসিল না। রঘুপতি বজ্রস্বরে এক ধমক দিয়া উঠিলেন। ভয়ে ধ্রুবের কান্না থামিয়া গেল। কেবল তাহার কান্না ফাটিয়া ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। চতুর্দশ দেবমূর্তি চাহিয়া রহিল।

গোবিন্দমাণিক্য নিশীথে স্বপ্নে ক্রন্দন শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বাতায়নের নীচে হইতে কে কাতরস্বরে ডাকিতেছে, "মহারাজ! মহারাজ!"

রাজা সত্বর উঠিয়া গিয়া চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন, ধ্রুবের পিতৃব্য কেদারেশ্বর। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে?"

কেদারেশ্বর কহিলেন, "মহারাজ, আমার ধ্রুব কোথায়?"

রাজা কহিলেন, "কেন, তাহার শয্যাতে নাই?"

"না।"

কেদারেশ্বর বলিতে লাগিলেন, "অপরাহ্ন হইতে ধ্রুবকে না দেখিতে পাওয়ায় জিজ্ঞাসা করাতে যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের ভৃত্য কহিল, ধ্রুব অন্তঃপুরে যুবরাজের কাছে আছে। শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। অনেক রাত হইতে দেখিয়া আমার আশঙ্কা জন্মিল; অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যুবরাজ নক্ষত্ররায় প্রাসাদে নাই। আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ-প্রার্থনার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রহরীরা কিছুতেই আমার কথা গ্রাহ্য করিল না— এইজন্য বাতায়নের নীচে হইতে মহারাজকে ডাকিয়াছি, আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, আমার এই অপরাধ মার্জনা করিবেন।"

রাজার মনে একটা ভাব বিদ্যুতের মতো চমকিয়া উঠিল। তিনি চারিজন প্রহরীকে ডাকিলেন, কহিলেন, "সশস্ত্রে আমার অনুসরণ করো।"

একজন কহিল, "মহারাজ, আজ রাত্রে পথে বাহির হওয়া নিষেধ।"

রাজা কহিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি।"

কেদারেশ্বর সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইলেন, রাজা তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে কহিলেন বিজন পথে চন্দ্রালোকে রাজা মন্দিরাভিমুখে চলিলেন

মন্দিরের দ্বার যখন সহসা খুলিয়া গেল, দেখা গেল, খড়্গ সম্মুখে করিয়া নক্ষত্র এবং রঘুপতি মদ্যপান করিতেছেন। আলোক অধিক নাই, একটি দীপ জ্বলিতেছে। ধ্রুব কোথায়? ধ্রুব কালীপ্রতিমার পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে— তাহার কপোলের অশ্রুরেখা শুকাইয়া গেছে, ঠোঁট দুটি একটু খুলিয়া গেছে, মুখে ভয় নাই, ভাবনা নাই—এ যেন পাষাণ-শয্যা নয়, যেন সে দিদির কোলের উপরে শুইয়া আছে। দিদি যেন চুমো খাইয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছে।

মদ খাইয়া নক্ষত্রের প্রাণ খুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রঘুপতি স্থির হইয়া বসিয়া পূজার লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন— নক্ষত্রের প্রলাপে কিছুমাত্র কান দিতে-ছিলেন না। নক্ষত্র বলিতেছিলেন, "ঠাকুর, তোমার মনে মনে ভয় হচ্ছে। তুমি মনে করছ আমিও ভয় করছি। কিছু ভয় নেই ঠাকুর! ভয় কিসের? ভয় কাকে? আমি তোমাকে রক্ষা করব। তুমি কি মনে কর আমি রাজাকে ভয় করি। আমি শাসুজাকে ভয় করি নে, আমি শাজাহানকে ভয় করি নে। ঠাকুর, তুমি বললে না কেন— আমি রাজাকে ধরে আনতুম, দেবীকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া যেত। ওইটুকু ছেলের কতটুকুই বা রক্ত।"

এমন সময় সহসা মন্দিরের ভিত্তির উপরে ছায়া পড়িল। নক্ষত্ররায় পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, রাজা। চকিতের মধ্যে নেশা সম্পূর্ণ ছুটিয়া গেল। নিজের ছায়ার চেয়ে নিজে মলিন হইয়া গেলেন। দ্রুতবেগে নিদ্রিত ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোবিন্দমাণিক্য প্রহরীদিগকে কহিলেন, "ইহাদের দুজনকে বন্দী করো।"

চারিজন প্রহরী রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের দুই হাত ধরিল। ধ্রুবকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিজন পথে জ্যোৎস্নালোকে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় সে রাত্রে কারাগারে রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিন বিচার। বিচারশালা লোকে লোকারণ্য। বিচারাসনে রাজা বসিয়াছেন, সভাসদেরা চারি দিকে বসিয়াছেন। সম্মুখে দুইজন বন্দী। কাহারও হাতে শৃঙ্খল নাই। কেবল সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া আছে, রঘুপতি পাষাণ-মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া আছেন, নক্ষত্ররায়ের মাথা নত।

রঘুপতির দোষ সপ্রমাণ করিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কী বলিবার আছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমার বিচার করিবার অধিকার আপনার নাই।"

রাজা কহিলেন, "তবে তোমার বিচার কে করিবে?"

রঘুপতি। আমি ব্রাহ্মণ, আমি দেবসেবক, দেবতা আমার বিচার করিবেন।

রাজা। পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার দিবার জন্য জগতে দেবতার সহস্র অনুচর আছে। আমরাও তাহার একজন। সে কথা লইয়া আমি তোমার সহিত বিচার করিতে চাই না— আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কাল সন্ধ্যাকালে বলির মানসে তুমি একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলে কি না।

রঘুপতি কহিলেন, "হাঁ।"

রাজা কহিলেন, "তুমি অপরাধ স্বীকার করিতেছ?"

রঘুপতি। অপরাধ! অপরাধ কিসের! আমি মায়ের আদেশ পালন করিতেছিলাম, মায়ের কার্য করিতেছিলাম, তুমি তাহার ব্যাঘাত করিয়াছ— অপরাধ তুমি করিয়াছ— আমি মায়ের সমক্ষে তোমাকে অপরাধী করিতেছি, তিনি তোমার বিচার করিবেন।

রাজা তাঁহার কথার কোনো উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমার রাজ্যের নিয়ম এই যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীববলি দিবে বা দিতে উদ্যত হইবে তাহার নির্বাসনদণ্ড। সেই দণ্ড আমি তোমার প্রতি প্রয়োগ করিলাম। আট বৎসরের জন্য তুমি নির্বাসিত হইলে। প্রহরীরা তোমাকে আমার রাজ্যের বাহিরে রাখিয়া আসিবে।"

প্রহরীরা রঘুপতিকে সভাগৃহ হইতে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। রঘুপতি তাহাদিগকে কহিলেন, "স্থির হও।" রাজার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার বিচার শেষ হইল, এখন আমি তোমার বিচার করিব. তুমি অবধান করো। চতুর্দশ দেবতা -পূজার দুই রাত্রে যে কেহ পথে বাহির হইবে, পুরোহিতের কাছে সে দণ্ডিত হইবে, এই আমাদের মন্দিরের নিয়ম। সেই প্রাচীন নিয়ম অনুসারে তুমি আমার নিকটে দণ্ডার্হ।"

রাজা কহিলেন, "আমি তোমার দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

সভাসদেরা কহিলেন, "এ অপরাধের কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারে।"

পুরোহিত কহিলেন, "আমি তোমার দুই লক্ষ মুদ্রা দণ্ড করিতেছি। এখনি দিতে হইবে।"

রাজা কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন পরে বলিলেন, "তথাস্তু।" কোষাধ্যক্ষকে ডাকিয়া দুই লক্ষ মুদ্রা আদেশ করিয়া দিলেন। প্রহরীরা রঘুপতিকে বাহিরে লইয়া গেল।

রঘুপতি চলিয়া গেলে নক্ষত্ররায়ের দিকে চাহিয়া রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "নক্ষত্র-রায়, তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার কর কি না।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "মহারাজ, আমি অপরাধী, আমাকে মার্জনা করুন।"

বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া রাজার পা জড়াইয়া ধরিলেন।

মহারাজ বিচলিত হইলেন, কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হইল না। অবশেষে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "নক্ষত্ররায়, ওঠো, আমার কথা শোনো। আমি মার্জনা করিবার কে? আমি আপনার শাসনে আপনি রুদ্ধ। বন্দীও যেমন বদ্ধ, বিচারকও তেমনি বদ্ধ। একই অপরাধে আমি একজনকে দণ্ড দিব, একজনকে মার্জনা করিব, এ কী করিয়া হয়? তুমিই বিচার করো।"

সভাসদেরা বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, নক্ষত্ররায় আপনার ভাই, আপনার ভাইকে মার্জনা করুন।"

রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "তোমরা সকলে চুপ করো। যতক্ষণ আমি এই আসনে আছি. ততক্ষণ আমি কাহারও ভাই নহি, কাহারও বন্ধু নহি।"

সভাসদেরা চারি দিকে চুপ করিলেন। সভা নিস্তব্ধ হইল। রাজা গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, "তোমরা সকলেই শুনিয়াছ— আমার রাজ্যের নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীব বলি দিবে বা দিতে উদ্যত হইবে তাহার নির্বাসন-দণ্ড। কাল সন্ধ্যাকালে নক্ষত্ররায় পুরোহিতের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বলির মানসে একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলেন। এই অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে আমি তাঁহার আট বৎসর নির্বাসনদণ্ড বিধান করিলাম।"

প্রহরীরা যখন নক্ষত্ররায়কে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল তখন রাজা আসন হইতে নামিয়া নক্ষত্ররায়কে আলিঙ্গন করিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, কেবল তোমার দণ্ড হইল না, আমারও দণ্ড হইল। না জানি পূর্বজন্মে কী অপরাধ করিয়াছিলাম। যতদিন তুমি বন্ধুদের কাছ হইতে দূরে থাকিবে দেবতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, তোমার মঙ্গল করুন।"

সংবাদ দেখিতে দেখিতে রাষ্ট্র হইল। অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। রাজা নিভৃত কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। জোড়হাতে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, আমি যদি কখনো অপরাধ করি, আমাকে মার্জনা করিয়ো না, আমাকে কিছুমাত্র দয়া করিয়ো না। আমাকে আমার পাপের শাস্তি দাও। পাপ করিয়া শাস্তি বহন করা যায়, কিন্তু মার্জনাভার বহন করা যায় না প্রভু!"

নক্ষত্ররায়ের প্রেম রাজার মনে দ্বিগুণ জাগিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের ছেলেবেলাকার মুখ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে-সকল খেলা করিয়াছে, কথা কহিয়াছে, কাজ করিয়াছে, তাহা একে একে তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। এক-একটা দিন, এক-একটা রাত্রি তাহার সূর্যালোকের মধ্যে, তাহার তারাখচিত আকাশের মধ্যে শিশু নক্ষত্ররায়কে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল। রাজার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নির্বাসনোদ্যত রঘুপতিকে যখন প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর, কোন্ দিকে যাইবেন" তখন রঘুপতি উত্তর করিলেন, "পশ্চিম দিকে যাইব।"

নয় দিন পশ্চিম মুখে যাত্রার পর বন্দী ও প্রহরীরা ঢাকা শহরের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল। তখন প্রহরীরা রঘুপতিকে ছাড়িয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল।

রঘুপতি মনে মনে বলিলেন, "কলিতে ব্রহ্মশাপ ফলে না, দেখা যাক ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে কতটা হয়। দেখা যাক, গোবিন্দমাণিক্যই বা কেমন রাজা, আর আমিই বা কেমন পুরোহিত-ঠাকুর।"

ত্রিপুরার প্রান্তে মন্দিরের কোণে মোগল-রাজ্যের সংবাদ বড়ো পৌঁছিত না। এই নিমিত্ত রঘুপতি ঢাকা শহরে গিয়া মোগলদিগের রাজনীতি ও রাজ্যের অবস্থা জানিতে কৌতূহলী হইলেন।

তখন মোগল সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকাল। তখন তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরংজীব দক্ষিণাপথে বিজাপুর আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাংলার অধিপতি ছিলেন, রাজমহলে তাঁহার রাজধানী। কনিষ্ঠ পুত্র কুমার মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্তা। জ্যেষ্ঠ যুবরাজ দারা রাজধানী দিল্লিতেই বাস করিতেছেন। সম্রাটের বয়স ৬৭ বৎসর। তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া দারার উপরেই সাম্রাজ্যের ভার পড়িয়াছে।

রঘুপতি কিয়ৎকাল ঢাকায় বাস করিয়া উর্দুভাষা শিক্ষা করিলেন ও অবশেষে রাজমহল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজমহলে যখন পৌঁছিলেন, তখন ভারতবর্ষে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে যে, শাজাহান মৃত্যুশয্যায় শয়ান। এই সংবাদ পাইবামাত্র সুজা সৈন্য সহিত দিল্লি-অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। সম্রাটের চারি পুত্রই মুমূর্ষু শাজাহানের মাথার উপর হইতে মুকুটটা একেবারে ছোঁ মারিয়া উড়াইয়া লইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অরাজক রাজমহল ত্যাগ করিয়া সুজার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। লোকজন, বাহক প্রভৃতিকে বিদায় করিয়া দিলেন। সঙ্গে যে দুই লক্ষ টাকা ছিল তাহা রাজমহলের নিকটবর্তী এক বিজন প্রান্তরে পুঁতিয়া ফেলিলেন। তাহার উপরে এক চিহ্ন রাখিয়া গেলেন। অতি অল্প টাকাই সঙ্গে লইলেন। দগ্ধ কুটির, পরিত্যক্ত গ্রাম, মর্দিত শস্যক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়া রঘুপতি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রঘুপতি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ সত্ত্বেও আতিথ্য পাওয়া দুর্ঘট। কারণ, পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যেরা যে পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে কেবল দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে। সৈন্যেরা অশ্ব ও হস্তিপালের জন্য অপক্ব শস্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। কৃষকের মরাইয়ে একটি কণা অবশিষ্ট নাই। চারি দিকে কেবল লুণ্ঠনাবশিষ্ট বিশৃঙ্খলা। অধিকাংশ লোক গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়াছে। দৈবাৎ যে দু-একজনকে দেখা যায় তাহাদের মুখে হাস্য

নাই। তাহারা চকিত হরিণের ন্যায় সতর্ক। কাহাকেও তাহারা বিশ্বাস করে না, দয়া করে না। বিজন পথের পার্শ্বে গাছের তলায় লাঠি-হাতে দুই-চারিজনকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়; পথিক-শিকারের জন্য তাহারা সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়া আছে। ধূমকেতুর পশ্চাদ্‌বর্তী উল্কারাশির ন্যায় দস্যুরা সৈনিকদের অনুসরণ করিয়া লুণ্ঠনাবশেষ লুটিয়া লইয়া যায়। এমন-কি, মৃতদেহের উপর শৃগাল-কুকুরের ন্যায় মাঝে মাঝে সৈন্যদল ও দস্যুদলে লড়াই বাধিয়া যায়। নিষ্ঠুরতা সৈন্যদের খেলা হইয়াছে, পার্শ্ববর্তী নিরীহ পথিকের পেটে খপ করিয়া একটা তলোয়ারের খোঁচা বসাইয়া দেওয়া বা তাহার মুণ্ড হইতে পাগড়ি-সমেত খানিকটা খুলি উড়াইয়া দেওয়া তাহারা সামান্য উপহাসমাত্র মনে করে। গ্রামের লোকেরা তাহাদের দেখিয়া ভয় পাইতেছে দেখিলে, তাহাদের পরম কৌতুক বোধ হয়। লুণ্ঠনাবশেষে তাহারা গ্রামের লোকদের উৎপীড়ন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। দুইজন মান্য ব্রাহ্মণকে পিঠে পিঠে সংলগ্ন করিয়া টিকিতে টিকিতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য প্রয়োগ করে। দুই ঘোড়ার পিঠে একজন মানুষকে চড়াইয়া ঘোড়াদুটাকে চাবুক মারে; দুই ঘোড়া দুই বিপরীত দিকে ছুটিয়া যায়, মাঝখানে মানুষটা পড়িয়া গিয়া হাত-পা ভাঙে। এইরূপ প্রতিদিন নূতন নূতন খেলা তাহারা আবিষ্কার করে। অকারণে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া যায়। বলে যে, বাদশাহের সম্মানার্থ বাজি পুড়াইতেছে। সৈন্যদের পথে এইরূপ অত্যাচারের শত শত চিহ্ন পড়িয়া আছে। এখানে রঘুপতি আতিথ্য পাইবেন কোথায়। কোনোদিন অনাহারে কোনোদিন অল্পাহারে কাটিতে লাগিল। রাত্রে অন্ধকারে এক ভগ্ন পরিত্যক্ত কুটিরে শ্রান্তদেহে শয়ন করিয়াছিলেন, সকালে উঠিয়া দেখেন এক ছিন্নশির মৃতদেহকে সমস্ত রাত্রি বালিশ করিয়া শুইয়াছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে রঘুপতি ক্ষুধিত হইয়া কোনো কুটিরে গিয়া দেখিলেন, একজন লোক তাহার ভাঙা সিন্দুকের উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে— বোধ হয় তাহার লুণ্ঠিত ধনের জন্য শোক করিতেছিল— কাছে গিয়া ঠেলিতেই সে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। মৃতদেহ মাত্র, তাহার জীবন অনেক কাল হইল চলিয়া গিয়াছে।

একদিন রঘুপতি এক কুটিরে শুইয়া আছেন। রাত্রি অবসান হয় নাই, কিছু বিলম্ব আছে। এমন সময় ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল। শরতের চন্দ্রালোকের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ছায়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনা গেল। রঘুপতি চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন।

তিনি উঠিতেই কতকগুলি স্ত্রীকণ্ঠ সভয়ে বলিয়া উঠিল "ও মা গো!" একজন পুরুষ অগ্রসর হইয়া বলিল, "কোন্ হায় রে?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, পথিক। তোমরা কে?"

"আমাদের এই ঘর। আমরা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছিলাম। মোগল সৈন্য চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া তবে এখানে আসিয়াছি।"

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোগল সৈন্য কোন্ দিকে গিয়াছে?"

তাহারা কহিল, "বিজয়গড়ের দিকে। এতক্ষণ বিজয়গড়ের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।"

রঘুপতি আর অধিক কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিজয়গড়ের দীর্ঘ বন ঠগীদের আড্ডা। বনের মধ্য দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই পথের দুই পার্শ্বে কত মনুষ্যকঙ্কাল নিহিত আছে, তাহাদের উপরে কেবল বনফুল ফুটিতেছে, আর কোনো চিহ্ন নাই। বনের মধ্যে বট আছে, বাবলা আছে, নিম আছে, শত শত প্রকারের লতা ও গুল্ম আছে। স্থানে স্থানে ডোবা অথবা পুকুরের মতো দেখা যায়। অবিশ্রাম পাতা পচিয়া পচিয়া তাহার জল একেবারে সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। ছোটো ছোটো সুঁড়ি পথ এ দিকে ও দিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া সাপের মতো অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গাছের ডালে ডালে পালে পালে হনুমান। বটগাছের ডালের উপর হইতে শত শত শিকড় এবং হনুমানের লেজ ঝুলিতেছে। ভাঙা মন্দিরের প্রাঙ্গণে শিউলি ফুলের গাছ সাদা সাদা ফুলে এবং হনুমানের দন্তবিকাশে একেবারে আচ্ছন্ন। সন্ধ্যাবেলায় বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া গাছের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখির চীৎকারে বনের ঘোর অন্ধকার যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হইতে থাকে। আজ এই বৃহৎ বনের মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। এই ডালে-পালায় লতায়-পাতায় তৃণে-গুল্মে জড়িত বৃহৎ গোলাকার অরণ্য, কুড়ি হাজার খরনখচঞ্চু সৈনিক বাজপক্ষীদের একটিমাত্র নীড় বলিয়া বোধ হইতেছে। সৈন্যসমাগম দেখিয়া অসংখ্য কাক কা কা করিয়া দল বাঁধিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে— সাহস করিয়া ডালের উপর আসিয়া বসিতেছে না। কোনো প্রকার গোলমাল করিতে সেনাপতির নিষেধ আছে। সৈন্যেরা সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাবেলায় বনে আসিয়া শুষ্ক কাঠ কুড়াইয়া রন্ধন করিতেছে ও পরস্পর চুপিচুপি কথা কহিতেছে— তাহাদের সেই গুন্ গুন্ শব্দে সমস্ত অরণ্য গম্ গম্ করিতেছে, সন্ধ্যাবেলার ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাইতেছে না। গাছের গুঁড়িতে বাঁধা অশ্বেরা মাঝে মাঝে ক্ষুর দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে

ও হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিতেছে— সমস্ত বনের তাহাতে চমক লাগিতেছে। ভাঙা মন্দিরের কাছে ফাঁকা জায়গায় শাসুজার শিবির পড়িয়াছে। আর সকলের আজ বৃক্ষতলেই অবস্থান।

সমস্ত দিন অবিশ্রাম চলিয়া রঘুপতি যখন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন রাত্রি হইয়াছে। অধিকাংশ সৈন্য নিস্তব্ধে ঘুমাইতেছে, অল্পমাত্র সৈন্য নীরবে পাহারা দিতেছে। মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় আগুন জ্বলিতেছে— অন্ধকার যেন বহু কষ্টে নিদ্রাক্রান্ত রাঙা চক্ষু মেলিয়াছে। রঘুপতি বনের মধ্যে পা দিয়াই কুড়ি হাজার সৈনিকের নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেন শুনিতে পাইলেন। বনের সহস্র গাছ শাখা বিস্তার করিয়া পাহারা দিতেছে। কালপেচক তাহার সদ্যোজাত শাবকের উপরে যেমন পক্ষ বিস্তারিত করিয়া বসিয়া থাকে, তেমনি অরণ্যের বাহিরকার বিরাট রাত্রি অরণ্যের ভিতরকার গাঢ়তর রাত্রির উপর চাপিয়া ডানা ঝাঁপিয়া নীরবে বসিয়া আছে— অরণ্যের ভিতরে এক রাত্রি মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া আছে, অরণ্যের বাহিরে এক রাত্রি মাথা তুলিয়া জাগিয়া আছে। রঘুপতি সে রাত্রে বনপ্রান্তে শুইয়া রহিলেন।

সকালে গোটা দুই চার খোঁচা খাইয়া ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন জন-কত পাগড়ি-বাঁধা দাড়ি-পরিপূর্ণ তুরানি সৈন্য বিদেশী ভাষায় তাঁহাকে কী বলিতেছে; শুনিয়া তিনি নিশ্চয় অনুমান করিয়া লইলেন, গালি। তিনিও বঙ্গভাষায় তাহাদের শ্যালক-সম্বন্ধ প্রচার করিয়া দিলেন। তাহারা তাঁহাকে টানাটানি করিতে লাগিল।

রঘুপতি বলিলেন, "ঠাট্টা পেয়েছিস?" কিন্তু তাহাদের আচরণে ঠাট্টার লক্ষণ কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না। বনের মধ্য দিয়া তাহারা তাঁহাকে অকাতরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

তিনি সবিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "টানাটানি কর কেন? আমি আপনিই যাচ্ছি। এত পথ আমি এলুম কী করতে?"

সৈন্যেরা হাসিতে লাগিল ও তাঁহার বাংলা কথা নকল করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার চতুর্দিকে বিস্তর সৈন্য জড়ো হইল, তাঁহাকে লইয়া ভারী গোল পড়িয়া গেল। উৎপীড়নেরও সীমা রহিল না। একজন সৈন্য একটা কাঠবিড়ালির লেজ ধরিয়া তাঁহার মুণ্ডিত মাথায় ছাড়িয়া দিল— দেখিবার ইচ্ছা, ফল মনে করিয়া খায় কি না। একজন সৈন্য তাঁহার নাকের সম্মুখে একটা মোটা বেত বাঁকাইয়া ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সেটা ছাড়িয়া দিলে রঘুপতির মুখের উপর হইতে নাকের সমুন্নত মহিমা একেবারে সমূলে লোপ হইবার সম্ভাবনা। সৈন্যদের হাস্যে কানন ধ্বনিত হইতে লাগিল। মধ্যাহ্নে আজ যুদ্ধ করিতে হইবে, সকালে তাই রঘুপতিকে লইয়া

তাহাদের ভারী খেলা পড়িয়া গেল। খেলার সাধ মিটিলে পর ব্রাহ্মণকে সুজার শিবিরে লইয়া গেল।

সুজাকে দেখিয়া রঘুপতি সেলাম করিলেন না। তিনি দেবতা ও স্ববর্ণ ছাড়া আর কাহারও কাছে কখনও মাথা নত করেন নাই। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; হাত তুলিয়া বলিলেন, "শাহেন শার জয় হউক।"

সুজা মদের পেয়ালা লইয়া সভাসদ্‌-সমেত বসিয়াছিলেন; আলস্যবিজড়িত স্বরে নিতান্ত উপেক্ষাভরে কহিলেন "কী, ব্যাপার কী!"

সৈন্যেরা কহিল, "জনাব, শত্রুপক্ষের চর গোপনে আমাদের বলাবল জানিতে আসিয়াছিল; আমরা তাহাকে প্রভুর কাছে ধরিয়া আনিয়াছি।"

সুজা কহিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা! বেচারা দেখিতে আসিয়াছে, উহাকে ভালো করিয়া সমস্ত দেখাইয়া ছাড়িয়া দাও। দেশে গিয়া গল্প করিবে।"

রঘুপতি বদ হিন্দুস্থানিতে কহিলেন, "সরকারের অধীনে আমি কর্ম প্রার্থনা করি।"

সুজা আলস্যভরে হাত নাড়িয়া তাঁহাকে দ্রুত চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। বলিলেন, "গরম।" যে বাতাস করিতেছিল, সে দ্বিগুণ জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

দারা তাঁহার পুত্র সুলেমানকে রাজা জয়সিংহের অধীনে সুজার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের বৃহৎ সৈন্যদল নিকটবর্তী হইয়াছে, সংবাদ আসিয়াছে। তাই বিজয়গড়ের কেল্লা অধিকার করিয়া সেইখানে সৈন্য সমবেত করিবার জন্য সুজা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুজার হাতে কেল্লা এবং সরকারী খাজনা সমর্পণ করিবার প্রস্তাব লইয়া বিজয়গড়ের অধিপতি বিক্রমসিংহের নিকট দূত গিয়াছিল। বিক্রমসিংহ সেই দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি কেবল দিল্লীশ্বর শাজাহান এবং জগদীশ্বর ভবানীপতিকে জানি। সুজা কে, আমি তাহাকে জানি না।"

সুজা জড়িত স্বরে কহিলেন, "ভারী বেআদব! নাহক আবার লড়াই করিতে হইবে। ভারী হাঙ্গাম!"

রঘুপতি এই-সমস্ত শুনিতে পাইলেন। সৈন্যদের হাত এড়াইবামাত্র বিজয়গড়ের দিকে চলিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পাহাড়ের উপরে বিজয়গড়। বিজয়গড়ের অরণ্য গড়ের কাছাকাছি গিয়া শেষ হইয়াছে। অরণ্য হইতে বাহির হইয়া রঘুপতি সহসা দেখিলেন, দীর্ঘ পাষাণদুর্গ যেন নীল আকাশে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য যেমন তাহার সহস্র তরুজালে প্রচ্ছন্ন, দুর্গ তেমনি আপনার পাষাণের মধ্যে আপনি রুদ্ধ। অরণ্য সাবধানী, দুর্গ সতর্ক। অরণ্য ব্যাঘ্রের মতো গুঁড়ি মারিয়া লেজ পাকাইয়া বসিয়া আছে, দুর্গ সিংহের মতো কেশর ফুলাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতেছে, দুর্গ আকাশে মাথা তুলিয়া দেখিতেছে।

রঘুপতি অরণ্য হইতে বাহির হইবামাত্র দুর্গপ্রাকারের উপরে সৈন্যরা সচকিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল। দুর্গ যেন সহসা সিংহনাদ করিয়া দাঁত নখ মেলিয়া ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইল। রঘুপতি পইতা দেখাইয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যেরা সতর্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রঘুপতি যখন দুর্গপ্রাচীরের কাছাকাছি গেলেন তখন সৈন্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "তুমি কে ?"

রঘুপতি বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, অতিথি।"

দুর্গাধিপতি বিক্রমসিংহ পরম ধর্মনিষ্ঠ। দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথি -সেবায় নিযুক্ত। পইতা থাকিলে দুর্গপ্রবেশের জন্য আর কোনো পরিচয়ের আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আজ যুদ্ধের দিনে কী করা উচিত সৈন্যেরা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

রঘুপতি কহিলেন, "তোমরা আশ্রয় না দিলে মুসলমানদের হাতে আমাকে মরিতে হইবে।"

বিক্রমসিংহের কানে যখন এ কথা গেল তখন তিনি ব্রাহ্মণকে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় দিতে অনুমতি করিলেন। প্রাচীরের উপর হইতে একটা মই নামানো হইল, রঘুপতি দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গের মধ্যে যুদ্ধের প্রতীক্ষায় সকলেই ব্যস্ত। বৃদ্ধ খুড়াসাহেব ব্রাহ্মণ-অভ্যর্থনার ভার স্বয়ং লইলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম খড়্গসিংহ, কিন্তু তাঁহাকে কেহ বলে খুড়াসাহেব, কেহ বলে সুবাদার-সাহেব— কেন যে বলে তাহার কোনো কারণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নাই, ভাই নাই, তাঁহার খুড়া হইবার কোনো অধিকার বা সুদূর সম্ভাবনা নাই এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতগুলি তাঁহার সুবা তাহার অপেক্ষা অধিক নহে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ তাঁহার উপাধি সম্বন্ধে কোনোপ্রকার আপত্তি অথবা সন্দেহ উত্থাপিত করে নাই। যাহারা বিনা ভাইপোয় খুড়া, বিনা সুবায় সুবাদার, সংসারের

অনিত্যতা ও লক্ষ্মীর চপলতা -নিবন্ধন তাহাদের পদচ্যুতির কোনো আশঙ্কা নাই।

খুড়াসাহেব আসিয়া কহিলেন, "বাহবা, এই তো ব্রাহ্মণ বটে।" বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। রঘুপতির একপ্রকার তেজীয়ান দীপশিখার মতো আকৃতি ছিল, যাহা দেখিয়া সহসা পতঙ্গেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

খুড়াসাহেব জগতের বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর, তেমন ব্রাহ্মণ আজকাল ক'টা মেলে।"

রঘুপতি কহিলেন, "অতি অল্প।"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "আগে ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি ছিল, এখন সমস্ত অগ্নি জঠরে আশ্রয় লইয়াছে।"

রঘুপতি কহিলেন, "তাও কি আগেকার মতো আছে?"

খুড়াসাহেব মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঠিক কথা। অগস্ত্য মুনি যে-আন্দাজ পান করিয়াছিলেন সে-আন্দাজ যদি আহার করিতেন তাহা হইলে একবার বুঝিয়া দেখুন।"

রঘুপতি কহিলেন, "আরও দৃষ্টান্ত আছে।"

খুড়াসাহেব। হাঁ আছে বৈকি। জহ্নু মুনির পিপাসার কথা শুনা যায়, তাঁহার ক্ষুধার কথা কোথাও লেখে নাই, কিন্তু একটা অনুমান করা যাইতে পারে। হর্তুকি খাইলেই যে কম খাওয়া হয় তাহা নহে, ক'টা করিয়া হর্তুকি তাঁহারা রোজ খাইতেন তাহার একটা হিসাব থাকিলে তবু বুঝিতে পারিতাম।

রঘুপতি ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "না সাহেব, আহারের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট মনোযোগ ছিল না।"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া কহিলেন, "রাম রাম, বলেন কী ঠাকুর? তাঁহাদের জঠরানল যে অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। দেখুন-না কেন, কালক্রমে আর-সকল অগ্নিই নিবিয়া গেল, হোমের অগ্নিও আর জ্বলে না, কিন্তু --"

রঘুপতি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "হোমের অগ্নি আর জ্বলিবে কী করিয়া? দেশে ঘি রহিল কই? পাষণ্ডেরা সমস্ত গোরু পার করিয়া দিতেছে, এখন হব্য পাওয়া যায় কোথায়? হোমাগ্নি না জ্বলিলে ব্রহ্মতেজ আর কতদিন টেঁকে?"

বলিয়া রঘুপতি নিজের প্রচ্ছন্ন দাহিকাশক্তি অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন।

খুড়াসাহেব কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছেন ঠাকুর, গোরুগুলো মরিয়া আজকাল মনুষ্য-লোকে জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কাছ হইতে ঘি পাইবার প্রত্যাশা করা যায় না। মগজের সম্পূর্ণ অভাব। ঠাকুরের কোথা হইতে আসা হইতেছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "ত্রিপুরার রাজবাটী হইতে।"

বিজয়গড়ের বহিঃস্থিত ভারতবর্ষের ভূগোল অথবা ইতিহাস সম্বন্ধে খুড়াসাহেবের যৎসামান্য জানা ছিল। বিজয়গড় ছাড়া ভারতবর্ষে জানিবার যোগ্য যে আর-কিছু আছে তাহাও তাঁহার বিশ্বাস নহে। সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন, "আহা, ত্রিপুরার রাজা মস্ত রাজা।"

রঘুপতি তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

খুড়াসাহেব। ঠাকুরের কী করা হয়?

রঘুপতি। আমি ত্রিপুরার রাজপুরোহিত।

খুড়াসাহেব চোখ বুজিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আহা!" রঘুপতির উপরে তাঁহার ভক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

"কী করিতে আসা হইয়াছে?"

রঘুপতি কহিলেন, "তীর্থদর্শন করিতে।"

ধুম করিয়া আওয়াজ হইল। শত্রুপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। খুড়াসাহেব হাসিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, "ও কিছু নয়, ঢেলা ছুঁড়িতেছে।" বিজয়গড়ের উপরে খুড়াসাহেবের বিশ্বাস যত দৃঢ়, বিজয়গড়ের পাষাণ তত দৃঢ় নহে। বিদেশী পথিক দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেই খুড়াসাহেব তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন এবং বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য তাহার মনে বদ্ধমূল করিয়া দেন। ত্রিপুরার রাজবাটী হইতে রঘুপতি আসিয়াছেন, এমন অতিথি সচরাচর মেলে না, খুড়াসাহেব অত্যন্ত উল্লাসে আছেন অতিথির সঙ্গে বিজয়গড়ের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মার অণ্ড এবং বিজয়গড়ের দুর্গ যে প্রায় একই সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঠিক মনুর পর হইতেই মহারাজ বিক্রমসিংহের পূর্বপুরুষেরা যে এই দুর্গ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন সে বিষয়ে কোনো সংশয় থাকিতে পারে না। এই দুর্গের প্রতি শিবের কী বর আছে এবং এই দুর্গে কার্তবীর্যার্জুন যে কিরূপে বন্দী হইয়াছিলেন তাহাও রঘুপতির অগোচর রহিল না।

সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল শত্রুপক্ষ দুর্গের কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই। তাহারা কামান পাতিয়াছিল, কিন্তু কামানের গোলা দুর্গে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। খুড়াসাহেব হাসিয়া রঘুপতির দিকে চাহিলেন। মর্ম এই যে, দুর্গের প্রতি শিবের যে অমোঘ বর আছে তাহার এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কী হইতে পারে। বোধ করি, নন্দী স্বয়ং আসিয়া কামানের গোলাগুলি লুফিয়া লইয়া গিয়াছে, কৈলাসে গণপতি ও কার্তিকেয় ভাঁটা খেলিবেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শাসুজাকে কোনোমতে হস্তগত করাই রঘুপতির উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যখন শুনিলেন, সুজা দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন মনে করিলেন মিত্রভাবে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি কোনোরূপে সুজার দুর্গ আক্রমণে সাহায্য করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ যুদ্ধবিগ্রহের কোনো ধার ধারেন না, কী করিলে যে সুজার সাহায্য হইতে পারে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপক্ষ পক্ষ বারুদ দিয়া দুর্গপ্রাচীরের কিয়দংশ উড়াইয়া দিল কিন্তু ঘন ঘন গুলিবর্ষণের প্রভাবে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিল না। ভগ্ন অংশ দেখিতে দেখিতে গাঁথিয়া তোলা হইল। আজ মাঝে মাঝে দুর্গের মধ্যে গোলাগুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল, দুই-চারিজন করিয়া দুর্গ সৈন্য হত ও আহত হইতে লাগিল।

"ঠাকুর, কিছু ভয় নাই, এ কেবল খেলা হইতেছে" বলিয়া খুড়াসাহেব রঘুপতিকে লইয়া দুর্গের চারি দিক দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথায় অস্ত্রাগার, কোথায় ভাণ্ডার, কোথায় আহতদের চিকিৎসাগৃহ, কোথায় বন্দীশালা, কোথায় দরবার, এই সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন ও বার বার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রঘুপতি কহিলেন, "চমৎকার কারখানা। ত্রিপুরার গড় ইহার কাছে লাগিতে পারে না। কিন্তু সাহেব, গোপনে পলায়নের জন্য ত্রিপুরার গড়ে একটি আশ্চর্য সুরঙ্গ-পথ আছে, এখানে সেরূপ কিছুই দেখিতেছি না।"

খুড়াসাহেব কী একটা বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, "না, এ দুর্গে সেরূপ কিছুই নাই।"

রঘুপতি নিতান্ত আশ্চর্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এতবড়ো দুর্গে একটা সুরঙ্গ-পথ নাই, এ কেমন কথা হইল।"

খুড়াসাহেব কিছু কাতর হইয়া কহিলেন, "নাই, এ কি হইতে পারে? অবশ্যই আছে, তবে আমরা হয়তো কেহ জানি না।"

রঘুপতি হাসিয়া কহিলেন, "তবে তো না থাকারই মধ্যে। যখন আপনিই জানেন না তখন আর কেই বা জানে।"

খুড়াসাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে সহসা "হরি হে রাম রাম" বলিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলেন, তার পরে মুখে গোঁফে দাড়িতে দুই-এক-বার হাত বুলাইয়া হঠাৎ বলিলেন, "ঠাকুর, পূজা-অর্চনা লইয়া থাকেন,

আপনাকে বলিতে কোনো দোষ নাই— দুর্গ-প্রবেশের এবং দুর্গ হইতে বাহির হইবার দুইটা গোপন পথ আছে, কিন্তু বাহিরের কোনো লোককে তাহা দেখানো নিষেধ।"

রঘুপতি কিঞ্চিৎ সন্দেহের স্বরে কহিলেন, "বটে! তা হবে।"

খুড়াসাহেব দেখিলেন তাঁহারই দোষ, একবার "নাই" একবার "আছে" বলিলে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে। বিদেশীর চোখে ত্রিপুরার গড়ের কাছে বিজয়গড় কোনো অংশে খাটো হইয়া যাইবে ইহা খুড়াসাহেবের পক্ষে অসহ্য।

তিনি কহিলেন, "ঠাকুর, বোধ করি, আপনার ত্রিপুরা অনেক দূরে এবং আপনি ব্রাহ্মণ, দেবসেবাই আপনার একমাত্র কাজ, আপনার দ্বারা কিছুই প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

রঘুপতি কহিলেন, "কাজ কী সাহেব, সন্দেহ হয় তো ও-সব কথা থাক্-না। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে আমার দুর্গের খবরে কাজ কী।"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া কহিলেন, "আরে রাম রাম, আপনাকে আবার সন্দেহ কিসের। চলুন, একবার দেখাইয়া লইয়া আসি।"

এ দিকে সহসা দুর্গের বাহিরে সুজার সেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে সুজার শিবির ছিল, সুলেমান এবং জয়সিংহের সৈন্য আসিয়া সহসা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে এবং অলক্ষ্যে দুর্গ-আক্রমণকারীদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সুজার সৈন্যেরা লড়াই না করিয়া কুড়িটা কামান পশ্চাতে ফেলিয়া ভঙ্গ দিল।

দুর্গের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল। বিক্রমসিংহের নিকট সুলেমানের দূত পৌঁছিতেই তিনি দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিলেন, স্বয়ং অগ্রসর হইয়া সুলেমান ও রাজা জয়সিংহকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দিল্লীশ্বরের সৈন্য ও অশ্ব-গজে দুর্গ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নিশান উড়িতে লাগিল, শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজিতে লাগিল এবং খুড়াসাহেবের শ্বেত গুম্ফের নীচে শ্বেত হাস্য পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

খুড়াসাহেবের কী আনন্দের দিন! আজ দিল্লীশ্বরের রাজপুত সৈন্যেরা বিজয়গড়ের অতিথি হইয়াছে। প্রবলপ্রতাপান্বিত শাসুজা আজ বিজয়গড়ের বন্দী। কার্তবীর্যার্জুনের পর হইতে বিজয়গড়ে এমন বন্দী আর মেলে নাই। কার্তবীর্যার্জুনের বন্ধন-দশা স্মরণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া খুড়াসাহেব রাজপুত সুচেতসিংহকে বলিলেন, "মনে করিয়া

দেখো, হাজারটা হাতে শিকলি পরাইতে কী আয়োজনটাই করিতে হইয়াছিল। কলিযুগ পড়িয়া অবধি ধুমধাম বিলকুল কমিয়া গিয়াছে। এখন রাজার ছেলেই হউক আর বাদশাহের ছেলেই হউক বাজারে দুখানার বেশি হাত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঁধিয়া সুখ নাই।"

সুচেতসিংহ হাসিয়া নিজের হাতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই দুইখানা হাতই যথেষ্ট।"

খুড়াসাহেব কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, "তা বটে, সেকালে কাজ ছিল ঢের বেশি। আজকাল কাজ এত কম পড়িয়াছে যে, এই দুইখানা হাতেরই কোনো কৈফিয়ত দেওয়া যায় না। আরো হাত থাকিলে আরো গোঁফে তা দিতে হইত।"

আজ খুড়াসাহেবের বেশভূষার ত্রুটি ছিল না। চিবুকের নীচে হইতে পাকা দাড়ি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার দুই কানে লটকাইয়া দিয়াছেন। গোঁফজোড়া পাকাইয়া কর্ণরন্ধ্রের কাছাকাছি লইয়া গিয়াছেন। মাথায় বাঁকা পাগড়ি, কটিদেশে বাঁকা তলোয়ার। জরির জুতার সম্মুখভাগ শিঙের মতো বাঁকিয়া পাকাইয়া উঠিয়াছে। আজ খুড়াসাহেবের চলিবার এমনি ভঙ্গি, যেন বিজয়গড়ের মহিমা তাঁহারই সর্বাঙ্গে তরঙ্গিত হইতেছে। আজ এই-সমস্ত সমজদার লোকের নিকটে বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য প্রমাণ হইয়া যাইবে এই আনন্দে তাঁহার আহারনিদ্রা নাই।

সুচেতসিংহকে লইয়া প্রায় সমস্ত দিন দুর্গ পর্যবেক্ষণ করিলেন। সুচেতসিংহ যেখানে কোনোপ্রকার আশ্চর্য প্রকাশ না করেন সেখানে খুড়াসাহেব স্বয়ং "বাহবা বাহবা" করিয়া নিজের উৎসাহ রাজপুত বীরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করেন। বিশেষত দুর্গপ্রাকারের গাঁথুনি সম্বন্ধে তাঁহাকে সবিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল। দুর্গপ্রাকার যেরূপ অবিচলিত, সুচেতসিংহও ততোধিক— তাঁহার মুখে কোনোপ্রকারই ভাব প্রকাশ পাইল না। খুড়াসাহেব ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে একবার দুর্গপ্রাকারের বামে একবার দক্ষিণে, একবার উপরে একবার নীচে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিলেন— বার বার বলিতে লাগিলেন, "কী তারিফ!" কিন্তু কিছুতেই সুচেতসিংহের হৃদয়দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া সুচেতসিংহ বলিয়া উঠিলেন "আমি ভরতপুরের গড় দেখিয়াছি, আর-কোনো গড় আমার চোখে লাগেই না।"

খুড়াসাহেব কাহারও সঙ্গে কখনও বিবাদ করেন না; নিতান্ত ম্লান হইয়া বলিলেন, "অবশ্য, অবশ্য। এ কথা বলিতে পারো বটে।"

নিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গ সম্বন্ধে আলোচনা পরিত্যাগ করিলেন। বিক্রমসিংহের

পূর্বপুরুষ দুর্গাসিংহের কথা উঠাইলেন। তিনি বলিলেন, "দুর্গাসিংহের তিন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র চিত্রসিংহের এক আশ্চর্য অভ্যাস ছিল। তিনি প্রতিদিন প্রাতে আধ সের আন্দাজ ছোলা দুধে সিদ্ধ করিয়া খাইতেন। তাঁহার শরীরও তেমনি ছিল। আচ্ছা জি, তুমি যে ভরতপুরের গড়ের কথা বলিতেছ, সে অবশ্য খুব মস্ত গড়ই হইবে— কিন্তু কই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তো তাহার কোনো উল্লেখ নাই।"

সুচেতসিংহ হাসিয়া কহিলেন, "তাহার জন্য কাজের কোনো ব্যাঘাত হইতেছে না।"

খুড়াসাহেব কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, "হা হা হা! তা ঠিক, তা ঠিক! তবে কি জানো, ত্রিপুরার গড়ও বড়ো কম নহে, কিন্তু বিজয়গড়ের—"

সুচেতসিংহ। ত্রিপুরা আবার কোন্ মুল্লুকে?

খুড়াসাহেব। সে ভারী মুল্লুক। অত কথায় কাজ কী, সেখানকার রাজপুরোহিত-ঠাকুর আমাদের গড়ে অতিথি আছেন, তুমি তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিবে।

কিন্তু ব্রাহ্মণকে আজ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। খুড়াসাহেবের প্রাণ সেই ব্রাহ্মণের জন্য কাঁদিতে লাগিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "এই রাজপুত গ্রাম্যগুলোর চেয়ে সে ব্রাহ্মণ অনেক ভালো।" সুচেতসিংহের নিকটে শতমুখে রঘুপতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বিজয়গড় সম্বন্ধে রঘুপতির কী মত তাহাও ব্যক্ত করিলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

খুড়াসাহেবের হাত এড়াইতে সুচেতসিংহকে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইল না। কাল প্রাতে বন্দী-সমেত সম্রাট সৈন্যের যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে, যাত্রার আয়োজনে সৈন্যেরা নিযুক্ত হইল।

বন্দীশালায় শাসুজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কহিতেছেন, "ইহারা কী বেআদব! শিবির হইতে আমার আলবোলাটা আনিয়া দিবে, তাহাও ইহাদের মনে উদয় হইল না।"

বিজয়গড়ের পাহাড়ের নিম্নভাগে এক গভীর খাল আছে। সেই খালের ধারে এক স্থানে একটি বজ্রদগ্ধ অশথের গুঁড়ি আছে। সেই গুঁড়ির কাছ-বরাবর রঘুপতি গভীর রাত্রে ডুব দিলেন ও অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গোপনে দুর্গ-প্রবেশের জন্য যে সুরঙ্গ-পথ আছে এই খালের গভীর তলেই তাহার প্রবেশের মুখ। এই পথ বাহিয়া সুরঙ্গ-প্রান্তে পৌঁছিয়া নীচে হইতে সবলে ঠেলিলেই

একটি পাথর উঠিয়া পড়ে, উপর হইতে তাহাকে কিছুতেই উঠানো যায় না। সুতরাং যাহারা দুর্গের ভিতরে আছে তাহারা এ পথ দিয়া বাহির হইতে পারে না।

বন্দীশালার পালঙ্কের উপরে সুজা নিদ্রিত। পালঙ্ক ছাড়া গৃহে আর কোনো সজ্জা নাই। একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সহসা গৃহে ছিদ্র প্রকাশ পাইল। অল্পে অল্পে মাথা তুলিয়া পাতাল হইতে রঘুপতি উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজা। সিক্ত বস্ত্র হইতে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। রঘুপতি ধীরে ধীরে সুজাকে স্পর্শ করিলেন।

সুজা চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু রগড়াইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তার পরে আলস্য-জড়িত স্বরে কহিলেন, "কী হাঙ্গাম! ইহারা কি আমাকে রাত্রেও ঘুমাইতে দিবে না! তোমাদের ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়াছি।"

রঘুপতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "শাহাজাদা, উঠিতে আজ্ঞা হউক। আমি সেই ব্রাহ্মণ। আমাকে স্মরণ করিয়া দেখুন। ভবিষ্যতেও আমাকে স্মরণে রাখিবেন।"

পরদিন প্রাতে সম্রাট্‌-সৈন্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। সুজাকে নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য রাজা জয়সিংহ স্বয়ং বন্দীশালায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সুজা তখনো শয্যা হইতে উঠেন নাই। কাছে গিয়া স্পর্শ করিলেন। দেখিলেন, সুজা নহে, তাঁহার বস্ত্র পড়িয়া আছে। সুজা নাই। ঘরের মেঝের মধ্যে সুরঙ্গ-গহ্বর, তাহার প্রস্তর-আবরণ উন্মুক্ত পড়িয়া আছে।

বন্দীর পলায়নবার্তা দুর্গে রাষ্ট্র হইল। সন্ধানের জন্য চারি দিকে লোক ছুটিল। রাজা বিক্রমসিংহের শির নত হইল। বন্দী কিরূপে পলাইল তাহার বিচারের জন্য সভা বসিল।

খুড়াসাহেবের সেই গর্বিত সহর্ষ ভাব কোথায় গেল! তিনি পাগলের মতো 'ব্রাহ্মণ কোথায়' 'ব্রাহ্মণ কোথায়' করিয়া রঘুপতিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রাহ্মণ কোথাও নাই। পাগড়ি খুলিয়া খুড়াসাহেব কিছুকাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। সুচেতসিংহ পাশে আসিয়া বসিলেন; কহিলেন, "খুড়াসাহেব, কী আশ্চর্য কারখানা! এ কি সমস্ত ভূতের কাণ্ড!"

খুড়াসাহেব বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না, এ ভূতের কাণ্ড নয় সুচেতসিংহ, এ একজন নিতান্ত নির্বোধ বৃদ্ধের কাণ্ড ও আর-একজন বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডের কাজ।"

সুচেতসিংহ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুমি যদি তাহাদের জানোই তবে তাহাদের গ্রেফতার করিয়া দাও-না কেন?"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "তাহাদের মধ্যে একজন পালাইয়াছে। আর-একজনকে গ্রেফ্‌তার করিয়া রাজসভায় লইয়া যাইতেছি।"

বলিয়া পাগড়ি পরিলেন ও রাজসভার বেশ ধারণ করিলেন।

সভায় তখন প্রহরীদের সাক্ষ্য লওয়া হইতেছিল। খুড়াসাহেব নতশিরে সভায় প্রবেশ করিলেন। বিক্রমসিংহের পদতলে তলোয়ার খুলিয়া রাখিয়া কহিলেন, "আমাকে বন্দী করিতে আদেশ করুন, আমি অপরাধী।"

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খুড়াসাহেব, ব্যাপার কী!"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "সেই ব্রাহ্মণ! এ সমস্ত সেই বাঙালি ব্রাহ্মণের কাজ।"

রাজা জয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "আমি বিজয়গড়ের বৃদ্ধ খুড়াসাহেব।"

জয়সিংহ। তুমি কী করিয়াছ?

খুড়াসাহেব। আমি বিজয়গড়ের সন্ধান ভেদ করিয়া বিশ্বাসঘাতকের কাজ করিয়াছি। আমি নিতান্ত নির্বোধের মতো বিশ্বাস করিয়া বাঙালি ব্রাহ্মণকে সুরঙ্গ-পথের কথা বলিয়াছিলাম—

বিক্রমসিংহ সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "খড়্গাসিং!"

খুড়াসাহেব চমকিয়া উঠিলেন— তিনি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার নাম খড়্গাসিংহ।

বিক্রমসিংহ কহিলেন, "খড়্গাসিং, এতদিন পরে তুমি কি আবার শিশু হইয়াছ!"

খুড়াসাহেব নতশিরে চুপ করিয়া রহিলেন।

বিক্রমসিংহ। খুড়াসাহেব, তুমি এই কাজ করিলে! তোমার হাতে আজ বিজয়গড়ের অপমান হইল!"

খুড়াসাহেব চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হাত থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত হস্তে কপাল স্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিলেন, "অদৃষ্ট!"

বিক্রমসিংহ কহিলেন, "আমার দুর্গ হইতে দিল্লীশ্বরের শত্রু পলায়ন করিল! জানো তুমি আমাকে দিল্লীশ্বরের নিকটে অপরাধী করিয়াছ!"

খুড়াসাহেব কহিলেন, "আমিই একা অপরাধী। মহারাজ অপরাধী এ কথা দিল্লীশ্বর বিশ্বাস করিবেন না।"

বিক্রমসিংহ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কে? তোমার খবর দিল্লীশ্বর কী রাখেন? তুমি তো আমারই লোক। এ যেন আমি নিজের হাতে বন্দীর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়াছি।"

খুড়াসাহেব নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তিনি চোখের জল আর সামলাইতে পারিলেন না।

বিক্রমসিংহ কহিলেন, "তোমাকে কী দণ্ড দিব ?'

খুড়াসাহেব। মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

বিক্রমসিংহ। তুমি বুড়ামানুষ, তোমাকে অধিক আর কী দণ্ড দিব নির্বাসন দণ্ডই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

খুড়াসাহেব বিক্রমসিংহের পা জড়াইয়া ধরিলেন; কহিলেন, "বিজয়গড় হইতে নির্বাসন! না মহারাজ, আমি বৃদ্ধ, আমার মতিভ্রম হইয়াছিল। আমাকে বিজয়-গড়েই মরিতে দিন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিয়া দিন। এই বুড়া বয়সে শেয়াল-কুকুরের মতো আমাকে বিজয়গড় হইতে খেদাইয়া দিবেন না।"

রাজা জয়সিংহ কহিলেন, "মহারাজ, আমার অনুরোধে ইহার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি সম্রাটকে সমস্ত অবস্থা অবগত করিব।"

খুড়াসাহেবের মার্জনা হইল। সভা হইতে বাহির হইবার সময় খুড়াসাহেব কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন। সেদিন হইতে খুড়াসাহেবকে আর বড়ো একটা দেখা যাইত না। তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেন না। তাঁহার মেরুদণ্ড যেন ভাঙিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

গুজুরপাড়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে ক্ষুদ্র গ্রাম। একজন ক্ষুদ্র জমিদার আছেন, নাম পীতাম্বর রায়; বাসিন্দা অধিক নাই। পীতাম্বর আপনার পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া থাকেন; তাঁহার প্রজারাও তাঁহাকে রাজা বলিয়া থাকে। তাঁহার রাজমহিমা এই আম্রপিয়ালবনবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামটুকুর মধ্যেই বিরাজমান। তাঁহার যশ এই গ্রামের নিকুঞ্জগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইয়া এই গ্রামের সীমানার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। জগতের বড়ো বড়ো রাজাধিরাজের প্রখর প্রতাপ এই ছায়াময় নীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। কেবল তীর্থস্নানের উদ্দেশে নদীতীরে ত্রিপুরার রাজাদের এক বৃহৎ প্রাসাদ আছে, কিন্তু অনেক কাল হইতে রাজারা কেহ স্নানে আসেন নাই, সুতরাং ত্রিপুরার রাজার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি প্রচলিত আছে মাত্র।

একদিন ভাদ্রমাসের দিনে গ্রামে সংবাদ আসিল, ত্রিপুরার এক রাজকুমার নদী-তীরের পুরাতন প্রাসাদে বাস করিতে আসিতেছেন। কিছুদিন পরে বিস্তর পাগড়ি-বাঁধা লোক আসিয়া প্রাসাদে ভারী ধুম লাগাইয়া দিল। তাহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে হাতিঘোড়া লোকলস্কর লইয়া স্বয়ং নক্ষত্ররায় গুজুরপাড়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমারোহ দেখিয়া গ্রামবাসীদের মুখে যেন রা সরিল না। পীতাম্বরকে এতদিন ভারী রাজা বলিয়া মনে হইত, কিন্তু আজ আর তাহা কাহারও মনে হইল না; নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিল, "হাঁ, রাজপুত্র এইরকমই হয় বটে।"

এইরূপে পীতাম্বর তাঁহার পাকা দালান ও চণ্ডীমণ্ডপসুদ্ধ একেবারে লুপ্ত হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। নক্ষত্ররায়কে তিনি এমনি রাজা বলিয়া অনুভব করিলেন যে নিজের ক্ষুদ্র রাজমহিমা নক্ষত্ররায়ের চরণে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া তিনি পরম সুখী হইলেন। নক্ষত্ররায় কদাচিৎ হাতি চড়িয়া বাহির হইলে পীতাম্বর আপনার প্রজাদের ডাকিয়া বলিতেন, "রাজা দেখেছিস? ওই দেখ্ রাজা দেখ্।" মাছ-তরকারি আহার্য দ্রব্য উপহার লইয়া পীতাম্বর প্রতিদিন নক্ষত্ররায়কে দেখিতে আসিতেন – নক্ষত্ররায়ের তরুণ সুন্দর মুখ দেখিয়া পীতাম্বরের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। নক্ষত্ররায়ই গ্রামের রাজা হইয়া উঠিলেন। পীতাম্বর প্রজাদের মধ্যে গিয়া ভর্তি হইলেন।

প্রতিদিন তিন বেলা নহবত বাজিতে লাগিল, গ্রামের পথে হাতি-ঘোড়া চলিতে লাগিল, রাজদ্বারে মুক্ত তরবারির বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, হাটবাজার বসিয়া গেল। পীতাম্বর এবং তাঁহার প্রজারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। নক্ষত্ররায় এই নির্বাসনের রাজা হইয়া উঠিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিলেন। এখানে রাজত্বের ভার কিছুমাত্র নাই, অথচ রাজত্বের সুখ সম্পূর্ণ আছে। এখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বদেশে তাঁহার এত প্রবল প্রতাপ ছিল না। তাহা ছাড়া, এখানে রঘুপতির ছায়া নাই। মনের উল্লাসে নক্ষত্র-রায় বিলাসে মগ্ন হইলেন। ঢাকা নগরী হইতে নটনটী আসিল, নৃত্যগীতবাদ্যে নক্ষত্ররায়ের তিলেক অরুচি নাই।

নক্ষত্ররায় ত্রিপুরার রাজ অনুষ্ঠান সমস্তই অবলম্বন করিলেন। ভৃত্যদের মধ্যে কাহারও নাম রাখিলেন মন্ত্রী, কাহারও নাম রাখিলেন সেনাপতি, পীতাম্বর দেওয়ানজি নামে চলিত হইলেন। রীতিমত রাজ-দরবার বসিত। নক্ষত্ররায় পরম আড়ম্বরে বিচার করিতেন। নকুড় আসিয়া নালিশ করিল, "মথুর আমায় 'কুত্তো' কয়েছে।" তাহার বিধিমত বিচার বসিল। বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহের পর মথুর দোষী সাব্যস্ত

হইলে নক্ষত্ররায় পরম গম্ভীরভাবে বিচারাসন হইতে আদেশ করিলেন— নকুড় মথুরকে দুই কানমলা দেয়। এইরূপে সুখে সময় কাটিতে লাগিল। এক-একদিন হাতে নিতান্ত কাজ না থাকিলে সৃষ্টিছাড়া একটা কোনো নূতন আমোদ উদ্ভাবনের জন্য মন্ত্রীকে তলব পড়িত। মন্ত্রী রাজসভাসদ্‌দিগকে সমবেত করিয়া নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন ব্যাকুলভাবে নূতন খেলা বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, গভীর চিন্তা এবং পরামর্শের অবধি থাকিত না। একদিন সৈন্যসামন্ত লইয়া পীতাম্বরের চণ্ডীমণ্ডপ আক্রমণ করা হইয়াছিল, এবং তাঁহার পুকুর হইতে মাছ ও তাঁহার বাগান হইতে ডাব ও পালংশাক লুঠের দ্রব্যের স্বরূপ অত্যন্ত ধুম করিয়া বাদ্য বাজাইয়া প্রাসাদে আনা হইয়াছিল। এইরূপ খেলাতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি পীতাম্বরের স্নেহ আরো গাঢ় হইত।

আজ প্রাসাদে বিড়াল-শাবকের বিবাহ। নক্ষত্ররায়ের একটি শিশু বিড়ালী ছিল, তাহার সহিত মণ্ডলদের বিড়ালের বিবাহ হইবে। চুড়োমণি ঘটক ঘটকালির স্বরূপ তিন শত টাকা ও একটা শাল পাইয়াছে। গায়ে হলুদ প্রভৃতি সমস্ত উপক্রমণিকা হইয়া গিয়াছে। আজ শুভলগ্নে সন্ধ্যার সময়ে বিবাহ হইবে। এ কয় দিন রাজবাটীতে কাহারও তিলার্ধ অবসর নাই।

সন্ধ্যার সময় পথঘাট আলোকিত হইল, নহবত বসিল। মণ্ডলদের বাড়ি হইতে চতুর্দোলায় চড়িয়া কিংখাবের বেশ পরিয়া পাত্র অতি কাতর স্বরে মিউ মিউ করিতে করিতে যাত্রা করিয়াছে। মণ্ডলদের বাড়ির ছোটো ছেলেটি মিত-বরের মতো তাহার গলার দড়িটি ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। উলু-শঙ্খধ্বনির মধ্যে পাত্র সভাস্থ হইল।

পুরোহিতের নাম কেনারাম, কিন্তু নক্ষত্ররায় তাহার নাম রাখিয়াছিলেন রঘুপতি। নক্ষত্ররায় আসল রঘুপতিকে ভয় করিতেন, এইজন্য নকল রঘুপতিকে লইয়া খেলা করিয়া সুখী হইতেন। এমন-কি, কথায় কথায় তাহাকে উৎপীড়ন করিতেন; গরিব কেনারাম সমস্ত নীরবে সহ্য করিত। আজ দৈবদুর্বিপাকে কেনারাম সভায় অনুপস্থিত— তাহার ছেলেটি জ্বরবিকারে মরিতেছে।

নক্ষত্ররায় অধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুপতি কোথায়?"

ভৃত্য বলিল, "তাঁহার বাড়িতে ব্যামো।"

নক্ষত্ররায় দ্বিগুণ হাঁকিয়া বলিলেন, "বোলাও উস্‌কো।"

লোক ছুটিল। ততক্ষণ রোরুদ্যমান বিড়ালের সমক্ষে নাচগান চলিতে লাগিল।

নক্ষত্ররায় বলিলেন, "সাহানা গাও।" সাহানা গান আরম্ভ হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল, "রঘুপতি আসিয়াছেন।"

নক্ষত্ররায় সরোষে বলিলেন, "বোলাও।"

তৎক্ষণাৎ পুরোহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিতকে দেখিয়াই নক্ষত্ররায়ের ভ্রূকুটি কোথায় মিলাইয়া গেল, তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কপালে ঘর্ম দেখা দিল। সাহানা গান, সারঙ্গ ও মৃদঙ্গ সহসা বন্ধ হইল ; কেবল বিড়ালের মিউ মিউ ধ্বনি নিস্তব্ধ ঘরে দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিল।

এ রঘুপতিই বটে। তাহার আর সন্দেহ নাই। দীর্ঘ, শীর্ণ, তেজস্বী, বহুদিনের ক্ষুধিত কুকুরের মতো চক্ষু দুটো জ্বলিতেছে। ধুলায় পরিপূর্ণ দুই পা তিনি কিংখাব মছলন্দের উপর স্থাপন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "নক্ষত্ররায়!"

নক্ষত্ররায় চুপ করিয়া রহিলেন।

রঘুপতি বলিলেন, "তুমি রঘুপতিকে ডাকিয়াছ। আমি আসিয়াছি।"

নক্ষত্ররায় অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, "ঠাকুর—ঠাকুর!"

রঘুপতি কহিলেন, "উঠিয়া এস।"

নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। বিড়ালের বিয়ে, সাহানা এবং সারঙ্গ একেবারে বন্ধ হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব কী হইতেছিল?"

নক্ষত্ররায় মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, "নাচ হইতেছিল।"

রঘুপতি ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া কহিলেন, "ছী ছি!"

নক্ষত্র অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "কাল এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। তাহার উদ্‌যোগ করো।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কোথায় যাইতে হইবে?"

রঘুপতি। সে কথা পরে হইবে। আপাতত আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ো।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি। বেশ আছি! তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ, তোমার পূর্বপুরুষেরা সকলে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। তুমি কিনা আজ এই বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হইয়া বসিয়াছ আর বলিতেছ 'বেশ আছি'!

রঘুপতি তীব্র বাক্যে ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, নক্ষত্ররায় ভালো নাই। নক্ষত্ররায়ও রঘুপতির মুখের তেজে কতকটা সেইরকমই বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "বেশ আর কী এমনি আছি! কিন্তু আর কী করিব? উপায় কী আছে?"

রঘুপতি। উপায় ঢের আছে— উপায়ের অভাব নাই। আমি তোমাকে উপায় দেখাইয়া দিব, তুমি আমার সঙ্গে চলো।

নক্ষত্ররায়। একবার দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করি।

রঘুপতি। না।

নক্ষত্ররায়। আমার এই সব জিনিসপত্র

রঘুপতি। কিছু আবশ্যক নাই।

নক্ষত্ররায়। লোকজন—

রঘুপতি। দরকার নাই।

নক্ষত্ররায়। আমার হাতে এখন যথেষ্ট নগদ টাকা নাই।

রঘুপতি। আমার আছে। আর অধিক ওজর আপত্তি করিয়ো না। আজ শয়ন করিতে যাও, কাল প্রাতঃকালেই যাত্রা করিতে হইবে।

বলিয়া রঘুপতি কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পরদিন ভোরে নক্ষত্ররায় উঠিয়াছেন। তখন বন্দীরা ললিত রাগিণীতে মধুর গান গাহিতেছে। নক্ষত্ররায় বহির্ভবনে আসিয়া জানলা হইতে বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। পূর্বতীরে সূর্যোদয় হইতেছে, অরুণরেখা দেখা দিয়াছে। উভয় তীরের ঘন তরুস্রোতের মধ্য দিয়া, ছোটো ছোটো নিদ্রিত গ্রামগুলির দ্বারের কাছ দিয়া ব্রহ্মপুত্র তাহার বিপুল জলরাশি লইয়া অবাধে বহিয়া যাইতেছে। প্রাসাদের জানলা হইতে নদীতীরের একটি ছোটো কুটির দেখা যাইতেছে। একটি মেয়ে প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতেছে— একজন পুরুষ তাহার সঙ্গে দুই-একটা কথা কহিয়া মাথায় চাদর বাঁধিয়া, একটা বড়ো বাঁশের লাঠির অগ্রভাগে পুঁটুলি লইয়া নিশ্চিন্তমনে কোথায় বাহির হইল। শ্যামা ও দোয়েল শিস দিতেছে, বেনে-বউ বড়ো কাঁঠাল গাছের ঘন পল্লবের মধ্যে বসিয়া গান গাহিতেছে। বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নক্ষত্ররায়ের হৃদয় হইতে এক গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে রঘুপতি আসিয়া নক্ষত্ররায়কে স্পর্শ করিলেন। নক্ষত্ররায় চমকিয়া উঠিলেন। রঘুপতি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত।"

নক্ষত্ররায় জোড়হাতে অত্যন্ত কাতর স্বরে কহিলেন, "ঠাকুর, আমাকে মাপ করো ঠাকুর— আমি কোথাও যাইতে চাহি না। আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি একটি কথা না বলিয়া নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে তাঁহার অগ্নিদৃষ্টি স্থির রাখিলেন। নক্ষত্ররায় চোখ নামাইয়া কহিলেন, "কোথায় যাইতে হইবে ?"

রঘুপতি। সে কথা এখন হইতে পারে না।

নক্ষত্র। দাদার বিরুদ্ধে আমি কোনো চক্রান্ত করিতে পারিব না।

রঘুপতি জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "দাদা তোমার কী মহৎ উপকারটা করিয়াছেন শুনি।"

নক্ষত্র মুখ ফিরাইয়া জানালার উপর আঁচড় কাটিয়া বলিলেন, "আমি জানি, তিনি আমাকে ভালোবাসেন।"

রঘুপতি তীব্র শুষ্ক হাস্যের সহিত কহিলেন, "হরি হরি, কী প্রেম! তাই বুঝি নির্বিঘ্নে ধ্রুবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য মিছা ছুতা করিয়া দাদা তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়াইলেন— পাছে রাজ্যের গুরুভারে ননির পুতলি স্নেহের ভাই কখনো ব্যথিত হইয়া পড়ে। সে রাজ্যে আর কি কখনো সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে নির্বোধ ?"

নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি কি এই সামান্য কথাটা আর বুঝি না! আমি সমস্তই বুঝি— কিন্তু আমি কী করিব বলো ঠাকুর, উপায় কী ?"

রঘুপতি। সেই উপায়ের কথাই তো হইতেছে। সেইজন্যই তো আসিয়াছি। ইচ্ছা হয় তো আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, নয় তো এই বাঁশবনের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী দাদার ধ্যান করো। আমি চলিলাম।"

বলিয়া রঘুপতি প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিলেন। নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কহিলেন, "আমিও যাইব ঠাকুর, কিন্তু দেওয়ানজি যদি যাইতে চান তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে কি আপত্তি আছে ?"

রঘুপতি কহিলেন, "আমি ছাড়া আর কেহ সঙ্গে যাইবে না।"

বাড়ি ছাড়িয়া নক্ষত্ররায়ের পা সরিতে চায় না। এই-সমস্ত সুখের খেলা ছাড়িয়া, দেওয়ানজিকে ছাড়িয়া, রঘুপতির সঙ্গে একলা কোথায় যাইতে হইবে। কিন্তু রঘুপতি যেন তাঁহার কেশ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাহা ছাড়া নক্ষত্ররায়ের মনে এক-প্রকার ভয়মিশ্রিত কৌতূহলও জন্মিতে লাগিল। তাহারও একটা ভীষণ আকর্ষণ আছে।

নৌকা প্রস্তুত আছে। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নক্ষত্ররায় দেখিলেন, কাঁধে গামছা ফেলিয়া পীতাম্বর স্নান করিতে আসিয়াছেন। নক্ষত্রকে দেখিয়াই পীতাম্বর হাস্যবিকশিত মুখে কহিলেন, "জয়োস্তু মহারাজ! শুনিলাম নাকি কাল কোথা হইতে এক অলক্ষণমস্ত বিটল ব্রাহ্মণ আসিয়া শুভবিবাহের ব্যাঘাত করিয়াছে।"

নক্ষত্ররায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। রঘুপতি গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আমিই সেই বিটল ব্রাহ্মণ।"

পীতাম্বর হাসিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "তবে তো আপনার সাক্ষাতে আপনার বর্ণনা করাটা ভালো হয় নাই। জানিলে কোন্ পিতার পুত্র এমন কাজ করিত ? কিছু মনে করিবেন না ঠাকুর, অসাক্ষাতে লোকে কী না বলে। আমাকে যাহারা সম্মুখে বলে রাজা, তাহারা আড়ালে বলে পিতু। মুখের সামনে কিছু না বলিলেই হইল, আমি তো এই বুঝি। আসল কথা কী জানেন, আপনার মুখটা কেমন ভারী অপ্রসন্ন দেখাইতেছে, কাহারও এমন মুখের ভাব দেখিলে লোকে তাহার নামে নিন্দা রটায়। মহারাজ এত প্রাতে যে নদীতীরে ?"

নক্ষত্ররায় কিছু করুণ স্বরে কহিলেন, "আমি যে চলিলাম দেওয়ানজি।"

পীতাম্বর। চলিলেন ? কোথায় ? ন-পাড়ায়, মণ্ডলদের বাড়ি ?

নক্ষত্র। না দেওয়ানজি, মণ্ডলদের বাড়ি নয়। অনেক দূর।

পীতাম্বর। অনেক দূর ? তবে কি পাইকঘাটায় শিকারে যাইতেছেন ?

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া কেবল বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "বেলা বহিয়া যায়, নৌকায় উঠা হউক।"

পীতাম্বর অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও ক্রুদ্ধ ভাবে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন ; কহিলেন, "তুমি কে হে ঠাকুর ? আমাদের মহারাজকে হুকুম করিতে আসিয়াছ !"

নক্ষত্র ব্যস্ত হইয়া পীতাম্বরকে এক পাশে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "উনি আমাদের গুরুঠাকুর।"

পীতাম্বর বলিয়া উঠিলেন, "হোক-না গুরুঠাকুর। উনি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে থাকুন, চাল-কলা বরাদ্দ করিয়া দিব, সমাদরে থাকিবেন— মহারাজকে উঁহার কিসের আবশ্যক ?"

রঘুপতি। বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে— আমি তবে চলিলাম।

পীতাম্বর। যে আজ্ঞে, বিলম্বে ফল কী, মশায় চট্‌পট্ সরিয়া পড়ুন। মহারাজকে লইয়া আমি প্রাসাদে যাইতেছি।

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া একবার পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "না দেওয়ানজি, আমি যাই।"

পীতাম্বর। তবে আমিও যাই, লোকজন সঙ্গে লউন। রাজার মতো চলুন। রাজা যাইবেন, সঙ্গে দেওয়ানজি যাইবে না ?

নক্ষত্ররায় কেবল রঘুপতির মুখের দিকে চাহিলেন। রঘুপতি কহিলেন, "কেহ সঙ্গে যাইবে না।"

পীতাম্বর উগ্র হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "দেখো ঠাকুর, তুমি—"

নক্ষত্ররায় তাঁহাকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "দেওয়ানজি, আমি যাই, দেরি হইতেছে।"

পীতাম্বর ম্লান হইয়া নক্ষত্রের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দেখো বাবা, আমি তোমাকে রাজা বলি, কিন্তু আমি তোমাকে সন্তানের মতো ভালোবাসি— আমার সন্তান কেহ নাই। তোমার উপর আমার জোর খাটে না। তুমি চলিয়া যাইতেছ, আমি জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ এই আছে, যেখানেই যাও আমি মরিবার আগে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি স্বহস্তে আমার রাজত্ব সমস্ত তোমার হাতে দিয়া যাইব। আমার এই একটি সাধ আছে।"

নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দক্ষিণমুখে চলিয়া গেল। পীতাম্বর স্নান ভুলিয়া গামছা-কাঁধে অন্যমনস্কে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। গুজুরপাড়া যেন শূন্য হইয়া গেল— তাহার আমোদ-উৎসব সমস্ত অবসান। কেবল প্রতিদিন প্রকৃতির নিত্য উৎসব, প্রাতে পাখির গান, পল্লবের মর্মরধ্বনি ও নদীতরঙ্গের করতালির বিরাম নাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ পথ। কোথাও বা নদী, কোথাও বা ঘন অরণ্য, কোথাও বা ছায়াহীন প্রান্তর — কখনো বা নৌকায়, কখনো বা পদব্রজে, কখনো বা টাট্টু ঘোড়ায়— কখনো রৌদ্র, কখনো বৃষ্টি, কখনো কোলাহলময় দিন, কখনো নিশীথিনীর নিস্তব্ধ অন্ধকার— নক্ষত্র-রায় অবিশ্রাম চলিয়াছেন। কত দেশ, কত বিচিত্র দৃশ্য, কত বিচিত্র লোক— কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে ছায়ার ন্যায় ক্ষীণ, রৌদ্রের ন্যায় দীপ্ত সেই একমাত্র রঘুপতি অবিশ্রাম লাগিয়া আছেন। দিনে রঘুপতি, রাত্রে রঘুপতি, স্বপ্নেও রঘুপতি বিরাজ করেন। পথে পথিকেরা যাতায়াত করিতেছে, পথপার্শ্বে ধুলায় ছেলেরা খেলা করিতেছে, হাটে শত শত লোক কেনাবেচা করিতেছে, গ্রামে বৃদ্ধেরা পাশা খেলিতেছে, ঘাটে মেয়েরা জল তুলিতেছে, নৌকায় মাঝিরা গান গাহিয়া চলিয়াছে— কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে এক শীর্ণ রঘুপতি সর্বদা জাগিয়া আছে। জগতে চারি দিকে বিচিত্র খেলা হইতেছে, বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে— কিন্তু এই রঙ্গভূমির বিচিত্র লীলার

মাঝখান দিয়া নক্ষত্ররায়ের দুরদৃষ্ট তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে— সজন তাঁহার পক্ষে বিজন, লোকালয় কেবল শূন্য মরুভূমি।

নক্ষত্ররায় শ্রান্ত হইয়া তাঁহার পার্শ্ববর্তী ছায়াকে জিজ্ঞাসা করেন, "আর কত দূর যাইতে হইবে?"

ছায়া উত্তর করে, "অনেক দূর।"

"কোথায় যাইতে হইবে?"

তাহার উত্তর নাই। নক্ষত্ররায় নিশ্বাস ফেলিয়া চলিতে থাকেন। তরুশ্রেণীর মধ্যে পাতা-দিয়া-ছাওয়া নিভৃত পরিচ্ছন্ন কুটির দেখিলে তাঁহার মনে হয়, "আমি যদি এই কুটিরের অধিবাসী হইতাম।" গোধূলির সময় যখন রাখাল লাঠি কাঁধে করিয়া মাঠ দিয়া গ্রামপথ দিয়া ধুলা উড়াইয়া গোরু-বাছুর লইয়া চলে, নক্ষত্ররায়ের মনে হয়, "আমি যদি ইহার সঙ্গে যাইতে পাইতাম, সন্ধ্যাবেলায় গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিতে পাইতাম।" মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রে চাষা চাষ করিতেছে, তাহাকে দেখিয়া নক্ষত্ররায় মনে করেন, "আহা, এ কী সুখী!"

পথকষ্টে নক্ষত্ররায় বিবর্ণ শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছেন; রঘুপতিকে বলেন, "ঠাকুর, আমি আর বাঁচিব না।"

রঘুপতি বলেন, "এখন তোমাকে মরিতে দিবে কে?"

নক্ষত্ররায়ের মনে হইল, রঘুপতি অবকাশ না দিলে তাঁহার মরিবারও সুযোগ নাই। একজন স্ত্রীলোক নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া বলিয়াছিল, "আহা, কাদের ছেলে গো! একে পথে কে বাহির করিয়াছে!" শুনিয়া নক্ষত্ররায়ের প্রাণ গলিয়া গেল, তাঁহার চোখে জল আসিল, তাঁহার ইচ্ছা করিল সেই স্ত্রীলোকটিকে মা বলিয়া তাহার সঙ্গে তাহার ঘরে চলিয়া যান।

কিন্তু নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাতে যতই কষ্ট পাইতে লাগিলেন রঘুপতির ততই বশ হইতে লাগিলেন, রঘুপতির অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব পরিচালিত হইতে লাগিল।

চলিতে চলিতে ক্রমে নদীর বাহুল্য কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে ভূমি দৃঢ় লই, হইয়া আসিল; মৃত্তিকা লোহিত বর্ণ, কঙ্করময়, লোকালয় দূরে দূরে স্থাপিত, গাছপালা নক্ষত্রং, নারিকেল-বনের দেশ ছাড়িয়া দুই পথিক তাল-বনের দেশে আসিয়া চাহিয়া মৃদুস্বরে কা(ঝে মাঝে বড়ো বড়ো বাঁধ, শুষ্ক নদীর পথ, দূরে মেঘের মতো পাহাড় পীতাম্বর। তবে ক্রমে শাসুজার রাজধানী রাজমহল নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

রাজা যাইবেন, সঙ্গে দেওয়া,

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অবশেষে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরাজয় ও পলায়নের পরে সুজা নূতন সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু রাজকোষে অধিক অর্থ নাই। প্রজাগণ করভারে পীড়িত। ইতিমধ্যে দারাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ঔরংজেব দিল্লির সিংহাসনে বসিয়াছেন। সুজা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। কিন্তু সৈন্যসামন্ত কিছুই প্রস্তুত ছিল না, এই জন্য কিছু সময় হাতে পাইবার আশায় তিনি ছল করিয়া ঔরংজেবের নিকট এক দূত পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন যে, নয়নের জ্যোতি হৃদয়ের আনন্দ পরমস্নেহাস্পদ প্রিয়তম ভ্রাতা ঔরংজেব সিংহাসন-লাভে কৃতকার্য হইয়াছেন ইহাতে সুজা মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন— এক্ষণে সুজার বাংলা-শাসন-ভার নূতন সম্রাট মঞ্জুর করিলেই আনন্দের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ঔরংজেব অত্যন্ত সমাদরের সহিত দূতকে আহ্বান করিলেন। সুজার শরীর-মনের স্বাস্থ্য এবং সুজার পরিবারের মঙ্গল-সংবাদ জানিবার জন্য সবিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, "যখন স্বয়ং সম্রাট শাজাহান সুজাকে বাংলার শাসনকার্যে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন আর দ্বিতীয় মঞ্জুরি-পত্রের কোনো আবশ্যক নাই।" এই সময় রঘুপতি সুজার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুজা কৃতজ্ঞতা ও সমাদরের সহিত তাঁহার উদ্ধারকর্তাকে আহ্বান করিলেন। বলিলেন, "খবর কী?"

রঘুপতি বলিলেন, "বাদশাহের কাছে কিছু নিবেদন আছে।"

সুজা মনে মনে ভাবিলেন, নিবেদন আবার কিসের? কিছু অর্থ চাহিয়া না বসিলে বাঁচি।

রঘুপতি কহিলেন, "আমার প্রার্থনা এই যে—"

সুজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার প্রার্থনা আমি নিশ্চয় পূরণ করিব। কিন্তু কিছু দিন সবুর করো। এখন রাজকোষে অধিক অর্থ নাই।"

রঘুপতি কহিলেন, "শাহেন শা, রুপা সোনা বা আর কোনো ধাতু চাহি না, আমি এখন শাণিত ইস্পাত চাই। আমার নালিশ শুনুন, আমি বিচার প্রার্থনা করি।"

সুজা কহিলেন, "ভারী মুশকিল! এখন আমার বিচার করিবার সময় নহে। ব্রাহ্মণ, তুমি বড়ো অসময়ে আসিয়াছ।"

রঘুপতি কহিলেন, "শাহ্‌জাদা, সময় অসময় সকলেরই আছে। আপনি বাদশাহ, আপনারও আছে; এবং আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমারও আছে। আপনার সময়মত

আপনি বিচার করিতে বসিলে আমার সময় থাকে কোথা ?"

সুজা হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ভারী হাঙ্গাম। এত কথা শোনার চেয়ে তোমার নালিশ শোনা ভালো। বলিয়া যাও।"

রঘুপতি কহিলেন, "ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে বিনা অপরাধে নির্বাসিত করিয়াছেন—"

সুজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি পরের নালিশ লইয়া কেন আমার সময় নষ্ট করিতেছ। এখন এ সমস্ত বিচার করিবার সময় নয়।"

রঘুপতি কহিলেন, "ফরিয়াদী রাজধানীতে হাজির আছেন।"

সুজা কহিলেন, "তিনি আপনি উপস্থিত থাকিয়া আপনার মুখে যখন নালিশ উত্থাপন করিবেন তখন বিবেচনা করা যাইবে।"

রঘুপতি কহিলেন, "তাঁহাকে কবে এখানে হাজির করিব ?"

সুজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ কিছুতেই ছাড়ে না। আচ্ছা এক সপ্তাহ পরে আনিয়ো।"

রঘুপতি কহিলেন, "বাদশাহ যদি হুকুম করেন তো আমি তাহাকে কাল আনিব।"

সুজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, কালই আনিয়ো।"

আজিকার মতো নিষ্কৃতি পাইলেন। রঘুপতি বিদায় হইলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "নবাবের কাছে যাইব, কিন্তু নজরের জন্য কী লইব।"

রঘুপতি কহিলেন, "সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

নজরের জন্য তিনি দেড় লক্ষ মুদ্রা উপস্থিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে রঘুপতি কম্পিতহৃদয় নক্ষত্ররায়কে লইয়া সুজার সভায় উপস্থিত হইলেন। যখন দেড় লক্ষ টাকা নবাবের পদতলে স্থাপিত হইল তখন তাঁহার মুখশ্রী তেমন অপ্রসন্ন বোধ হইল না। নক্ষত্ররায়ের নালিশ অতি সহজেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি কহিলেন, "এক্ষণে তোমাদের কী অভিপ্রায় আমাকে বলো।"

রঘুপতি কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্যকে নির্বাসিত করিয়া তাঁহার স্থলে নক্ষত্ররায়কে রাজা করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।"

যদিও সুজা নিজে ভ্রাতার সিংহাসনে হস্তক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র সংকুচিত হন না, তথাপি এ স্থলে তাঁহার মনে কেমন আপত্তি উপস্থিত হইল। কিন্তু রঘুপতির প্রার্থনা পূরণ করাই তাঁহার আপাতত সকলের চেয়ে সহজ বোধ হইল— নহিলে রঘুপতি বিস্তর বকাবকি করিবে এই তাঁহার ভয়। বিশেষত দেড় লক্ষ টাকা নজরের উপরেও অধিক আপত্তি করা ভালো দেখায় না এইরূপ তাঁহার মনে হইল। তিনি বলিলেন,

"আচ্ছা, গোবিন্দমাণিক্যের নির্বাসন এবং নক্ষত্ররায়ের রাজ্যপ্রাপ্তির পরোয়ানা-পত্র তোমাদের সঙ্গে দিব, তোমরা লইয়া যাও।"

রঘুপতি কহিলেন, "বাদশাহের কতিপয় সৈন্যও সঙ্গে দিতে হইবে।"

সুজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না, না, না— তাহা হইবে না, যুদ্ধবিগ্রহ করিতে পারিব না।"

রঘুপতি কহিলেন, "যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ আরও ছত্রিশ হাজার টাকা আমি রাখিয়া যাইতেছি। এবং ত্রিপুরায় নক্ষত্ররায় রাজা হইবামাত্র এক বৎসরের খাজনা সেনাপতির হাত দিয়া পাঠাইয়া দিব।"

এ প্রস্তাব সুজার অতিশয় যুক্তিসংগত বোধ হইল, এবং অমাত্যেরাও তাঁহার সহিত একমত হইল। একদল মোগল-সৈন্য সঙ্গে লইয়া রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই উপন্যাসের আরম্ভকাল হইতে এখন দুই বৎসর হইয়া গিয়াছে। ধ্রুব তখন দুই বৎসরের বালক ছিল। এখন তাহার বয়স চার বৎসর। এখন সে বিস্তর কথা শিখিয়াছে। এখন তিনি আপনাকে ভারী মস্ত লোক জ্ঞান করেন ; সকল কথা যদিও স্পষ্ট বলিতে পারেন না, কিন্তু অত্যন্ত জোরের সহিত বলিয়া থাকেন। রাজাকে প্রায় তিনি 'পুতুল দেব' বলিয়া পরম প্রলোভন ও সান্ত্বনা দিয়া থাকেন, এবং রাজা যদি কোনোপ্রকার দুষ্টুমির লক্ষণ প্রকাশ করেন তবে ধ্রুব তাঁকে "ঘরে বন্দ ক'রে রাখব" বলিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত করিয়া তুলেন। এইরূপে রাজা এখন বিশেষ শাসনে আছেন— ধ্রুবের অনভিমত কোনো কাজ করিতে তিনি বড়ো একটা ভরসা করেন না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ধ্রুবের একটি সঙ্গী জুটিয়া গেল। একটি প্রতিবেশীর মেয়ে, ধ্রুব অপেক্ষা ছয় মাসের ছোটো। মিনিট দশেকের ভিতরে উভয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী ভাব হইয়া গেল। মাঝে একটুখানি মনান্তর হইবারও সম্ভাবনা হইয়াছিল। ধ্রুবের হাতে একটা বড়ো বাতাসা ছিল। প্রথম-প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে ধ্রুব তাহার ছোটো দুইটি আঙুল দিয়া অতি সাবধানে ক্ষুদ্র একটু কণা ভাঙিয়া একেবারে তাহার সঙ্গিনীর মুখে পুরিয়া দিল ও পরম অনুগ্রহের সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "তুমি কাও।" সঙ্গিনী মিষ্ট পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া কহিল, "আরও কাব।"

তখন ধ্রুব কিছু কাতর হইয়া পড়িল। বন্ধুত্বের উপরে এত অধিক দাবি ন্যায়সংগত

বোধ হইল না ; ধ্রুব তাহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ও গৌরবের সহিত ঘাড় নাড়িয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "ছি— আর কেতে নেই, অছুখ কোবে, বাবা মা'বে।" বলিয়াই অধিক বিলম্ব না করিয়া সমস্ত বাতাসাটা নিজের মুখের মধ্যে একেবারে পুরিয়া দিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। সহসা বালিকার মুখের মাংসপেশীর মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল · ওষ্ঠাধর ফুলিতে লাগিল, ভ্রূযুগ উপরে উঠিতে লাগিল— আসন্ন ক্রন্দনের সমস্ত লক্ষণ ব্যক্ত হইল।

ধ্রুব কাহারও ক্রন্দন সহিতে পারিত না ; তাড়াতাড়ি সুগভীর সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "কাল দেব।"

রাজা আসিবামাত্র ধ্রুব অত্যন্ত বিজ্ঞ হইয়া নূতন সঙ্গিনীর প্রাত নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "একে কিছু বোলো না, এ কাঁদবে। ছি, মারতে নেই, ছি!"

রাজার কোনোপ্রকার দুরভিসন্ধি ছিল না সত্য, তথাপি গায়ে পড়িয়া রাজাকে সাবধান করিয়া দেওয়া ধ্রুব অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিল। রাজা মেয়েটিকে মারিলেন না, ধ্রুব স্পষ্টই দেখিল তাহার উপদেশ নিষ্ফল নহে।

তার পরে ধ্রুব মুরুব্বির ভাব ধারণ করিয়া কোনোপ্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই জানাইয়া মেয়েটিকে পরম গাম্ভীর্যের সহিত আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহারও কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। কারণ, মেয়েটি আপনা হইতে নির্ভীক ভাবে রাজার কাছে গিয়া অত্যন্ত কৌতূহল ও লোভের সহিত তাঁহার হাতের কঙ্কণ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপে ধ্রুব কেবলমাত্র নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেম স্থাপন করিয়া প্রসন্নচিত্তে রাজার মুখের কাছে আপনার বেলফুলের মতো মোটা গোল কোমল পবিত্র মুখখানি বাড়াইয়া দিল— রাজার সদ্ব্যবহারের পুরস্কার— রাজা চুম্বন করিলেন।

তখন ধ্রুব তাহার সঙ্গিনীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া রাজাকে অনুমতি ও অনুরোধের মাঝামাঝি স্বরে কহিল, "একে চুমো কাও।"

রাজা ধ্রুবের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন না। মেয়েটি তখন নিমন্ত্রণের কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া নিতান্ত অভ্যস্ত ভাবে অম্লানবদনে রাজার কোলের উপরে চড়িয়া বসিল।

এতক্ষণ জগতে কোনোপ্রকার অশান্তি বা উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ ছিল না, কিন্তু এইবার ধ্রুবের সিংহাসনে টান পড়িতেই তাহার সার্বভৌমিক প্রেম টলমল করিয়া উঠিল। রাজার কোলের 'পরে তাহার নিজের একমাত্র স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা

বলবতী হইয়া উঠিল। মুখ অত্যন্ত ভার হইল, মেয়েটিকে দুই-একবার টানিল, এমন কি নিজের পক্ষে অবস্থাবিশেষে ছোটো মেয়েকে মারাও ততটা অন্যায় বোধ হইল না।

রাজা তখন মিট্‌মাট করিবার উদ্দেশে ধ্রুবকেও তাঁহার আধখানা কোলে টানিয়া লইলেন। কিন্তু তাহাতেও ধ্রুবের আপত্তি দূর হইল না। অপরার্ধ অধিকার করিবার জন্য নূতন আক্রমণের উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নূতন রাজ-পুরোহিত বিল্বন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন।

রাজা উভয়কেই কোল হইতে নামাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধ্রুবকে বলিলেন, "ঠাকুরকে প্রণাম করো।" ধ্রুব তাহা আবশ্যক বোধ করিল না; মুখে আঙ্‌ল পুরিয়া বিদ্রোহীভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটি আপনা হইতেই রাজার দেখাদেখি পুরোহিতকে প্রণাম করিল।

বিল্বন ঠাকুর ধ্রুবকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ সঙ্গী জুটিল কোথা হইতে?"

ধ্রুব খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল, "আমি টক্‌টক্ চ'ব।" টক্‌টক্ অর্থে ঘোড়া।

পুরোহিত কহিলেন, "বাহবা, প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে কী সামঞ্জস্য!"

সহসা মেয়েটির দিকে ধ্রুবের চক্ষু পড়িল, তাহার সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আপনার মত ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল, "ও দুষ্টু, ওকে মা'ব।"

বলিয়া আকাশে আপনার ক্ষুদ্র মুষ্টি নিক্ষেপ করিল!

রাজা গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ছি ধ্রুব!"

একটি ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায় তেমনি তৎক্ষণাৎ ধ্রুবের মুখ ম্লান হইয়া গেল। প্রথমে সে অশ্রুনিবারণের জন্য দুই মুষ্টি দিয়া দুই চক্ষু রগড়াইতে লাগিল; অবশেষে দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র স্ফীত হৃদয় আর ধারণ করিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল।

বিল্বন ঠাকুর তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া, কোলে লইয়া, আকাশে তুলিয়া, ভূমিতে নামাইয়া, অস্থির করিয়া তুলিলেন; উচ্চৈঃস্বরে ও দ্রুত উচ্চারণে বলিলেন, "শোনো শোনো ধ্রুব, শোনো, তোমাকে শ্লোক বলি শোনো—

কলহ কটকটাং কাঠ কাঠিন্য কাঠ্যাং
কটন কিটন কীটং কুট্‌মলং খট্টমট্টং।

অর্থাৎ কি না, যে ছেলে কাঁদে তাকে কলহ কট্‌কটাঙের মধ্যে পুরে খুব করে কাঠ কাঠিন্য কাঠ্যাং দিতে হয়, তার পরে এতগুলো কটন কিটন কীটং নিয়ে একেবারে তিন দিন ধরে কুট্‌মলং খট্টমট্টং।"

পুরোহিত ঠাকুর এইরূপ অনর্গল বকিয়া গেলেন। ধ্রুবের ক্রন্দন অসম্পূর্ণ

অবস্থাতেই একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। সে প্রথমে গোলমালে বিব্রত ও অবাক হইয়া বিল্বন ঠাকুরের মুখের দিকে সজল চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া রহিল। তার পরে তাঁর হাতমুখ-নাড়া দেখিয়া তাহার অত্যন্ত কৌতুক বোধ হইল।

সে ভারী খুশি হইয়া বলিল, "আবার বলো।"

পুরোহিত আবার বকিয়া গেলেন। ধ্রুব অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে বলিল, "আবার বলো।"

রাজা ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত কপোলে এবং হাসিভরা অধরে বার বার চুম্বন করিলেন। তখন রাজা রাজপুরোহিত ও দুটি ছেলেমেয়ে মিলিয়া খেলা পড়িয়া গেল।

বিল্বন ঠাকুর রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ ইহাদের লইয়া বেশ আছেন। দিনরাত প্রখর বুদ্ধিমানদের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিতে অবিশ্রাম শান পড়িলে ছুরি ক্রমেই সূক্ষ্ম হইয়া অন্তর্ধান করে। একটা মোটা বাঁট কেবল অবশিষ্ট থাকে।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "এখনো তবে বোধ করি আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।"

বিল্বন। না। সূক্ষ্ম বুদ্ধির একটা লক্ষণ এই যে, তাহা সহজ জিনিসকে শক্ত করিয়া তুলে। পৃথিবীতে বিস্তর বুদ্ধিমান না থাকিলে পৃথিবীর কাজ অনেকটা সোজা হইত। নানারূপ সুবিধা করিতে গিয়াই নানারূপ অসুবিধা ঘটে। অধিক বুদ্ধি লইয়া মানুষ কী করিবে ভাবিয়া পায় না।

রাজা কহিলেন, "পাঁচটা আঙুলেই বেশ কাজ চলিয়া যায় দুর্ভাগ্যক্রমে সাতটা আঙুল পাইলে ইচ্ছা করিয়া কাজ বাড়াইতে হয়।"

রাজা ধ্রুবকে ডাকিলেন। ধ্রুব তাহার সঙ্গিনীর সহিত পুনরায় শান্তি স্থাপন করিয়া খেলা করিতেছিল। রাজার ডাক শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খেলা ছাড়িয়া রাজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া কহিলেন, "ধ্রুব, সেই নূতন গানটি ঠাকুরকে শোনাও।" কিন্তু ধ্রুব নিতান্ত আপত্তির ভাবে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল।

রাজা লোভ দেখাইয়া বলিলেন, "তোমাকে টক্‌টক্‌ চড়তে দেব।"

ধ্রুব তাহার আধো-আধো উচ্চারণে বলিতে লাগিল,—

আমায় ছ-জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান মুনি বলে,
সংশয়ে তাই দুলি হে।

তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত বুলি হে।
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি—
পাই নে চরণধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা-আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব এ কী হল দায়
একা যে অনেকগুলি হে।
আমায় এক করো তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে—
চরণেতে লহ তুলি হে।

ধ্রুবের মুখে আধো-আধো স্বরে এ কবিতা শুনিয়া বিল্বন ঠাকুর নিতান্ত বিগলিত হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "আশীর্বাদ করি তুমি চিরজীবী হইয়া থাকো।"

ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঠাকুর অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন, "আর একবার শুনাও।"

ধ্রুব সুদৃঢ় মৌন আপত্তি প্রকাশ করিল। পুরোহিত চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন, "তবে আমি কাঁদি।"

ধ্রুব ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিল, "কাল শোনাব। ছি কাঁদতে নেই। তুমি একন বায়ি (বাড়ি) যাও। বাবা মা'বে।"

বিল্বন হাসিয়া কহিলেন, "মধুর গলাধাক্কা।"

রাজার নিকটে বিদায় লইয়া পুরোহিত ঠাকুর পথে বাহির হইলেন।

পথে দুইজন পথিক যাইতেছিল। একজন আর-একজনকে কহিতেছিল, "তিন দিন তার দরজায় মাথা ভেঙে মলুম, এক পয়সা বের করতে পারলুম না— এইবার সে পথে বেরোলে তার মাথা ভাঙব, দেখি তাতে কী হয়।"

পিছন হইতে বিল্বন কহিলেন, "তাতেও কোনো ফল হবে না। দেখতেই তো

পাচ্ছ বাপু মাথার মধ্যে কিছুই থাকে না, কেবল দুর্বুদ্ধি আছে। বরঞ্চ নিজের মাথা ভাঙা ভালো, কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।"

পথিকদ্বয় শশব্যস্ত ও অপ্রতিভ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। বিল্বন কহিলেন, "বাপু, তোমরা যে কথা বলছিলে সে কথাগুলো ভালো নয়।"

পথিকদ্বয় কহিল, "যে আজ্ঞে ঠাকুর, আর অমন কথা বলব না।"

পুরোহিত ঠাকুরকে পথে ছেলেরা ঘিরিল। তিনি কহিলেন, "আজ বিকালে আমার ওখানে যাস, আমি আজ গল্প শোনাব।" আনন্দে ছেলেরা লাফালাফি চেঁচামেচি বাধাইয়া দিল। বিল্বন ঠাকুর এক-একদিন অপরাহ্ণে রাজ্যের ছেলে জড়ো করিয়া তাহাদিগকে সহজ ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক গল্প শুনাইতেন। মাঝে মাঝে দুই-একটি নীরস কথাও যথাসাধ্য রসসিক্ত করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যখন দেখিতেন ছেলেদের মধ্যে হাই তোলা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে তখন তাহাদের মন্দিরের বাগানের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেন। সেখানে ফলের গাছ অসংখ্য আছে। ছেলেগুলো আকাশভেদী চীৎকার-শব্দে বানরের মতো ডালে ডালে লুটপাট বাধাইয়া দিত— বিল্বন আমোদ দেখিতেন।

বিল্বন কোন্ দেশী লোক কেহ জানে না। ব্রাহ্মণ, কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। বলিদান প্রভৃতি বন্ধ করিয়া একপ্রকার নূতন অনুষ্ঠানে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন— প্রথম প্রথম তাহাতে লোকেরা সন্দেহ ও আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সমস্ত সহিয়া গিয়াছে। বিশেষত বিল্বনের কথায় সকলে বশ। বিল্বন সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করেন, সকলের সংবাদ লন, এবং রোগীকে যাহা ঔষধ দেন তাহা আশ্চর্য খাটিয়া যায়। বিপদে আপদে সকলেই তাঁহার পরামর্শমতে কাজ করে—তিনি মধ্যবর্তী হইয়া কাহারও বিবাদ মিটাইয়া দিলে বা কিছুর মীমাংসা করিয়া দিলে তাহার উপরে আর কেহ কথা কহে না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই বৎসরে ত্রিপুরায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। উত্তর হইতে সহসা পালে পালে ইঁদুর ত্রিপুরার শস্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। শস্য সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিল, এমন কি, কৃষকের ঘরে শস্য যত কিছু সঞ্চিত ছিল তাহাও অধিকাংশ খাইয়া ফেলিল— রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বন হইতে ফল-

মূল আহরণ করিয়া লোকে প্রাণধারণ করিতে লাগিল। বনের অভাব নাই, এবং বনে নানাপ্রকার আহার্য উদ্ভিজ্জও আছে। মৃগয়ালব্ধ মাংস বাজারে মহার্ঘ মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। লোকে বুনো মহিষ, হরিণ, খরগোশ, সজারু, কাঠবিড়ালি, বরা, বড়ো বড়ো স্থলকচ্ছপ শিকার করিয়া খাইতে লাগিল— হাতি পাইলে হাতিও খায়— অজগর সাপ খাইতে লাগিল— বনে আহার্য পাখির অভাব নাই— গাছের কোটরের মধ্যে মৌচাক ও মধু পাওয়া যায়— স্থানে স্থানে নদীর জল বাঁধিয়া তাহাতে মাদক লতা ফেলিয়া দিলে মাছেরা অবশ হইয়া ভাসিয়া উঠে, সেই-সকল মাছ ধরিয়া লোকেরা খাইতে লাগিল এবং শুকাইয়া সঞ্চয় করিল। আহার এখনো কোনোক্রমে চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। স্থানে স্থানে চুরি-ডাকাতি আরম্ভ হইল; প্রজারা বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিল।

তাহারা বলিতে লাগিল, "মায়ের বলি বন্ধ করাতে মায়ের অভিশাপে এই-সকল দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে।" বিল্বন ঠাকুর সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি উপহাসচ্ছলে কহিলেন, "কৈলাসে কার্তিক-গণেশের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কার্তিকের ময়ূরের নামে গণেশের ইঁদুরগুলো ত্রিপুরার ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে নালিশ করিতে আসিয়াছে।" প্রজারা এ কথা নিতান্ত উপহাস ভাবে গ্রহণ করিল না। তাহারা দেখিল, বিল্বন ঠাকুরের কথামত ইঁদুরের স্রোত যেমন দ্রুতবেগে আসিল তেমনি দ্রুত-বেগে সমস্ত শস্য নষ্ট করিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিল— তিন দিনের মধ্যে তাহাদের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। বিল্বন ঠাকুরের অগাধ জ্ঞানের সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কৈলাসে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সম্বন্ধে গান রচিত হইতে লাগিল, মেয়েরা ছেলেরা ভিক্ষুকেরা সেই গান গাহিতে লাগিল, পথে ঘাটে সেই গান প্রচলিত হইল।

কিন্তু রাজার প্রতি বিদ্বেষভাব ভালো করিয়া ঘুচিল না। বিল্বন ঠাকুরের পরামর্শমতে গোবিন্দমাণিক্য দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদের এক বৎসরের খাজনা মাপ করিলেন। তাহার কতকটা ফল হইল। কিন্তু তবুও অনেকে মায়ের অভিশাপ এড়াইবার জন্য চট্টগ্রামে পার্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিল। এমন-কি রাজার মনে সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল।

তিনি বিল্বনকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, রাজার পাপেই প্রজা কষ্ট পায়। আমি কি মায়ের বলি বন্ধ করিয়া পাপ করিয়াছি? তাহারই কি এই শাস্তি?"

বিল্বন সমস্ত কথা একেবারে উড়াইয়া দিলেন। তিনি কহিলেন, "মায়ের কাছে যখন হাজার নরবলি হইত, তখন আপনার অধিক প্রজাহানি হইয়াছে, না এই দুর্ভিক্ষে হইয়াছে?"

রাজা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহার মনের মধ্য হইতে সংশয় সম্পূর্ণ দূর হইল না। প্রজারা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাঁহার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহার নিজের প্রতিও নিজের সন্দেহ জন্মিয়াছে। তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "কিছুই বুঝিতে পারি না।"

বিল্বন কহিলেন, "অধিক বুঝিবার আবশ্যক কী। কেন কতকগুলো ইঁদুর আসিয়া শস্য খাইয়া গেল তাহা না'ই বুঝিলাম। আমি অন্যায় করিব না, আমি সকলের হিত করিব, এইটুকু স্পষ্ট বুঝিলেই হইল। তার পরে বিধাতার কাজ বিধাতা করিবেন, তিনি আমাদের হিসাব দিতে আসিবেন না।"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি গৃহে গৃহে ফিরিয়া অবিশ্রাম কাজ করিতেছ, পৃথিবীর যতটুকু হিত করিতেছ ততটুকুই তোমার পুরস্কার হইতেছে, এই আনন্দে তোমার সমস্ত সংশয় চলিয়া যায়। আমি কেবল দিনরাত্রি একটা মুকুট মাথায় করিয়া সিংহাসনের উপরে চড়িয়া বসিয়া আছি, কেবল কতকগুলো চিন্তা ঘাড়ে করিয়া আছি— তোমার কাজ দেখিলে আমার লোভ হয়।"

বিল্বন কহিলেন, "মহারাজ, আমি তোমারই তো এক অংশ। তুমি ওই সিংহাসনে বসিয়া না থাকিলে আমি কি কাজ করিতে পারিতাম? তোমাতে আমাতে মিলিয়া আমরা উভয়ে সম্পূর্ণ হইয়াছি।"

এই বলিয়া বিল্বন বিদায় গ্রহণ করিলেন, রাজা মুকুট মাথায় করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন, "আমার কাজ যথেষ্ট রহিয়াছে, আমি তাহার কিছুই করি না। আমি কেবল আমার চিন্তা লইয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। সেইজন্যই আমি প্রজাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারি না। রাজ্যশাসনের আমি যোগ্য নই।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মোগল-সৈন্যের কর্তা হইয়া নক্ষত্ররায় পথের মধ্যে তেঁতুলে-নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রভাতে রঘুপতি আসিয়া কহিলেন, "যাত্রা করিতে হইবে মহারাজ, প্রস্তুত হোন।"

সহসা রঘুপতির মুখে মহারাজ শব্দ অত্যন্ত মিষ্ট শুনাইল। নক্ষত্ররায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কল্পনায় পৃথিবীশুদ্ধ লোকের মুখ হইতে মহারাজ সম্ভাষণ শুনিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে ত্রিপুরার উচ্চ সিংহাসনে চড়িয়া সভা উজ্জ্বল করিয়া

বসিলেন। মনের আনন্দে বলিলেন, "ঠাকুর, আপনাকে কখনোই ছাড়া হইবে না। আপনাকে সভায় থাকিতে হইবে। আপনি কী চান সেইটে আমাকে বলুন।" নক্ষত্ররায় মনে মনে রঘুপতিকে তৎক্ষণাৎ বৃহৎ একখণ্ড জায়গির অবলীলাক্রমে দান করিয়া ফেলিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "আমি কিছু চাহি না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "সে কী কথা! তা হইবে না ঠাকুর। কিছু লইতেই হইবে। কয়লাসর পরগনা আমি আপনাকে দিলাম— আপনি লেখাপড়া করিয়া লউন।"

রঘুপতি কহিলেন, "সে সকল পরে দেখা যাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "পরে কেন, আমি এখনি দিব। সমস্ত কয়লাসর পরগনা আপনারই হইল; আমি এক পয়সা খাজনা লইব না।" বলিয়া নক্ষত্ররায় মাথা তুলিয়া অত্যন্ত সিধা হইয়া বসিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "মরিবার জন্য তিন হাত জমি মিলিলেই সুখী হইব। আমি আর কিছু চাহি না।" বলিয়া রঘুপতি চলিয়া গেলেন। তাঁহার জয়সিংহকে মনে পড়িয়াছে। জয়সিংহ যদি থাকিত তবে পুরস্কারের স্বরূপ কিছু লইতেন— জয়সিংহ যখন নাই তখন সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য মৃত্তিকার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু মনে হইল না।

রঘুপতি এখন নক্ষত্ররায়কে রাজ্যাভিমানে মত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার মনের মধ্যে ভয় আছে পাছে এত আয়োজন করিয়া সমস্ত ব্যর্থ হয়, পাছে দুর্বলস্বভাব নক্ষত্ররায় ত্রিপুরায় গিয়া বিনাযুদ্ধে রাজার নিকট ধরা দেন। কিন্তু দুর্বল হৃদয়ে একবার রাজ্যমদ জন্মিলে আর ভাবনা নাই। রঘুপতি নক্ষত্ররায়ের প্রতি আর অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, কথায় কথায় তাঁহার সম্মান দেখাইয়া থাকেন। সকল বিষয়ে তাহার মৌখিক আদেশ লইয়া থাকেন। মোগল-সৈন্যেরা তাঁহাকে মহারাজা সাহেব বলে, তাঁহাকে দেখিলে শশব্যস্ত হইয়া উঠে— বায়ু বহিলে যেমন সমস্ত শস্যক্ষেত্র নত হইয়া যায় তেমনি নক্ষত্ররায় আসিয়া দাঁড়াইলে সারি সারি মোগল-সেনা একসঙ্গে মাথা নত করিয়া সেলাম করে। সেনাপতি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করেন। শত শত মুক্ত তরবারির জ্যোতির মধ্যে বৃহৎ হস্তীর পৃষ্ঠে রাজচিহ্ন-অঙ্কিত স্বর্ণমণ্ডিত হাওদায় চড়িয়া তিনি যাত্রা করেন, সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসজনক বাদ্য বাজিতে থাকে— সঙ্গে সঙ্গে নিশানধারী রাজনিশান ধরিয়া চলে। তিনি যেখান দিয়া যান, সেখানকার গ্রামের লোক সৈন্যের ভয়ে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। তাহাদের ত্রাস দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের মনে গর্বের উদয় হয়। তাঁহার মনে হয়, আমি দিগ্বিজয় করিয়া চলিয়াছি। ছোটো ছোটো জমিদারগণ নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া আসিয়া তাঁহাকে সেলাম

করিয়া যায়— তাহাদিগকে পরাজিত নৃপতি বলিয়া বোধ হয়; মহাভারতের দিগ্বিজয়ী পাণ্ডবদের কথা মনে পড়ে।

একদিন সৈন্যেরা আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, "মহারাজ সাহেব!" নক্ষত্ররায় খাড়া হইয়া বসিলেন।

"আমরা মহারাজের জন্য জান দিতে আসিয়াছি— আমরা জানের পরোয়া রাখি না। বরাবর আমাদের দস্তুর আছে, লড়াইয়ে যাইবার পথে আমরা গ্রাম লুঠ করিয়া যাই— কোনো শাস্ত্রে ইহাতে দোষ লিখে না।"

নক্ষত্ররায় মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঠিক কথা, ঠিক কথা।"

সৈন্যেরা কহিল, "ব্রাহ্মণ-ঠাকুর আমাদের লুঠ করিতে বারণ করিয়াছেন। আমরা জান দিতে যাইতেছি, অথচ একটু লুঠ করিতে পারিব না, এ বড়ো অবিচার।"

নক্ষত্ররায় পুনশ্চ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ঠিক কথা, ঠিক কথা।"

"মহারাজার যদি হুকুম মিলে তো আমরা ব্রাহ্মণ-ঠাকুরের কথা না মানিয়া লুঠ করিতে যাই।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত স্পর্ধার সহিত কহিলেন, "ব্রাহ্মণ-ঠাকুর কে! ব্রাহ্মণ-ঠাকুর কী জানে! আমি তোমাদিগকে হুকুম দিতেছি তোমরা লুঠপাট করিতে যাও।"

বলিয়া একবার ইতস্তত চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও রঘুপতিকে না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু রঘুপতিকে এইরূপে অকাতরে লঙ্ঘন করিয়া তিনি মনের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। ক্ষমতামদ মদিরার মতো তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল। পৃথিবীকে নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কাল্পনিক বেলুনের উপরে চড়িয়া পৃথিবীটা যেন অনেক নিম্নে মেঘের মতো মিলাইয়া গেল। এমন কি, মাঝে মাঝে কদাচ কখনো রঘুপতিকেও নগণ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সহসা বলপূর্বক গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মনে মনে বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমাকে নির্বাসন! একটা সামান্য প্রজার মতো আমাকে বিচারসভায় আহ্বান! এবার দেখি কে কাহাকে নির্বাসিত করে। এবার ত্রিপুরাসুদ্ধ লোক নক্ষত্ররায়ের প্রতাপ অবগত হইবে।"

নক্ষত্ররায় ভারী উৎফুল্ল ও স্ফীত হইলেন।

নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অনর্থক উৎপীড়ন ও লুঠপাটের প্রতি রঘুপতির বিশেষ বিরাগ ছিল। নিবারণ করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা নক্ষত্ররায়ের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে অবহেলা করিল। তিনি নক্ষ-

রায়ের কাছে বলিলেন, "অসহায় গ্রামবাসীদের উপরে কেন এ অত্যাচার!"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "ঠাকুর, এ-সব বিষয়ে তুমি ভালো বোঝ না। যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্যদের লুঠপাটে নিষেধ করিয়া নিরুৎসাহ করা ভালো না।"

নক্ষত্ররায়ের কথা শুনিয়া রঘুপতি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। সহসা নক্ষত্ররায়ের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান দেখিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন। কহিলেন, "এখন লুঠপাট করিতে দিলে পরে ইহাদিগকে সামলানো দায় হইবে। সমস্ত ত্রিপুরা লুঠিয়া লইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "তাহাতে হানি কী? আমি তো তাহাই চাই। ত্রিপুরা একবার বুঝুক, নক্ষত্ররায়কে নির্বাসিত করার ফল কী। ঠাকুর, এ-সব বিষয় তুমি কিছু বোঝ না— তুমি তো কখনো যুদ্ধ কর নাই।"

রঘুপতি মনে মনে অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন। কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন। নক্ষত্ররায় নিতান্ত পুত্তলিকার মতো না হইয়া একটু শক্ত মানুষের মতো হন, এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরায় ইঁদুরের উৎপাত যখন আরম্ভ হয় তখন শ্রাবণ মাস। তখন ক্ষেত্রে কেবল ভুট্টা ফলিয়াছিল, এবং পাহাড়ে জমিতে ধান্যক্ষেত্রেও পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিন মাস কোনোমতে কাটিয়া গেল— অগ্রহায়ণ মাসে নিম্নভূমিতে যখন ধান কাটিবার সময় আসিল তখন দেশে আনন্দ পড়িয়া গেল। চাষারা[১] স্ত্রীলোক বালক যুবক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া দা হাতে লইয়া ক্ষেত্রে গিয়া পড়িল। হৈয়া হৈয়া শব্দে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিল। জুমিয়া রমণীদের গানে মাঠ-বাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাজার প্রতি অসন্তোষ দূর হইয়া গেল— রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এমন সময় সংবাদ আসিল, নক্ষত্ররায় রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং অত্যন্ত লুঠপাট উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন— এই সংবাদে সমস্ত রাজ্য শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

এ সংবাদ রাজার বক্ষে ছুরির মতো বিদ্ধ হইল। সমস্ত দিনই তাঁহাকে বিঁধিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই প্রত্যেক বার নূতন করিয়া তাঁহার মনে হইতে

১ প্রকৃতপক্ষে ইহাদের চাষা বলা যায় না। কারণ, ইহারা রীতিমত চাষ করে না। জঙ্গল দগ্ধ করিয়া বর্ষারম্ভে বীজ বপন করে মাত্র। এইরূপ ক্ষেত্রকে জুম বলে, কৃষকদিগকে জুমিয়া বলে।

লাগিল নক্ষত্ররায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। নক্ষত্ররায়ের সরল সুন্দর মুখ শতবার তাঁহার স্নেহচক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গেই মনে হইতে লাগিল, সেই নক্ষত্ররায় কতকগুলো সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তলোয়ার হাতে লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এক-একবার তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা করিতে লাগিল একটি সৈন্যও না লইয়া নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে বৃহৎ রণক্ষেত্রে একা দাঁড়াইয়া সমস্ত বক্ষস্থল অবারিত করিয়া নক্ষত্ররায়ের সহস্র সৈনিকের তরবারি এক কালে তাঁহার হৃদয়ে গ্রহণ করেন।

তিনি ধ্রুবকে কাছে টানিয়া বলিলেন, "ধ্রুব, তুইও কি এই মুকুটখানার জন্য আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারিস।" বলিয়া মুকুট ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন, একটি বড়ো মুক্তা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল।

ধ্রুব আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া কহিল, "আমি নেব।"

রাজা ধ্রুবের মাথায় মুকুট পরাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া কহিলেন, "এই লও— আমি কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে চাই না।" বলিয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত ধ্রুবকে চাপিয়া ধরিলেন।

তাহার পরে সমস্ত দিন ধরিয়া "এ কেবল আমারই পাপের শাস্তি" বলিয়া রাজা নিজের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন। নহিলে ভাই কখনো ভাইকে আক্রমণ করে না। ইহা মনে করিয়া তাঁহার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা হইল। তিনি মনে করিলেন, ইহা ঈশ্বরের বিধান। জগৎপতির দরবার হইতে আদেশ আসিয়াছে, ক্ষুদ্র নক্ষত্ররায় কেবল তাহার মানবহৃদয়ের প্ররোচনায় তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই মনে করিয়া তাঁহার আহত স্নেহ কিছু শান্তি পাইল। পাপ তিনি নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি আছেন— নক্ষত্ররায়ের পাপের ভার যেন তাহাতে কতকটা কমিয়া যায়।

বিল্বন আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এ সময় কি আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিবার সময়।"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, এ সকল আমারই পাপের ফল।"

বিল্বন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, এই-সকল কথা শুনিলে আমার ধৈর্য থাকে না। দুঃখ যে পাপেরই ফল তাহা কে বলিল, পুণ্যের ফলও হইতে পারে। কত ধর্মাত্মা আজীবন দুঃখে কাটাইয়া গিয়াছেন।"

রাজা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

বিল্বন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কী পাপ করিয়াছিলেন যাহার ফলে এই ঘটনা ঘটিল ?"

রাজা কহিলেন, "আপন ভাইকে নির্বাসিত করিয়াছিলাম।"

বিল্বন কহিলেন, "আপনি ভাইকে নির্বাসিত করেন নাই। দোষীকে নির্বাসিত করিয়াছেন।"

রাজা কহিলেন, "দোষী হইলেও ভাইকে নির্বাসনের পাপ আছেই। তাহার ফল হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। কৌরবেরা দুরাচার হইলেও পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে বধ করিয়া প্রসন্নচিত্তে রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। যজ্ঞ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পাণ্ডবেরা কৌরবদের নিকট হইতে রাজ্য লইলেন, কৌরবেরা মরিয়া গিয়া পাণ্ডবদের রাজ্য হরণ করিলেন। আমি নক্ষত্রকে নির্বাসিত করিয়াছি, নক্ষত্র আমাকে নির্বাসিত করিতে আসিতেছে।"

বিল্বন কহিলেন, "পাণ্ডবেরা পাপের শাস্তি দিবার জন্য কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করেন নাই, তাঁহারা রাজ্যলাভের জন্য করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ পাপের শাস্তি দিয়া নিজের সুখদুঃখ উপেক্ষা করিয়া ধর্ম পালন করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি তো পাপ কিছুই দেখিতেছি না। তবে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছি, আমাকে সন্তুষ্ট করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বিল্বন কহিলেন, "সে যাহাই হউক, এখন যুদ্ধের আয়োজন করুন। আর বিলম্ব করিবেন না।"

রাজা কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন কহিলেন, "সে হইতেই পারে না। আপনি বসিয়া বসিয়া ভাবুন। আমি ততক্ষণ সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টা করিগে। সকলেই এখন জুমে গিয়াছে, যথেষ্ট সৈন্য পাওয়া কঠিন।"

বলিয়া আর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিল্বন চলিয়া গেলেন।

ধ্রুবের সহসা কী মনে হইল; সে রাজার কাছে আসিয়া রাজার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা কোথায়?"

নক্ষত্ররায়কে ধ্রুব কাকা বলিত।

রাজা কহিলেন "কাকা আসিতেছেন ধ্রুব।"

তাঁহার চোখের পাতা ঈষৎ আর্দ্র হইয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিল্বন ঠাকুরের বিস্তর কাজ পড়িয়া গেল। তিনি চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে নানা উপহার সমেত দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কুকি-গ্রামপতিদের নিকটে কুকি-সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধের নাম শুনিয়া তাহারা নাচিয়া উঠিল। কুকিদের যত লাল (গ্রামপতি) ছিল তাহারা যুদ্ধের সংবাদস্বরূপ লাল বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা দা দূতহস্তে গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে কুকির স্রোত চট্টগ্রামের শৈলশৃঙ্গ হইতে ত্রিপুরার শৈলশৃঙ্গে আসিয়া পড়িল। তাহাদিগকে কোনো নিয়মের মধ্যে সংযত করিয়া রাখাই দায়। বিল্বন স্বয়ং ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে গিয়া জুম হইতে বাছিয়া বাছিয়া সাহসী যুবাপুরুষদিগকে সৈন্যশ্রেণীতে সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। অগ্রসর হইয়া মোগলসৈন্যদিগকে আক্রমণ করা বিল্বন ঠাকুর সংগত বিবেচনা করিলেন না। যখন তাহারা সমতলক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্গম শৈলশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন অরণ্য, পর্বত ও নানা দুর্গম গুপ্ত স্থান হইতে তাহাদিকে সহসা আক্রমণ করিয়া চকিত করিবেন স্থির করিলেন। বড়ো বড়ো শিলাখণ্ডের দ্বারা গোমতী নদীর জল বাঁধিয়া রাখিলেন— নিতান্ত পরাভবের আশঙ্কা দেখিলে সেই বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া জলপ্লাবনের দ্বারা মোগলসৈন্যদিগকে ভাসাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

এদিকে নক্ষত্ররায় দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন জুম কাটা শেষ হইয়া গেছে। জুমিয়ারা সকলেই দা ও তীরধনু হাতে করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কুকিদলকে উচ্ছ্বাসোন্মুখ জলপ্রপাতের মতো আর বাঁধিয়া রাখা যায় না।

গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কহিলেন, "এ কোনো কাজের কথাই নহে।"

রাজা কহিলেন, "আমি রাজত্ব করিবার যোগ্য নহি, তাহারই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সেই জন্য আমার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নাই, সেই জন্যই দুর্ভিক্ষের সূচনা, সেই জন্যই এই যুদ্ধ। রাজ্য-পরিত্যাগের জন্য এ-সকল ভগবানের আদেশ।"

বিল্বন কহিলেন, "এ কখনোই ভগবানের আদেশ নহে। ঈশ্বর তোমার উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন; যতদিন রাজকার্য নিঃসংকট ছিল ততদিন তোমার সহজ কর্তব্য অনায়াসে পালন করিয়াছ, যখনই রাজ্যভার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে তখনই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তুমি স্বাধীন হইতে চাহিতেছ এবং ঈশ্বরের আদেশ

বলিয়া আপনাকে ফাঁকি দিয়া সুখী করিতে চাহিতেছ।"

কথাটা গোবিন্দমাণিক্যের মনে লাগিল। তিনি নিরুত্তর হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। অবশেষে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলেন, "মনে করো-না ঠাকুর, আমার পরাজয় হইয়াছে, নক্ষত্র আমাকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছে।"

বিল্বন কহিলেন, "যদি সত্য তাহাই ঘটে তাহা হইলে আমি মহারাজের জন্য শোক করিব না। কিন্তু মহারাজ যদি কর্তব্যে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন, তবেই আমাদের শোকের কারণ ঘটিবে।"

রাজা কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলেন, "আপন ভাইয়ের রক্তপাত করিব!"

বিল্বন কহিলেন, "কর্তব্যের কাছে ভাই বন্ধু কেহই নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কী উপদেশ দিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া দেখুন।"

রাজা কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি কি বল আমি স্বহস্তে এই তরবারি লইয়া নক্ষত্র-রায়কে আঘাত করিব?"

বিল্বন কহিলেন, "হাঁ।"

সহসা ধ্রুব আসিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "ছি, ও কথা বলতে নেই।"

ধ্রুব খেলা করিতেছিল, দুই পক্ষের কী একটা গোলমাল শুনিয়া সহসা তাহার মনে হইল দুইজনে অবশ্যই একটা দুষ্টামি করিতেছে, অতএব সময় থাকিতে দুইজনকে কিঞ্চিৎ শাসন করিয়া আসা আবশ্যক। এই-সকল বিবেচনা করিয়া তিনি হঠাৎ আসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ছি, ও কথা বলতে নেই।"

পুরোহিত ঠাকুরের অত্যন্ত আমোদ বোধ হইল। তিনি হাসিয়া উঠিলেন, ধ্রুবকে কোলে লইয়া চুমো খাইতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা হাসিলেন না। তাঁহার মনে হইল যেন বালকের মুখে তিনি দৈববাণী শুনিলেন।

তিনি অসন্দিগ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, আমি স্থির করিয়াছি এ রক্তপাত আমি ঘটিতে দিব না, আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "মহারাজের যদি যুদ্ধ করিতেই আপত্তি থাকে, তবে আর-এক কাজ করুন। আপনি নক্ষত্ররায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত করুন।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, "ইহাতে আমি সম্মত আছি।"

বিল্বন কহিলেন, "তবে সেইরূপ প্রস্তাব লিখিয়া নক্ষত্ররায়ের নিকট পাঠানো হউক।"

অবশেষে তাহাই স্থির হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্ররায় সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কোথাও তিলমাত্র বাধা পাইলেন না। ত্রিপুরার যে গ্রামেই তিনি পদার্পণ করিলেন সেই গ্রামই তাঁহাকে রাজা বলিয়া বরণ করিতে লাগিল। পদে পদে রাজত্বের আস্বাদ পাইতে লাগিলেন— ক্ষুধা আরও বাড়িতে লাগিল, চারি দিকের বিস্তৃত ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্বতশ্রেণী, নদী সমস্তই "আমার" বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং সেই অধিকারব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজেও যেন অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রশস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। মোগল-সৈন্যেরা যাহা চায় তিনি তাহাই তাহাদিগকে লইতে আলী হুকুম দিয়া দিলেন। মনে হইল এ-সমস্তই আমার এবং ইহারা আমারই রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে কোনো সুখ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না— স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া মোগলেরা তাঁহার আতিথ্যের ও রাজবৎ উদারতা ও বদান্যতার অনেক প্রশংসা করিবে; বলিবে, "ত্রিপুরার রাজা বড়ো কম রাজা নহে।" মোগলসৈন্যদের নিকট হইতে খ্যাতি লাভ করিবার জন্য তিনি সততই উৎসুক হইয়া রহিলেন। তাহারা তাঁহাকে কোনো-প্রকার শ্রুতিমধুর সম্ভাষণ করিলে তিনি নিতান্ত জল হইয়া যান। সর্বদাই ভয় হয় পাছে কোনো নিন্দার কারণ ঘটে।

রঘুপতি আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, যুদ্ধের তো কোনো উদ্‌যোগ দেখা যাইতেছে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "না ঠাকুর, ভয় পাইয়াছে।"

বলিয়া অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি হাসিবার বিশেষ কোনো কারণ দেখিলেন না, কিন্তু তথাপি হাসিলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "নক্ষত্ররায় নবাবের সৈন্য লইয়া আসিয়াছে। বড়ো সহজ ব্যাপার নহে।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেখি এবার কে কাহাকে নির্বাসনে পাঠায়। কেমন?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "আমি ইচ্ছা করিলে নির্বাসনদণ্ড দিতে পারি, কারারুদ্ধ করিতেও পারি— বধের হুকুম দিতেও পারি। এখনো স্থির করি নাই কোন্‌টা করিব।"

বলিয়া অতিশয় বিজ্ঞভাবে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "অত ভাবিবেন না মহারাজ। এখনো অনেক সময় আছে। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, গোবিন্দমাণিক্য যুদ্ধ না করিয়াই আপনাকে পরাভূত করিবেন।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "সে কেমন করিয়া হইবে?"

রঘুপতি কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্য সৈন্যগুলোকে আড়ালে রাখিয়া বিস্তর ভ্রাতৃস্নেহ দেখাইবেন। গলা ধরিয়া বলিবেন— ছোটো ভাই আমার, এস ঘরে এস, দুধ-সর খাওসে। মহারাজ কাঁদিয়া বলিবেন— যে আজ্ঞে, আমি এখনি যাইতেছি। অধিক বিলম্ব হইবে না। বলিয়া নাগরা জুতাজোড়াটা পায়ে দিয়া দাদার পিছনে পিছনে মাথা নিচু করিয়া টাট্টু ঘোড়াটির মতো চলিবেন। বাদশাহের মোগল ফৌজ তামাশা দেখিয়া হাসিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে।"

নক্ষত্ররায় রঘুপতির মুখে এই তীব্র বিদ্রূপ শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ হাসিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আমাকে কি ছেলেমানুষ পাইয়াছে যে এমনি করিয়া ভুলাইবে। তাহার জো নাই। সে হবে না ঠাকুব। দেখিয়া লইয়ো।"

সেইদিন গোবিন্দমাণিক্যের চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। সে চিঠি রঘুপতি খুলিলেন। রাজা অত্যন্ত স্নেহপ্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছেন। চিঠি নক্ষত্ররায়কে দেখাইলেন না। দূতকে বলিয়া দিলেন, "কষ্ট স্বীকার করিয়া গোবিন্দমাণিক্যের এতদূর আসিবার দরকার নাই। সৈন্য ও তরবারি লইয়া মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। গোবিন্দমাণিক্য এই অল্প কাল যেন প্রিয়ভ্রাতৃবিরহে অধিক কাতর হইয়া না পড়েন। আট বৎসর নির্বাসনে থাকিলে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক কাল বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ছিল।"

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে গিয়া কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্য নির্বাসিত ছোটো ভাইকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ একখানি চিঠি লিখিয়াছেন।"

নক্ষত্ররায় পরম উপেক্ষার ভান করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সত্য না কি! কী চিঠি? কই দেখি।" বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "সে চিঠি মহারাজকে দেখানো আমি আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। তখনই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বলিয়াছি, যুদ্ধ ছাড়া ইহার আর কোনো উত্তর নাই।"

নক্ষত্ররায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন. "বেশ করিয়াছ ঠাকুর! তুমি বলিয়াছ যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উত্তর নাই? বেশ উত্তর দিয়াছ।"

রঘুপতি কহিলেন, "গোবিন্দমাণিক্য উত্তর শুনিয়া ভাবিবে যে, যখন নির্বাসন দিয়াছিলাম তখন তো ভাই বেশ সহজে গিয়াছিল, কিন্তু সেই ভাই ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় তো কম গোলযোগ করিতেছে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন. "মনে করিবেন ভাইটি বড়ো সহজ লোক নয়। মনে করিলেই যে যখন ইচ্ছা নির্বাসন দিব এবং যখন ইচ্ছা ডাকিয়া লইব সেটি হইবার জো নাই।"

বলিয়া অত্যন্ত আনন্দে দ্বিতীয়বার হাসিতে লাগিলেন।